تَفْسِيرُ جُزْءِ عَمَّ

আমপারার তাফসীর

ত্রিশতম পারার সূরা নাবা থেকে সূরা নাস পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ তাফসীর

আলোচক

শাইখ মুফতী মুহাম্মদ উসমান গনী

ইউটিউব চ্যানেল ISLAMIC CONCEPT BD-এর

৪৪টি ভিডিও-আলোচনা অবলম্বনে গ্রন্থিত

ভূমিকা: আমপারা পরিচিতি

কুরআনুল কারীমের ত্রিশতম পারাকে আমরা সাধারণত 'আমপারা' বলি। এর আসল নাম 'আম্মা পারা', কারণ এই পারার প্রথম সূরা, সূরা নাবার প্রথম শব্দ 'আম্মা' (عَمَّ)। এই পারায় সূরা নাবা (৭৮) থেকে সূরা নাস (১১৪) পর্যন্ত মোট ৩৭টি সূরা আছে। সূরাগুলো ছোট, তাই ছোটবেলা থেকেই আমরা এগুলো মুখস্থ করি এবং নামাযে পড়ি। কিন্তু অর্থ বুঝে পড়ার সুযোগ আমাদের কম হয়। এই গ্রন্থ সেই সুযোগ তৈরির একটি ক্ষুদ্র চেষ্টা।

আমপারার সূরাগুলোর বৈশিষ্ট্য

এই পারার বেশির ভাগ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। মক্কার প্রাথমিক যুগে ইসলামের ভিত্তি ছিল তিনটি বিষয়: তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব, রিসালাত বা নবুওয়াত এবং আখিরাত। তাই এই পারার সূরাগুলোতে সংক্ষিপ্ত, জোরালো ও হৃদয়স্পর্শী ভাষায় কিয়ামতের ভয়াবহতা, জান্নাত-জাহান্নামের বিবরণ, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন এবং পূর্ববর্তী জাতিগুলোর পরিণতি এসেছে। অল্প কয়েকটি সূরা মাদানী, যেমন বাইয়্যিনাহ, নাসর ও (কোনো কোনো মতে) যিলযাল। কয়েকটি সূরার মাক্কী-মাদানী হওয়া নিয়ে আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে, যা সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

কেন আমপারার তাফসীর পড়ব?

প্রথমত, আমরা প্রতিদিন নামাযে এই সূরাগুলো পড়ি। অর্থ জানলে নামাযে একাগ্রতা বাড়ে। দ্বিতীয়ত, ছোট সূরাগুলোতে জীবনের মৌলিক শিক্ষাগুলো অত্যন্ত সংক্ষেপে এসেছে। সূরা আসরের তিন আয়াতে মুক্তির পুরো সূত্র, সূরা ইখলাসের চার আয়াতে আল্লাহর পূর্ণ পরিচয়, সূরা কাফিরূনে তাওহীদের আপসহীন ঘোষণা। তৃতীয়ত, শিশুদের কুরআন শেখানোর শুরুটা এই পারা থেকেই হয়। অভিভাবক নিজে অর্থ জানলে সন্তানকে সঠিকভাবে শেখানো সহজ হয়।
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াত নিয়ে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানরা উপদেশ গ্রহণ করে (সূরা সাদ ৩৮:২৯)। আসুন, আমরা কুরআনের আয়াত নিয়ে চিন্তা করি।

গ্রন্থের বিন্যাস

গ্রন্থের প্রতিটি অধ্যায় একটি সূরা নিয়ে। সূরাগুলো মুসহাফের ক্রম অনুযায়ী, অর্থাৎ সূরা নাবা (৭৮) থেকে সূরা নাস (১১৪) পর্যন্ত সাজানো। একটি সূরার আলোচনা একাধিক পর্বে ছিল, যেমন নাবা তিন পর্বে, সেগুলো এখানে একত্র করে একটি অধ্যায়ে সাজানো হয়েছে।
আল্লাহ তাআলা আমাদের কুরআন বোঝার, মানার ও এর আলোকে জীবন গড়ার তাওফীক দিন। আমীন।

সূচিপত্র

ভূমিকা: আমপারা পরিচিতি 3
সূরা নাবা 6
সূরা নাযিয়াত 25
সূরা আবাসা 40
সূরা তাকভীর 54
সূরা ইনফিতার 66
সূরা মুতাফফিফীন 74
সূরা ইনশিকাক 87
সূরা বুরূজ 95
সূরা তারিক 103
সূরা আ'লা 109
সূরা গাশিয়াহ 116
সূরা ফাজর 123
সূরা বালাদ 134
সূরা শামস 141
সূরা লাইল 147
সূরা দুহা 155
সূরা ইনশিরাহ 161
সূরা তীন 167
সূরা আলাক 172

সূরা কদর 181
সূরা বাইয়্যিনাহ 186
সূরা যিলযাল 193
সূরা আদিয়াত 199
সূরা ক্বারিআহ 205
সূরা তাকাসুর 211
সূরা আসর 217
সূরা হুমাযাহ 223
সূরা ফীল 230
সূরা কুরাইশ 235
সূরা মাউন 240
সূরা কাউসার 246
সূরা কাফিরূন 251
সূরা নাসর 258
সূরা লাহাব 263
সূরা ইখলাস 269
সূরা ফালাক 275
সূরা নাস 282
সমাপনী দোয়া 288

অধ্যায় ১

সূরা নাবা

النبإ

মহাসংবাদ, ফয়সালার দিন ও মুত্তাকীদের সাফল্য

কুরআনের ৭৮তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৪০টি

সূরা নাবা কুরআনুল কারীমের ৭৮তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ৪০। মাক্কী সূরাগুলোর আলোচ্য বিষয় প্রধানত কিয়ামত, আখিরাত ও পুনরুত্থান। এর কারণ স্পষ্ট। মক্কার সেই প্রাথমিক যুগে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন ছিল ঈমানের, আর আখিরাতে হিসাব-নিকাশ ও জবাবদিহির বিশ্বাস মানুষকে ঈমানের দিকে টেনে আনার সবচেয়ে শক্তিশালী কারণগুলোর একটি। তাই আল্লাহ তাআলা মাক্কী সূরাগুলোতে বারবার কিয়ামতের ভয়াবহতা ও আখিরাতের বাস্তবতা তুলে ধরেছেন।

এই সূরা নাযিল হওয়ার সময় মক্কার মানুষের মুখে মুখে একটি বিষয়ই ঘুরছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন, কিয়ামত হবে, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, এমনকি আরবের এই বিশাল পাহাড়গুলোও ধুলোর মতো উড়তে থাকবে। কথাটা কি সত্যিই ঘটবে? কেউ বলত, তিনি মিথ্যা বলছেন। কেউ বলত, বলছেন যখন, হতেও তো পারে। কেউ আবার ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভঙ্গিতে একে অপরকে জিজ্ঞেস করত, মুহাম্মাদ এসব কী বলে বেড়াচ্ছে? এই আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ও উপহাসের প্রেক্ষাপটেই সূরাটির সূচনা।

নামকরণ ও আমপারা নামের কারণ

'নাবা' অর্থ সংবাদ। তবে আরবিতে সাধারণ খবরকে বলা হয় 'খবর'। 'নাবা' বলা হয় এমন সংবাদকে, যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা মানুষকে নড়েচড়ে বসায়, যা শুনে মানুষ উদ্বিগ্ন হয় কিংবা যার প্রতি মানুষের প্রবল আগ্রহ থাকে। আমাদের ভাষায় একে 'ব্রেকিং নিউজ' বলা যায়। এই সূরার প্রথম দিকেই 'নাবা' শব্দটি আছে এবং সূরাজুড়ে কিয়ামতের আলোচনা হয়েছে, তাই এর নাম সূরা নাবা।

এখানে আরেকটি কথা জেনে রাখা ভালো। আমরা ত্রিশতম পারাকে 'আমপারা' বলি। অনেকে ভাবেন, ছোট বাচ্চাদের পড়ানো হয় বলে বা 'আম' (সর্বসাধারণ) অর্থে এই নাম। আসলে তা নয়। এই পারার প্রথম শব্দ 'আম্মা' (عَمَّ), অর্থাৎ 'কী বিষয়ে'। এই 'আম্মা' শব্দ থেকেই কথ্য উচ্চারণে 'আমপারা' হয়ে গেছে। আসলে নামটি 'আম্মা পারা'।

সূরার সারকথা

এই সূরার বিষয়বস্তু মোটামুটি পাঁচটি ধাপে সাজানো। প্রথমে কিয়ামত নিয়ে মানুষের তর্ক-বিতর্ক, দ্বিতীয়ত আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন, তৃতীয়ত বিচার দিবস ও জাহান্নামের বিবরণ, চতুর্থত জান্নাতের বিবরণ এবং শেষে হাশরের ময়দানের ভীতিকর পরিস্থিতি। কুরআনের একটি সাধারণ রীতি এখানেও দেখা যায়। যেখানে একটি বিষয়ের আলোচনা আসে, সেখানে তার বিপরীত বিষয়ও আসে। মুমিনের সঙ্গে কাফির, জান্নাতের সঙ্গে জাহান্নাম, আলোর সঙ্গে অন্ধকার। প্রথম পাঁচ আয়াতে কিয়ামত নিয়ে মানুষের কথোপকথনের কথা, আর ষষ্ঠ থেকে ষোড়শ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ১–৫

عَمَّ يَتَسَآءَلُونَ ﴿١﴾

[১] তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে

عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلۡعَظِيمِ ﴿٢﴾

[২] মহা সংবাদ সম্পর্কে

ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ مُخۡتَلِفُونَ ﴿٣﴾

[৩] যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে।

كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ﴿٤﴾

[৪] না, সত্বরই তারা জানতে পারবে

ثُمَّ كَلَّا سَيَعۡلَمُونَ ﴿٥﴾

[৫] অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে।

আয়াত ১–৫: মহাসংবাদ নিয়ে মানুষের বিতর্ক

প্রথম আয়াতে আল্লাহ তাআলা প্রশ্নের ভঙ্গিতে কথা শুরু করেছেন: 'আম্মা ইয়াতাসাআলূন', অর্থাৎ 'তারা কী বিষয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করছে?' 'আন' (عَنْ) অব্যয়ের সঙ্গে 'মা' (مَا) মিলে হয়েছে 'আম্মা', যার অর্থ 'কিসের ব্যাপারে'। আল্লাহ তাআলা তাদের জিজ্ঞাসাবাদের কথা জানেন এবং নিজেই তার উত্তর দেবেন। তবু প্রশ্নের আকারে শুরু করার একটি তাৎপর্য আছে। প্রশ্ন শুনলে মানুষের মনে কৌতূহল জাগে, মন সজাগ হয়ে ওঠে। এভাবে শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষণ করে তাকে বিষয়টি বোঝা ও জানার জন্য প্রস্তুত করা হয়।

দ্বিতীয় আয়াতে উত্তর এসেছে। তারা জিজ্ঞাসাবাদ করছে 'আন-নাবাইল আযীম' অর্থাৎ মহাসংবাদ সম্পর্কে। এই মহাসংবাদ কী, সে বিষয়ে মুফাসসিরদের তিনটি মত পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন কুরআন, কেউ বলেছেন পুনরুত্থান, আবার কেউ বলেছেন কিয়ামত। প্রসঙ্গ ও পরবর্তী আয়াতগুলোর ধারা বিবেচনা করলে স্পষ্ট বোঝা যায়, এখানে কিয়ামতই উদ্দেশ্য। অন্য দুটি মতও ব্যাখ্যার মাধ্যমে এর সঙ্গে মেলানো যায়, কারণ কিয়ামতের সংবাদ কুরআনেই এসেছে এবং কিয়ামতের সূচনা হলো পুনরুত্থান। কিন্তু কিয়ামত অর্থটিই সবচেয়ে সুস্পষ্ট।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে বিষয়ে তারা মতভেদ করে'। কেউ বলত, মৃত্যুর পর আবার জীবিত হওয়া কি সম্ভব? পৃথিবীর এত কোটি কোটি মানুষ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ কি আবার সবাইকে সৃষ্টি করতে পারবেন? কেউ বলত, কিয়ামত হলেও আমাদের শাস্তি হবে না।

এই শেষ ধারণাটি নিয়ে একটু ভাবা দরকার, কারণ এটি শুধু সেই যুগের কথা নয়। আমরা অনেকেই মনে মনে ভাবি, কিয়ামত যদি হয়ও, আল্লাহ তো গাফুর ও রাহীম, তিনি আমাকে ক্ষমা করে দেবেন। শাস্তি হলে অন্যদের হবে, আমার হবে না। আমি কারও ওপর জুলুম করলে তা নিয়ে আমার দুশ্চিন্তা নেই, কিন্তু কেউ আমার ওপর জুলুম করলে আমি নিশ্চিত বলি, কিয়ামতের দিন তার শাস্তি অবধারিত। নিজের বেলায় আমরা সবসময় চোখ বন্ধ রাখতে চাই। আল্লাহর রহমতের আশা অবশ্যই ঈমানের অংশ, কিন্তু আমলহীন আশা প্রতারণা। আর এই ভ্রান্ত আশাকে ঢাল বানিয়ে মানুষ গুনাহে জড়ায়।

ইয়াহূদীদের মধ্যেও এ ধরনের ধারণা প্রচলিত ছিল। তারা বলত, আমরা জাহান্নামে গেলেও মাত্র কয়েক দিনের জন্য যাব। কুরআন তাদের এই দাবির কথা উল্লেখ করেছে (সূরা বাকারা ২:৮০ ও সূরা আলে ইমরান ৩:২৪)।

চতুর্থ আয়াতে আল্লাহ তাআলা এসব ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন: 'কাল্লা', অর্থাৎ 'কখনোই নয়!' তোমরা যা ভাবছ, তা ঠিক নয়। 'অচিরেই তারা জানতে পারবে।' পঞ্চম আয়াতে একই কথা আবার বলা হয়েছে, 'অতঃপর কখনোই নয়, অচিরেই তারা জানতে পারবে।' পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে কথাটির গুরুত্ব ও কঠোরতা বাড়ানো হয়েছে। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, প্রথমবারে কিয়ামত এবং দ্বিতীয়বারে তার পরের পরিণাম অর্থাৎ জাহান্নাম উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তারা অচিরেই কিয়ামত সম্পর্কে জানবে, তারপর জাহান্নাম সম্পর্কেও জানবে।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ৬–৭

أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَٰدًا ﴿٦﴾

[৬] আমি কি করিনি ভূমিকে বিছানা

وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ﴿٧﴾

[৭] এবং পর্বতমালাকে পেরেক

আয়াত ৬–৭: জমিন ও পাহাড়

এখান থেকে আল্লাহ তাআলা তাঁর কুদরতের নিদর্শন তুলে ধরছেন। উদ্দেশ্য একটাই। যিনি এত বিশাল সৃষ্টি অস্তিত্বে এনেছেন, তাঁর জন্য মানুষকে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা কি কঠিন কিছু? আল্লাহ তাআলা সূরা লুকমানে বলেছেন, তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একটি প্রাণের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতোই (৩১:২৮)। তাঁর কাছে ছোট-বড় সবই সমান। বড় কিছু সৃষ্টি করতে তাঁকে বাড়তি চেষ্টা বা চাপ নিতে হয় না। তিনি শুধু বলেন 'হও', আর তা হয়ে যায়।

প্রথম নিদর্শন জমিন। আল্লাহ বলছেন, 'আমি কি ভূমিকে বিছানা বানাইনি?' 'মিহাদ' অর্থ বিছানা বা সমতল বসবাসযোগ্য স্থান। আমরা এই ভূমির ওপর অনায়াসে চলাফেরা করি, ঘরবাড়ি বানাই, রাস্তা তৈরি করি। ভেবে দেখুন, জমিন যদি পাথরের মতো অতিকঠিন হতো, হাঁটাচলা দুষ্কর হতো। আবার যদি পানির মতো নরম হতো, তাতে দাঁড়ানোই যেত না। এর তাপমাত্রা, কাঠিন্য ও গঠন সবকিছুই আল্লাহ তাআলা আমাদের বসবাসের উপযোগী করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় নিদর্শন পাহাড়। আল্লাহ বলছেন, 'আর পর্বতমালাকে (করেছি) পেরেক'। 'আওতাদ' হলো 'ওয়াতাদ' (পেরেক বা খুঁটি)-এর বহুবচন। তাঁবু যেমন পেরেক দিয়ে মাটিতে গেঁথে স্থির রাখা হয়, আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে তেমনি পৃথিবীর বুকে গেঁথে দিয়েছেন। পেরেকের সামান্য অংশ ওপরে দেখা যায়, বাকিটা গভীরে ঢুকে থাকে। পাহাড়ের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা ওপরে যতটুকু দেখি, ভূগর্ভে তার চেয়ে বহুগুণ বেশি বিস্তৃত থাকে। সমুদ্রের হিমশৈলের কথা ভাবলে বিষয়টি বোঝা সহজ হয়, যার সামান্য অংশ পানির ওপরে আর বেশির ভাগ নিচে থাকে। পাহাড় না থাকলে জমিন কেঁপে কেঁপে দুলত। ছোট নৌকায় হাঁটলে যেমন নৌকা দুলে ওঠে আর মাথা ঘোরে, জমিন তেমন অস্থির হতো। এই স্থিরতা আল্লাহর দান।

ফিরআউনকে কুরআনে 'যুল-আওতাদ' (পেরেকওয়ালা) বলা হয়েছে (সূরা ফাজর ৮৯:১০)। মুফাসসিরগণ এর দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। একটি হলো, সে কাউকে শাস্তি দিলে তার হাত-পায়ে পেরেক ঠুকে ঝুলিয়ে রাখত। অন্যটি হলো, সে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে যেখানেই যেত, সেখানে তাঁবু খাটাতে অসংখ্য পেরেক লাগত। একই শব্দ কুরআনে ভিন্ন প্রসঙ্গে এসেছে। ফিরআউনের পেরেক ছিল জুলুমের, আর পাহাড়ের পেরেক রহমতের।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ৮

وَخَلَقْنَٰكُمْ أَزْوَٰجًا ﴿٨﴾

[৮] আমি তোমাদেরকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি

আয়াত ৮: জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি

'আর আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি জোড়ায় জোড়ায়।' নারী ও পুরুষ, দুই লিঙ্গের মাধ্যমে মানবজাতির ধারা টিকে আছে। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখি ও উদ্ভিদের মধ্যেও জোড়ার ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন। অন্যত্র কুরআন বলেছে, তিনি প্রতিটি বস্তুকেই জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন (সূরা যারিয়াত ৫১:৪৯)। এই পারস্পরিক নির্ভরতা ও ভারসাম্য সৃষ্টির এক বিস্ময়কর নিদর্শন।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ৯–১১

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٩﴾

[৯] তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী

وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِبَاسًا ﴿١٠﴾

[১০] রাত্রিকে করেছি আবরণ।

وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ﴿١١﴾

[১১] দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়

আয়াত ৯–১১: ঘুম, রাত ও দিন

নবম আয়াতে 'সুবাত' শব্দের আভিধানিক অর্থ কেটে ফেলা বা বিচ্ছিন্ন করা। ঘুম মানুষকে দিনের সমস্ত কাজ ও ক্লান্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। ঘুমের মধ্য দিয়ে সারাদিনের ক্লান্তি দূর হয় এবং মানুষ নতুন উদ্যমে নতুন দিন শুরু করার শক্তি ফিরে পায়। তাই বলা হয়েছে, 'আর আমি তোমাদের নিদ্রাকে করেছি বিশ্রাম।'

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর রাতকে করেছি আবরণ (পোশাক)।' অন্ধকার নেমে এলে মানুষ যেন একটি আবরণের ভেতরে ঢাকা পড়ে যায়। আর একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর দিনকে করেছি জীবিকা অর্জনের সময়।' অর্থাৎ রাত বিশ্রামের জন্য, দিন উপার্জন ও কর্মব্যস্ততার জন্য।

আমাদের জীবনে এই বিন্যাস অনেক সময় উল্টে গেছে। বিয়ের অনুষ্ঠান, আড্ডা, ঘোরাঘুরি, মিটিং, সব কিছুর জন্য আমরা রাতকেই বেছে নিই। রাত গভীর হলে ঘুমাতে যাই, আর সকালে উঠি বেলা করে। অথচ ফজরে ওঠা ইবাদতের অংশ। এভাবে আমরা আল্লাহর নির্ধারিত প্রাকৃতিক ছন্দের বিপরীতে চলি। ইসলামি জীবনযাপনে ইশার পর দ্রুত ঘুমানো এবং শেষ রাতে বা ফজরে ওঠার যে রীতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছেন, তা আমাদের জীবনে আর নেই বললেই চলে। চিকিৎসাবিজ্ঞানও একমত যে রাতের নির্দিষ্ট সময়ে ঠিকমতো ঘুম না

হলে শরীরে জটিল রোগের ঝুঁকি বাড়ে। সুন্নাহর প্রতিটি নির্দেশনার মধ্যেই আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

বর্তমান যুগে যাঁরা ফ্রিল্যান্সিং বা আন্তর্জাতিক সময়সূচির কারণে রাত জেগে কাজ করতে বাধ্য হন, তাঁদের বিষয়টি আলাদা। তবু তাঁদের জন্যও কথা একই। সুযোগ থাকলে ঘুমের সময়সূচি যথাসম্ভব ঠিক রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতে হবে।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ১২–১৩

وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ﴿١٢﴾

[১২] নির্মান করেছি তোমাদের মাথার উপর মজবুত সপ্ত-আকাশ।

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿١٣﴾

[১৩] এবং একটি উজ্জ্বল প্রদীপ সৃষ্টি করেছি।

আয়াত ১২–১৩: আকাশ ও সূর্য

দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আর আমি তোমাদের ওপর নির্মাণ করেছি সাতটি সুদৃঢ় (আসমান)।’ ‘শিদাদ’ অর্থ শক্ত, মজবুত। আসমানের এই দৃঢ়তা ও সুবিন্যস্ত গঠন আল্লাহর শক্তির প্রমাণ। এরপর বলা হয়েছে, ‘আর সৃষ্টি করেছি একটি উজ্জ্বল প্রদীপ।’ ‘সিরাজ’ অর্থ প্রদীপ আর ‘ওয়াহহাজ’ অর্থ প্রখর আলো ও তাপ-বিকিরণকারী। এখানে সূর্যকেই বোঝানো হয়েছে। সূর্যের আলোয় আমরা চলাফেরা করি, তার তাপে ফসল পাকে, বৃষ্টির চক্র চলে, পৃথিবীর জীবন টিকে থাকে।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ১৪–১৬

وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿١٤﴾

[১৪] আমি জলধর মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি

لِّنُخْرِجَ بِهِۦ حَبًّا وَنَبَاتًا ﴿١٥﴾

[১৫] যাতে তদ্দ্বারা উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ।

وَجَنَّٰتٍ أَلْفَافًا ﴿١٦﴾

[১৬] ও পাতাঘন উদ্যান।

আয়াত ১৪–১৬: বৃষ্টি ও তা থেকে উৎপন্ন ফসল

চতুর্দশ আয়াতে 'মুসিরাত' শব্দের মূল অর্থ 'যা নিংড়ানো হয়'। ভেজা কাপড় নিংড়ালে যেভাবে পানি ঝরে, মেঘ থেকে সেভাবেই পানি ঝরে। আর 'সাজ্জাজ' অর্থ অবিরাম প্রবল ধারায় পতিত। অর্থাৎ 'আমি মেঘমালা থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করি।'

এর উদ্দেশ্য পরের আয়াতে বলা হয়েছে: 'যাতে তার মাধ্যমে আমি উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ' এবং 'ঘন-সন্নিবিষ্ট বাগান'। 'হাব্ব' হলো ধান-গমের মতো শস্যদানা, 'নাবাত' হলো উদ্ভিদ বা ঘাস-লতাপাতা, আর 'আলফাফ' হলো ঘন পাতাবিশিষ্ট বাগান, যার গাছগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি জড়াজড়ি করে থাকে।

এই দশটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা সাত ধরনের কুদরতের কথা বলেছেন। সাতটিই বিশাল ও বিস্ময়কর। জমিন, পাহাড়, মানুষের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি, ঘুম, রাত-দিনের আবর্তন, আসমান ও সূর্য এবং বৃষ্টি ও তা থেকে উৎপন্ন ফসল। এই বিশাল জগৎকে একবার অন্ধকারে ঢেকে দেওয়া, আবার আলোয় আলোকিত করা, সবকিছু এক নিয়মের মধ্যে পরিচালনা করা যিনি পারেন, তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারবেন না, এ কথা বলা চরম নির্বুদ্ধিতা।

শিক্ষা ও উপদেশ

- এই আয়াতগুলো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে কারও জন্য আল্লাহকে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ থাকে না।
- কুরআনের সহজ আয়াতগুলো বুঝতে বড় বড় তাফসীরের প্রয়োজন হয় না। এই আয়াতগুলো যখন নাযিল হয়েছিল, মক্কার মুশরিকদের কাছেও কোনো তাফসীরগ্রন্থ ছিল না। শুধু আয়াত নিয়ে চিন্তা করলেই ঈমান বাড়ে। তাই কুরআনের অর্থ বোঝার চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।
- আল্লাহর ক্ষমার ভরসা করে নিজের গুনাহকে হালকা ভাবা বড় ধোঁকা। অন্যের জুলুমে আমরা যেভাবে কিয়ামতের বিচার কামনা করি, নিজের জুলুমের বেলায়ও সেই বিচারের কথা মনে রাখা উচিত।
- রাত বিশ্রামের জন্য আর দিন উপার্জনের জন্য। এই প্রাকৃতিক নিয়ম মেনে চলা সুন্নাহর অংশ এবং স্বাস্থ্যের জন্যও কল্যাণকর।
- আল্লাহর কুদরত নিয়ে চিন্তা করা (তাফাক্কুর) ঈমান মজবুত করার অন্যতম মাধ্যম।

সূরার প্রথমাংশে (১–১৬) আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের দুটি সন্দেহের জবাব দিয়েছেন। প্রথম সন্দেহ, সবাই মাটিতে মিশে যাওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি কীভাবে সম্ভব? এর উত্তরে তিনি আসমান, জমিন, পাহাড়, রাত-দিন ও বৃষ্টির মতো বিশাল নিদর্শন তুলে ধরেছেন। প্রথমবার সৃষ্টি তো ছিল সম্পূর্ণ নজিরবিহীন, কোনো নমুনা সামনে ছিল না। যিনি নমুনা ছাড়াই এত কিছু বানাতে

পেরেছেন, দ্বিতীয়বার বানানো তাঁর জন্য কঠিন হবে, এ ধারণা নিতান্তই ভুল। আর আল্লাহর কাছে নতুন-পুরাতনের কোনো তফাতই নেই।

দ্বিতীয় সন্দেহ, কিয়ামত আদৌ আসবে কি না। এর জবাব সপ্তদশ আয়াত থেকে শুরু হয়েছে।

❖ **সূরা নাবা, আয়াত ১৭**

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَٰتًا ﴿١٧﴾

[১৭] নিশ্চয় বিচার দিবস নির্ধারিত রয়েছে।

আয়াত ১৭: ফয়সালার দিন নির্ধারিত

'ইয়াওমুল ফাসল' অর্থ পার্থক্য ও ফয়সালার দিন। সেদিন সত্য-মিথ্যা, জুলুম-ইনসাফ, ঈমান-কুফর সব আলাদা হয়ে যাবে এবং আল্লাহ চূড়ান্ত রায় ঘোষণা করবেন। আয়াতে বলা হয়েছে, এই দিনের একটি নির্ধারিত সময় (মীকাত) আছে। অর্থাৎ কিয়ামত কবে হবে তা আল্লাহ তাআলা ঠিক করে রেখেছেন এবং সেই সময়ে তা অবশ্যই সংঘটিত হবে।

কিয়ামতের সময় নিয়ে মানুষের কৌতূহল যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এর জ্ঞান কেবল আমার রবের কাছেই (সূরা আ'রাফ ৭:১৮৭)। সূরা লুকমানের শেষ আয়াতেও বলা হয়েছে, কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে (৩১:৩৪)। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও এর নির্দিষ্ট সময় জানতেন না। জিবরীল আলাইহিস সালামের প্রসিদ্ধ হাদীসে যখন তাঁকে কিয়ামত কবে হবে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি উত্তরে বললেন, যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সে প্রশ্নকারীর চেয়ে বেশি জানে না (সহীহ মুসলিম)।

তাই কেউ যদি কিয়ামতের সাল-তারিখ ঘোষণা করে, সেটি তার অজ্ঞতারই প্রমাণ। ইতিহাসে বহুবার এমন ঘোষণা এসেছে এবং প্রতিবারই তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। এ ধরনের কথা ইসলামকে মানুষের কাছে হাস্যকর করে তোলে। সঠিক জ্ঞান ছাড়া দ্বীনের কথা বলার ক্ষতি এখানেই।

একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কবে? তিনি সরাসরি উত্তর না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? সাহাবী বললেন, তেমন বড় কোনো আমল নেই, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো, তাঁর সঙ্গেই থাকবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এই হাদীস আমাদের শেখায়, কিয়ামত কবে হবে, তা নিয়ে ব্যস্ত থাকার চেয়ে নিজের প্রস্তুতি নিয়ে ভাবাই বেশি জরুরি। কিয়ামত তো নির্ধারিত সময়েই আসবে। আমার সামনে প্রশ্ন একটাই, সেদিন আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর জন্য আমি কতটা তৈরি।

আরেকটি হাদীসে এসেছে, একজন কিয়ামতের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন আমানত নষ্ট করা হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো। জিজ্ঞেস করা হলো, আমানত কীভাবে নষ্ট হবে? তিনি বললেন, যখন দায়িত্ব অযোগ্য লোকের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তখন কিয়ামতের অপেক্ষা করো (সহীহ বুখারী)। অর্থাৎ তিনি সময় বলেননি, কিন্তু আলামত বলে দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে ইমাম মাহদী নিয়ে কিছু মানুষের বাড়াবাড়ির কথাও বলা দরকার। কিয়ামতের পূর্বে সংঘটিতব্য ফিতনা ও আলামত সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা অবশ্যই ভালো। কিন্তু ইমাম মাহদীর অপেক্ষার কথা বলে বলে দ্বীনের আজকের কাজ পিছিয়ে দেওয়া, কিংবা এ নিয়ে ভিত্তিহীন কাহিনী ছড়ানো গ্রহণযোগ্য নয়। ইতিহাসে ইমাম মাহদী হওয়ার দাবিদারও কম আসেনি। আমার দায়িত্ব হলো নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ইসলামের জন্য কাজ করে যাওয়া। কিয়ামত যখন আসার তখন আসবে, আর আমার আমলের ভিত্তিতেই আমার ফয়সালা হবে।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ১৮–২০

يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا ﴿١٨﴾

[১৮] যেদিন শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।

وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أَبْوَٰبًا ﴿١٩﴾

[১৯] আকাশ বিদীর্ণ হয়ে; তাতে বহু দরজা সৃষ্টি হবে।

وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ﴿٢٠﴾

[২০] এবং পর্বতমালা চালিত হয়ে মরীচিকা হয়ে যাবে।

আয়াত ১৮–২০: শিঙ্গায় ফুঁৎকার ও মহাপ্রলয়

অষ্টাদশ আয়াতে 'সূর' শব্দের অর্থ শিঙ্গা। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এটি শিঙ্গার মতো একটি বিশেষ যন্ত্র, যাতে ইসরাফীল আলাইহিস সালাম আল্লাহর নির্দেশে ফুঁ দেবেন (জামে তিরমিযী ও সুনানে আবু দাউদ)। এই ফুঁৎকারের পর মানুষ 'আফওয়াজ' অর্থাৎ দলে দলে আল্লাহর সামনে এসে জমায়েত হবে। আফওয়াজ হলো 'ফাওজ' (দল)-এর বহুবচন।

কুরআনের অন্যান্য সূরা, যেমন তাকভীর ও ইনফিতারে সেই মহাপ্রলয়ের চিত্র আছে। সূর্যের আলো নিভে যাবে, তারকারা খসে পড়বে, পাহাড় আপন জায়গা থেকে সরে যাবে। এখানে বলা হয়েছে, আসমান খুলে যাবে এবং তাতে বহু দরজা তৈরি হবে। আসমান ফেটে মাঝখানে দরজার মতো ফাঁক হয়ে যাবে। পাহাড়গুলো স্থানচ্যুত হয়ে চলতে শুরু করবে এবং শেষে 'সারাব' অর্থাৎ মরীচিকার মতো হয়ে যাবে। দূর থেকে পাহাড়ের মতো দেখা গেলেও কাছে গেলে কিছুই থাকবে না। সূরা ক্বারিআয় আল্লাহ তাআলা পাহাড়কে ধুনা তুলার মতো উড়ন্ত

বলেছেন (১০১:৫)। আজ যে পাহাড়কে আমরা অটল প্রতীক মনে করি, সেদিন তার কোনো অস্তিত্বই থাকবে না।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ২১–২৬

إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٢١﴾

[২১] নিশ্চয় জাহান্নাম প্রতীক্ষায় থাকবে

لِّلطَّاغِينَ مَآبًا ﴿٢٢﴾

[২২] সীমালংঘনকারীদের আশ্রয়স্থলরূপে।

لَّابِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ﴿٢٣﴾

[২৩] তারা তথায় শতাব্দীর পর শতাব্দী অবস্থান করবে।

لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٢٤﴾

[২৪] তথায় তারা কোন শীতল এবং পানীয় আস্বাদন করবে না

إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٢٥﴾

[২৫] কিন্তু ফুটন্ত পানি ও পূঁজ পাবে।

جَزَآءً وِفَاقًا ﴿٢٦﴾

[২৬] পরিপূর্ণ প্রতিফল হিসেবে।

আয়াত ২১–২৬: জাহান্নাম এবং সীমালঙ্ঘনকারীদের প্রতিফল

একবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, জাহান্নাম 'মিরসাদ'। এর অর্থ ওঁত পেতে থাকার স্থান, অর্থাৎ প্রতীক্ষারত। জাহান্নাম যেন অপেক্ষা করছে কারা তার কাছে আসবে। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, সীমালঙ্ঘনকারীদের (তাগীন) জন্য সেটিই 'মাআব', অর্থাৎ ফিরে যাওয়ার ঠিকানা।

ত্রয়োবিংশ আয়াতে এসেছে 'আহকাব'। এটি 'হুকব'-এর বহুবচন, যার অর্থ দীর্ঘ যুগ বা অতি দীর্ঘ সময়কাল। আয়াতে বলা হয়েছে, তারা সেখানে যুগের পর যুগ অবস্থান করবে। এর দ্বারা শাস্তির সময়সীমা শেষ হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত নেই। কুরআনের অন্য আয়াতগুলোতে কাফিরদের জাহান্নামে চিরকাল থাকার কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে (যেমন সূরা নিসা ৪:১৬৯, সূরা আহযাব ৩৩:৬৫)। তাই এই আয়াতের অর্থ হলো, তারা এমন একের পর এক যুগ কাটাবে, যার কোনো শেষ হবে না।

চতুর্বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, সেখানে তারা ঠান্ডা কিছু আস্বাদন করবে না, পানীয়ও পাবে না। আগুনে পোড়ার সেই যন্ত্রণায় তারা পানি পানি করে চিৎকার করবে। তখন তাদের দেওয়া হবে

‘হামীম’ অর্থাৎ ফুটন্ত পানি এবং ‘গাস্সাক’, যা জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পূঁজ-রক্ত-ঘামের মতো ঘৃণ্য তরল। এটি কোনো রূপকথার গল্প নয়, বাস্তব সংবাদ। কুরআন যে জাহান্নামের কথা বলছে, তা ঘটবে।

এই শাস্তির কঠোরতা বোঝাতে কুরআনের অন্য এক আয়াতের কথা স্মরণ করা যায়। সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ বলেছেন, তাদের গায়ে যদি তোমার রবের আযাবের সামান্য একটু ছোঁয়াও লাগে, তারা বলে উঠবে, ‘হায় আমাদের দুর্ভোগ! আমরা তো জালিম ছিলাম’ (২১:৪৬)। ‘নাফহা’ বলা হয় এমন হালকা ঝলক বা বাতাসের ঝাপটাকে, যা দরজা বন্ধ করার সময় মুখে এসে লাগে। জাহান্নামের আযাবের সেই সামান্য ঝাপটাতেই তারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করে বসবে। শাস্তির তীব্রতায় মানুষের মুখ দিয়ে যেন আপনা-আপনি স্বীকারোক্তি বেরিয়ে আসে।

কেউ ভাবতে পারে, এত কষ্টে তো মৃত্যু এসে সব শেষ করে দেবে। কিন্তু হাদীসে আছে, জান্নাতী ও জাহান্নামীরা নিজ নিজ ঠিকানায় পৌঁছে যাওয়ার পর মৃত্যুকে একটি ভেড়ার আকৃতিতে এনে জান্নাত ও জাহান্নামের মাঝখানে জবাই করে দেওয়া হবে। তারপর ঘোষণা হবে, হে জান্নাতবাসী, তোমাদের জন্য চিরস্থায়ী জীবন, আর কোনো মৃত্যু নেই। হে জাহান্নামবাসী, তোমাদের জন্যও চিরস্থায়ী জীবন, আর কোনো মৃত্যু নেই (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। মৃত্যুই আর থাকবে না, তাই জাহান্নামীর শাস্তি থেকে কোনো মুক্তি নেই।

ষড়বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘জাযাআন বিফাকা’ অর্থাৎ এটি যথাযথ ও উপযুক্ত প্রতিফল। যে অপরাধ তারা করেছে, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই তাদের এই শাস্তি। আল্লাহ এখানে সামান্যতম অবিচার করবেন না।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ২৭–৩০

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿٢٧﴾

[২৭] নিশ্চয় তারা হিসাব-নিকাশ আশা করত না।

وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا ﴿٢٨﴾

[২৮] এবং আমার আয়াতসমূহে পুরোপুরি মিথ্যারোপ করত।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿٢٩﴾

[২৯] আমি সবকিছুই লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষিত করেছি।

فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿٣٠﴾

[৩০] অতএব, তোমরা আস্বাদন কর, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বৃদ্ধি করব।

আয়াত ২৭–৩০: শাস্তির কারণ

পরের আয়াতগুলোতে শাস্তির কারণ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম কারণ, তারা হিসাব-নিকাশের আশা রাখত না। অর্থাৎ আল্লাহর সামনে জবাবদিহির কোনো ভয় তাদের ছিল না। দ্বিতীয় কারণ, তারা আল্লাহর আয়াত বা নিদর্শনকে পুরোপুরি মিথ্যা বলে উড়িয়ে দিত। এর ফলেই তারা জুলুম, অন্যায় ও অত্যাচারে লিপ্ত হতো।

আমাদের অবস্থা কি অনেকটা এমন নয়? আমরা মুখে আখিরাতে বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই বিশ্বাস অনেক দুর্বল। কিয়ামতের জবাবদিহিতে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস থাকলে কেউ হাজার কোটি টাকা চুরি করতে পারত না। অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, অন্যের অধিকার হরণ করা, সম্ভব হতো না। আসলে আমরা ভাবি, দুনিয়ায় যদি বেঁচে যাই তাহলেই বেঁচে গেলাম। আখিরাতের বিশ্বাস দুর্বল হলেই অপরাধ করার সাহস বাড়ে।

এজন্য জান্নাত-জাহান্নামের আলোচনা আমাদের মজলিসে থাকা দরকার। অনেকে ভাবেন, জাহান্নামের কথা বললে মন ছোট হয়ে যায়, মৃত্যুর কথা শুনলে দুনিয়ার কাজে মন বসে না। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা স্বাদ বিনাশকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো (জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী)। মৃত্যুর স্মরণই উপদেশের জন্য যথেষ্ট। জান্নাত-জাহান্নামের কথা স্পষ্টভাবে জানলে মনে ভালো কাজের স্পৃহা জাগে এবং অন্যায় থেকে বাঁচার ভয় সৃষ্টি হয়। সে কারণেই আল্লাহ সব নবীকে 'বাশীর' (সুসংবাদদাতা) ও 'নাযীর' (সতর্ককারী) করে পাঠিয়েছেন। শুধু সুসংবাদ দিলে মানুষ লাগামহীন আশায় ডুবে যেত, আর শুধু ভয় দেখালে সে নিরাশ হয়ে যেত। তাই এই দুইয়ের ভারসাম্য জরুরি।

উনত্রিংশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'আমি সবকিছু লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেছি।' এখানে কোনো কিছুই বাদ পড়ে না। রাতের অন্ধকারে কেউ দেখছে না ভেবে যা কিছুই করা হোক, কোনো সিসিটিভি ক্যামেরা না থাকলেও, একাকী যে ভালো কাজ করা হয়েছে, যে গোপন অন্যায় করা হয়েছে, সবই আল্লাহর কাছে লেখা আছে। মানুষ সেদিন নিজের আমলনামা দেখে বিস্মিত হয়ে বলবে, এ কেমন গ্রন্থ, ছোট-বড় কিছুই ছাড়েনি (সূরা কাহফ ১৮:৪৯)।

ত্রিংশ আয়াতটি জাহান্নামবাসীদের সম্পর্কে কুরআনের অন্যতম ভয়াবহ আয়াত। আল্লাহ বলবেন, 'অতএব, তোমরা আস্বাদন করো। আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বাড়াতে থাকব।' কেউ ভাবতে পারে, শুরুতে হয়তো কষ্ট বেশি হবে, পরে ধীরে ধীরে কমে যাবে। তা নয়। জাহান্নামের আগুনের ইন্ধন কখনো ফুরিয়ে যাবে না। জ্বালানি কমে আগুন ঝিমিয়ে পড়বে, এমন কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং শাস্তি ক্রমেই বাড়তে থাকবে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কিয়ামতের নির্ধারিত সময় একমাত্র আল্লাহ জানেন। সাল-তারিখ ঘোষণা করা অজ্ঞতা, আর এর পেছনে সময় নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আসল কাজ হলো নিজের প্রস্তুতি।
- কিয়ামতের আলামত জানা ভালো, কিন্তু ইমাম মাহদী বা অন্য কোনো বিষয়ের অপেক্ষায় থেকে দ্বীনের আজকের কাজ ফেলে রাখা ঠিক নয়।
- আখিরাতের হিসাবে সত্যিকারের বিশ্বাস থাকলে মানুষ বড় অপরাধ থেকে বেঁচে থাকে। অপরাধের মূল কারণ বিশ্বাসের দুর্বলতা।
- জান্নাত-জাহান্নাম ও মৃত্যুর আলোচনা আমাদের মজলিস ও পারিবারিক আলাপে থাকা উচিত। এতে ঈমান মজবুত হয়, আমলের স্পৃহা বাড়ে।
- আমাদের প্রতিটি কাজ, গোপন হোক বা প্রকাশ্য, আল্লাহর কাছে লিপিবদ্ধ আছে।
- দুনিয়ার জীবন স্বপ্নের ঘোরের মতো। প্রকৃত জীবন শুরু হবে মৃত্যুর পর চোখ খুললে। এই ঘোর কাটার আগেই নিজেকে সংশোধন করা জরুরি।

আল্লাহ তাআলার একটি সুন্দর রীতি হলো, কুরআনে যেখানে তিনি জাহান্নামের আলোচনা করেন, সেখানে জান্নাতের কথাও বলেন। সূরা ওয়াকিয়া ও সূরা আর-রহমানেও এই ধারা চোখে পড়ে। সূরা নাবার ১৭ থেকে ৩০ আয়াতে সংক্ষেপে জাহান্নামের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এখন ৩১ নম্বর আয়াত থেকে তেমনি সংক্ষেপে জান্নাতের নিয়ামতের বর্ণনা শুরু হচ্ছে। এতে কেউ শুধু ভয়ের কথা শুনে এ ধারণা করে না বসে যে ইসলাম কেবল ভয়ই দেখায়, আশার কোনো বাণী এতে নেই।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ৩১

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٣١﴾

[৩১] পরহেযগারদের জন্যে রয়েছে সাফল্য।

আয়াত ৩১: মুত্তাকীদের সফলতা

'মাফায' শব্দের অর্থ সফলতা বা মুক্তির স্থান। আমরা সফলতার নানা অর্থ করি। কেউ সম্পদ জমানোকে সফলতা মনে করে, কেউ ক্ষমতা, পদ ও খ্যাতিকে। কিন্তু কুরআন প্রকৃত সফলতার সংজ্ঞা দিয়েছে অন্যভাবে। সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হলো এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হলো, সেই-ই প্রকৃত সফল (৩:১৮৫)। দুনিয়ায় কেউ বিপুল সম্পদ ও ক্ষমতার মালিক হলো, কিন্তু মৃত্যুর পর তার জন্য অপেক্ষা করছে জাহান্নাম, তাহলে সেটিই চূড়ান্ত ব্যর্থতা।

মুত্তাকী তাঁরাই, যাঁরা আল্লাহকে ভয় করে তাঁর হুকুম মেনে চলেন এবং নিষেধ থেকে বিরত থাকেন। এখান থেকে জান্নাতের নিয়ামতগুলো একটি একটি করে বর্ণনা করা হচ্ছে।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ৩২–৩৪

حَدَآئِقَ وَأَعۡنَٰبٗا ﴿٣٢﴾

[৩২] উদ্যান, আঙ্গুর

وَكَوَاعِبَ أَتۡرَابٗا ﴿٣٣﴾

[৩৩] সমবয়স্কা, পূর্ণযৌবনা তরুণী।

وَكَأۡسٗا دِهَاقٗا ﴿٣٤﴾

[৩৪] এবং পূর্ণ পানপাত্র।

আয়াত ৩২–৩৪: বাগান, আঙুর, সমবয়স্কা সঙ্গিনী ও পূর্ণ পানপাত্র

প্রথম নিয়ামত 'হাদাইক', অর্থাৎ বাগান-বাগিচা। আর বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'আ'নাব' (আঙুর)। জান্নাতে নানা ফল থাকবে, তবু আঙুরের নাম নেওয়ার কারণ হলো, তা অভিজাত ও জনপ্রিয় একটি ফল। কুরআনে জান্নাতের নিয়ামতের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা প্রায় সর্বত্র দুনিয়ার পরিচিত ফলের নাম উল্লেখ করেছেন।

সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, জান্নাতবাসীদের যখনই কোনো ফল খেতে দেওয়া হবে, তারা বলবে, এ তো সেই ফল, যা আমাদের আগে দেওয়া হয়েছিল। অথচ সেগুলো হবে একে অপরের সাদৃশ্যপূর্ণ (২:২৫)। এর একটি তাৎপর্য আছে। আমরা নতুন কোনো ফল দেখলে প্রথমে একটু দ্বিধায় পড়ি, খাব কি না, স্বাদ কেমন হবে। এই ফল-সংকোচ মানুষের স্বভাব। জান্নাতবাসীর যেন এমন কোনো সংকোচ না হয়, তাই ফলগুলো দেখতে পরিচিত রূপের হবে। কিন্তু স্বাদে হবে অতুলনীয়। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এক কামড়ে একরকম স্বাদ, পরের কামড়ে আরেকরকম। দুনিয়ার আঙুরের সঙ্গে নামে ও আকারে মিল থাকলেও জান্নাতের আঙুরের স্বাদ দুনিয়ার আঙুরের মতো নয়।

দ্বিতীয় নিয়ামত 'কাওয়াইব আতরাবা'। 'কাওয়াইব' অর্থ পূর্ণ যৌবনবতী, আর 'আতরাব' অর্থ সমবয়স্ক। জান্নাতবাসীদের জন্য থাকবে পূর্ণ যৌবনা সঙ্গিনীরা। আরও একটি বিষয় এখানে জেনে রাখা ভালো। জান্নাতে সবার বয়স সমান থাকবে। হাদীসে এসেছে, জান্নাতবাসীরা প্রবেশ করবে লোমহীন ও শ্মশ্রুহীন, সুরমা-টানা চোখের অধিকারী, তেত্রিশ বছরের তরুণ হিসেবে (জামে তিরমিযী)। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ জান্নাতী পর্যন্ত সবাই সেই বয়সে থাকবে। দাদা ও নাতির বয়স হবে সমান। কারণ সেখানে মৃত্যু নেই, বার্ধক্যও নেই। কেউ কখনো বুড়িয়ে যাবে না।

তৃতীয় নিয়ামত 'কা'সান দিহাকা', অর্থাৎ কানায় কানায় পূর্ণ পানপাত্র। জান্নাতের পানপাত্র কখনো খালি হবে না। সদা প্রস্তুত থাকবে অতিথিসেবার জন্য। সূরা মুহাম্মাদে জান্নাতের চার ধরনের

নহরের কথা বলা হয়েছে। এমন পানির নহর, যা কখনো দূষিত হয় না। দুধের নহর, যার স্বাদ কখনো বদলায় না। পানকারীদের জন্য সুস্বাদু শরাবের নহর, যাতে মাথাব্যথা বা মাতলামি নেই। আর খাঁটি স্বচ্ছ মধুর নহর (৪৭:১৫)।

❖ **সূরা নাবা, আয়াত ৩৫–৩৬**

لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّٰبًا ﴿٣٥﴾

[৩৫] তারা তথায় অসার ও মিথ্যা বাক্য শুনবে না।

جَزَآءً مِّن رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ﴿٣٦﴾

[৩৬] এটা আপনার পালনকর্তার তরফ থেকে যথোচিত দান

আয়াত ৩৫–৩৬: অনর্থক কথাবিহীন পরিবেশ ও উপযুক্ত প্রতিদান

পঞ্চত্রিংশ আয়াতে একটি অসাধারণ নিয়ামতের কথা বলা হয়েছে। জান্নাতে কেউ কোনো অর্থহীন কথা শুনবে না, মিথ্যা কথাও শুনবে না। দুনিয়ায় আমরা একসঙ্গে বসলে খোঁচা দিয়ে কথা বলি, পেছনে সমালোচনা করি, কটু কথায় কষ্ট দিই, তিরস্কার করি। জান্নাতে এসবের কোনো সুযোগই থাকবে না। সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে, তারা শুধু 'সালাম, সালাম' বাণী শুনবে (৫৬:২৬)। ফেরেশতারা তাদের সালাম জানাবে, তারা একে অপরকে সালাম জানাবে, সবখানে শান্তির বার্তা।

ষট্‌ত্রিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, এসব আপনার রবের পক্ষ থেকে প্রতিদান, 'আতাআন হিসাবা'। এর অর্থ যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত দান। অর্থাৎ আল্লাহ জান্নাতীদের প্রাপ্য পুরোপুরি, কোনো কমতি ছাড়াই বুঝিয়ে দেবেন।

আমরা দুনিয়ার তুচ্ছ আনন্দে এত ডুবে থাকি যে জান্নাতের এসব নিয়ামত আমাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায়। অথচ দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী নোংরা সুখের পেছনে ছুটে আমরা অনন্তকালের নিয়ামত থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। এই নিয়ামতগুলো যদি আমাদের চোখের সামনে থাকত, তাহলে আমাদের আচরণ বদলে যেত। আমি চোখ হেফাজত করি, কারণ আমার সামনে জান্নাতের প্রতিশ্রুত নিয়ামত আছে। আমি অন্যের জমির আইল ঠেলে সামান্য জমি দখল করি না, কারণ জান্নাতের বিশাল বাগানের তুলনায় এ জমি কিছুই নয়। ঘুষ, দুর্নীতি, লোভ-লালসা এসব প্রবণতা কমতে শুরু করবে যখন জান্নাতের নিয়ামত নিয়ে আমরা নিয়মিত ভাবব। এজন্য জান্নাতের বিবরণ সংবলিত নির্ভরযোগ্য বই পড়া ভালো এবং জান্নাতের আয়াতগুলো মাঝে মাঝে তিলাওয়াত ও মুখস্থ রাখা উচিত।

আরেকটি কথা। অনেক সময় আমরা ভাবি, জান্নাতে যেতে তো আরও অনেক বছর বাকি, এত দূরের জিনিস নিয়ে আজ ভাবার কী আছে। অথচ মৃত্যু কখন আসবে তা কেউ জানে না। যুবক

মারা যাচ্ছে, শিশু মারা যাচ্ছে, যেকোনো মুহূর্তে মানুষ চলে যাচ্ছে। আজ কেউ ঠিক করল, কাল থেকে ভালো হয়ে যাবে, আর দুদিন পরই তার মৃত্যু এসে গেল। প্রকৃত অর্থে জান্নাত আমাদের থেকে খুব দূরে নয়। কিছুটা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার ব্যাপার মাত্র। মৃত্যু আসার পরই ফয়সালা হয়ে যাবে, আমি মুত্তাকী ছিলাম কি না।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ৩৭–৩৮

رَّبِّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا ٱلرَّحۡمَٰنِۖ لَا يَمۡلِكُونَ مِنۡهُ خِطَابٗا ٣٧

[৩৭] যিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুর পালনকর্তা, দয়াময়, কেউ তাঁর সাথে কথার অধিকারী হবে না।

يَوۡمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ صَفّٗاۖ لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنۡ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَقَالَ صَوَابٗا ٣٨

[৩৮] যেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দিবেন, সে ব্যতিত কেউ কথা বলতে পারবে না এবং সে সত্যকথা বলবে।

আয়াত ৩৭–৩৮: সেদিনের নিস্তব্ধতা

সপ্তত্রিংশ আয়াতে আল্লাহ নিজের পরিচয় দিয়েছেন, তিনি আসমান, জমিন ও এ দুইয়ের মাঝের সবকিছুর রব, পরম দয়াময় (রাহমান)। এরপর বলা হয়েছে, সেদিন কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস করবে না। 'খিতাব' অর্থ সম্বোধন বা কথা বলার অধিকার। সেদিনের পরিস্থিতি এমন থমথমে হবে যে কেউ ইশারাতেও কিছু বলতে পারবে না।

অষ্টত্রিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, সেদিন 'রূহ' ও ফেরেশতারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে 'রূহ' অর্থ জিবরীল আলাইহিস সালাম। তাঁর মর্যাদার কারণে ফেরেশতাদের থেকে আলাদা করে নাম নেওয়া হয়েছে। সেদিন কেউ কথা বলতে পারবে না, কেবল সে ছাড়া, যাকে দয়াময় আল্লাহ অনুমতি দেবেন এবং যে সঠিক কথা বলবে। সুপারিশের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ সুপারিশ করতে পারবে না, যেমন আয়াতুল কুরসীতে বলা হয়েছে (২:২৫৫)। আর যাকে অনুমতি দেওয়া হবে, সে যতটুকু বৈধ ততটুকুই বলবে। বানিয়ে কিছু বলে আল্লাহকে বিভ্রান্ত করার কোনো সুযোগ সেখানে নেই। যা ঘটেছে, সবকিছুর সাক্ষী আল্লাহ নিজেই রেখেছেন।

❖ সূরা নাবা, আয়াত ৩৯–৪০

ذَٰلِكَ ٱلۡيَوۡمُ ٱلۡحَقُّۖ فَمَن شَآءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِۦ مَـَٔابًا ٣٩

[৩৯] এই দিবস সত্য। অতঃপর যার ইচ্ছা, সে তার পালনকর্তার কাছে ঠিকানা তৈরী করুক।

إِنَّآ أَنذَرۡنَٰكُمۡ عَذَابٗا قَرِيبٗا يَوۡمَ يَنظُرُ ٱلۡمَرۡءُ مَا قَدَّمَتۡ يَدَاهُ وَيَقُولُ ٱلۡكَافِرُ يَٰلَيۡتَنِي كُنتُ تُرَٰبَۢا ٤٠

[৪০] আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম, যেদিন মানুষ প্রত্যেক্ষ করবে যা সে সামনে প্রেরণ করেছে এবং কাফের বলবেঃ হায়, আফসোস-আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম।

আয়াত ৩৯–৪০: সতর্কবাণী ও কাফিরের আফসোস

ঊনচল্লিশতম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যালিকাল ইয়াওমুল হাক্ক’, অর্থাৎ সেদিন সত্য, সুনিশ্চিত। তা অবশ্যই আসবে। তাই যে চায়, সে যেন তার রবের কাছে আশ্রয়স্থল তৈরি করে নেয়। অর্থাৎ যে জান্নাতে নাজাত পেতে চায়, সে যেন সেজন্য আমল করে।

সেদিন কোনো সুপারিশকারী নিজে থেকে কারও পক্ষ নিতে পারবে না। প্রত্যেকে প্রত্যেকের কাছ থেকে পালাবে। ভাই ভাইয়ের কাছ থেকে, মা-বাবার কাছ থেকে, স্ত্রী ও সন্তানের কাছ থেকে (সূরা আবাসা ৮০:৩৪–৩৬)। সূরা মাআরিজে বলা হয়েছে, অপরাধী সেদিন চাইবে, সন্তান, স্ত্রী, ভাই ও আপনজন, এমনকি পৃথিবীর সব মানুষকে মুক্তিপণ হিসেবে দিয়ে হলেও যদি সে নিজে শাস্তি থেকে বাঁচতে পারে (৭০:১১–১৪)। সেখানে কোনো দল, নেতা বা পরিচয় কাজে আসবে না। অনেকে মনে করে, কোনো দলীয় পরিচয় বা আদর্শের ওপর মৃত্যুবরণ করলেই বুঝি আল্লাহর কাছে নাজাত মিলে যাবে। আখিরাতে নাজাতের একমাত্র মাপকাঠি ঈমান ও আমল।

চল্লিশতম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘আমি তোমাদেরকে আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম।’ সেদিন প্রত্যেক মানুষ নিজ হাতে যা পাঠিয়েছে তা দেখবে। দুনিয়ায় মানুষ আমাকে হাজী সাহেব বলত, মুসল্লি বলত, ভালো মানুষ বলত। কিন্তু আসলে আমি কী ছিলাম? আমার মনের অবস্থা কেমন ছিল? আমি কি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করতাম, না মানুষের প্রশংসা পাওয়ার জন্য? সব সেদিন প্রকাশ পেয়ে যাবে। শুধু নামের শুরুতে ‘মুহাম্মাদ’ আর শেষে ‘ইসলাম’ থাকলে মুসলমান হওয়া যায় না। পুরো জীবনকে আল্লাহর হুকুমের কাছে সঁপে দিতে হয়।

এখানে একটি দৃষ্টান্ত বুঝতে সাহায্য করবে। একজন প্রবাসী বিদেশে পরিশ্রম করে টাকা দেশে পাঠায়। কিন্তু যদি তিনি জাল টাকা পাঠান, তাহলে তা কারও অ্যাকাউন্টে জমা হবে না। ঠিক তেমনি আমরা এই দুনিয়ায় প্রবাসী। আমাদের আমল যদি লৌকিকতা (রিয়া), ভুল পদ্ধতি বা বিদআতে ভরা হয়, তাহলে তা আল্লাহর কাছে জমা হবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম বলেছেন, আমলসমূহ নিয়তের ওপর নির্ভরশীল (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। চল্লিশ বছর নামাজ পড়ে যদি দেখা যায়, একটি সিজদাও কবুল হয়নি, সেটি কত বড় ক্ষতি! এজন্য আমাদের আমলে ইখলাস (একনিষ্ঠতা) ও সুন্নাহর অনুসরণ থাকা অপরিহার্য।

আয়াতের শেষাংশে কাফিররা বলবে, 'হায়, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম!' এই আফসোসের কারণ কী? মুফাসসিরগণের একটি মত হলো, কিয়ামতের দিন যখন পশুদেরও একত্র করা হবে এবং তাদের পারস্পরিক জুলুমের বিচার হবে, তখন পশুদের বলা হবে মাটি হয়ে যেতে। কাফিররা সেই দৃশ্য দেখে আফসোস করবে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক হকদারের হক আদায় করা হবে, এমনকি শিংবিহীন ছাগলের পক্ষ থেকে শিংওয়ালা ছাগলের কাছ থেকেও বদলা নেওয়া হবে। পশুর জন্য জান্নাত-জাহান্নাম নেই। তাদের বিচারের পর মাটিতে পরিণত হওয়াই শেষ। তখন কাফির ভাববে, আমি যদি পশু হতাম, আজ আমার জাহান্নাম হতো না।

আরেকটি প্রসঙ্গ। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী, যেসব মুসলমান গুনাহের শাস্তি ভোগ করে জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে যাবে, তাদের দেখে কাফিররা আক্ষেপ করে বলবে, হায়, আমরা যদি মুসলমান হতাম। সূরা হিজরে এ প্রসঙ্গের ইঙ্গিত আছে (১৫:২)। তবে যারা কুফর ও শিরকের ওপর মারা যাবে, তাদের জন্য জান্নাতের কোনো পথ নেই। কুরআনে বলা হয়েছে, সুঁইয়ের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করা যেমন অসম্ভব, তেমনি তারাও জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না (সূরা আ'রাফ ৭:৪০)। আল্লাহ শিরকের গুনাহ কখনো ক্ষমা করেন না, তিনি এর বাইরে যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সূরা নিসা ৪:৪৮)। তাই সর্বাবস্থায় শিরক থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের প্রথম শর্ত।

পরিবারকে জান্নাতের পথে ডাকা

সূরার এই আলোচনা আমাদের একটি দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়। জান্নাত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা একা একা পূরণ করার বিষয় নয়। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (সূরা তাহরীম ৬৬:৬)। আমরা অনেক সময় ফজরের সময় সন্তানদের গভীর ঘুমে রেখে একা মসজিদে চলে আসি। কখনো তাদের গায়ের কম্বল আরও টেনে দিয়ে বলি, আরেকটু ঘুমাও, ঠান্ডা লেগে যাবে। অথচ তাদের ওপর নামাজ ফরজ, কিংবা নামাজ শেখানোর বয়স হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের আদেশ দিতে এবং দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে শাসন করতে বলেছেন (সুনানে আবু দাউদ)। আমি যদি সত্যিই সন্তানের শুভাকাঙ্ক্ষী হই, তাহলে আল্লাহর ভয়ে আমি যেভাবে উঠে আসছি, সেভাবে তাদেরও জাগাব। স্ত্রীকে বলব, আমি

জান্নাতে যেতে চাই, তোমাকে ছাড়া আমি জান্নাতে থাকতে পারব না, তুমিও নামাজের জন্য ওঠো। পরিবারকে একসঙ্গে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার ফিকির করা প্রত্যেক অভিভাবকের দায়িত্ব।

শিক্ষা ও উপদেশ

- প্রকৃত সফলতা হলো জাহান্নাম থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা। দুনিয়ার সম্পদ, ক্ষমতা ও খ্যাতি সফলতার মাপকাঠি নয়।
- জান্নাতের নিয়ামতের কথা নিয়মিত স্মরণ করলে লোভ, দুর্নীতি ও হারাম আকাঙ্ক্ষা কমে।
- মৃত্যু কখন আসবে কেউ জানে না। তাই আজ থেকেই জান্নাতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া দরকার।
- কিয়ামতের দিন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে বা সুপারিশ করতে পারবে না, কেউ কারও কাজে আসবে না।
- আমলে ইখলাস ও সুন্নাহর অনুসরণ জরুরি। লোক-দেখানো বা ভুল পদ্ধতির আমল আল্লাহর কাছে জমা হয় না।
- শিরক থেকে বেঁচে থাকা ঈমানের প্রথম শর্ত।
- নিজের জান্নাতের পাশাপাশি স্ত্রী-সন্তান ও পরিবারের জান্নাতের ফিকির করাও আমাদের দায়িত্ব।

অধ্যায় ২

সূরা নাযিয়াত

النازعات

কিয়ামতের শপথ, পুনরুত্থান ও ফিরআউনের পরিণতি

কুরআনের ৭৯তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৪৬টি

সূরা নাযিয়াত কুরআনের ৭৯তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ৪৬। মাক্কী সূরার সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এর মূল আলোচ্য বিষয় কিয়ামত, পুনরুত্থান ও বিচার দিবস। সূরাটি শুরু হয়েছে পাঁচটি শপথ দিয়ে। এরপর কিয়ামতের প্রথম ধাক্কার চিত্র, পুনরুত্থান নিয়ে মক্কার মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ এবং মূসা আলাইহিস সালাম ও ফিরআউনের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আরবিতে শপথের ধরন

প্রথম আয়াত বুঝতে একটু আরবি ব্যাকরণ জানা দরকার। আরবিতে ‘ওয়াও’ (و) অক্ষরটি সাধারণত ‘এবং’ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন ‘যায়দ ওয়া উমার’ (যায়দ ও উমার)। কিন্তু কখনো ওয়াও শপথের অর্থেও আসে। এটি চেনার সহজ উপায় হলো, ওয়াও যে শব্দের শুরুতে বসে, সেই শব্দের শেষে সাধারণত যের (জর) থাকে। যেমন ‘ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা’ (সূর্যের শপথ), ‘ওয়াত-তীনি’ (ডুমুরের শপথ)। এখানেও ‘ওয়ান-নাযিআতি’ শপথের জন্য এসেছে। অর্থ, ‘শপথ তাদের, যারা টেনে বের করে।’

আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিভিন্ন জায়গায় নানা সৃষ্টির শপথ করেছেন। সাধারণত মানুষ তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ কিছুর নামেই শপথ করে। কেউ সন্তানের নামে করে, কেউ মায়ের নামে। আল্লাহর কাছে অবশ্য কোনো কিছুই ‘বড়’ নয়, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু মানুষের কাছে যেসব সৃষ্টি বিস্ময়কর ও গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, তিনি সেগুলোর শপথ করে পরবর্তী কথাটির গুরুত্ব তুলে ধরেন। সূর্য, চাঁদ, রাত, দিন, ডুমুর, সবই এমন।

শপথের উদ্দেশ্য হলো পরের কথাটিকে সুনিশ্চিত করা, আমরাও যেমন আল্লাহর নামে শপথ করে বলি, কাজটি আমি অবশ্যই করব। আল্লাহর কথা শপথ ছাড়াও সত্য ও গুরুত্বপূর্ণ। তবু শপথ করে তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন, যা বলা হচ্ছে তা ঘটবেই।

তবে মনে রাখা দরকার, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির শপথ করতে পারেন, কিন্তু বান্দার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা জায়েয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করল, সে শিরক করল (জামে তিরমিযী,

সুনানে আবু দাউদ)। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে, মসজিদ বা মায়ের নামেও শপথ করা যাবে না। শপথ হবে কেবল আল্লাহর নাম, তাঁর কোনো গুণবাচক নাম বা সিফাতের নামে। কুরআনের নামে শপথ করা নিয়ে ফকীহদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে, কারণ কুরআন আল্লাহর কালাম ও তাঁর সিফাত।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ১–৫

وَٱلنَّٰزِعَٰتِ غَرۡقٗا ١

[১] শপথ সেই ফেরেশতাগণের, যারা ডুব দিয়ে আত্মা উৎপাটন করে

وَٱلنَّٰشِطَٰتِ نَشۡطٗا ٢

[২] শপথ তাদের, যারা আত্মার বাঁধন খুলে দেয় মৃদুভাবে

وَٱلسَّٰبِحَٰتِ سَبۡحٗا ٣

[৩] শপথ তাদের, যারা সন্তরণ করে দ্রুতগতিতে

فَٱلسَّٰبِقَٰتِ سَبۡقٗا ٤

[৪] শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে অগ্রসর হয় এবং

فَٱلۡمُدَبِّرَٰتِ أَمۡرٗا ٥

[৫] শপথ তাদের, যারা সকল কর্মনির্বাহ করে, কেয়ামত অবশ্যই হবে।

আয়াত ১–৫: ফেরেশতাদের নামে পাঁচ শপথ

অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এই পাঁচ আয়াতে ফেরেশতাদের নামে শপথ করা হয়েছে, যাঁরা আল্লাহর নির্দেশে মানুষের জান কবজ করেন এবং বিশ্ব পরিচালনার কাজ করেন। ব্যাখ্যাটি এভাবে:

প্রথম আয়াতে ‘নাযিআত’ অর্থ যারা টেনে বের করে, আর ‘গারকান’ অর্থ প্রচণ্ড শক্তিতে ও কঠোরভাবে। এখানে সেই ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা কাফিরদের প্রাণ কবজ করেন। কাফিরের রূহ বের হতে চায় না, এদিক-ওদিক পালাতে থাকে। ফেরেশতারা তখন তাকে কঠোরভাবে টেনে বের করেন।

দ্বিতীয় আয়াতে ‘নাশিতাত’ অর্থ যারা আলতোভাবে বাঁধন খুলে দেয়। এখানে সেই ফেরেশতারা উদ্দেশ্য, যাঁরা মুমিনের রূহ খুবই কোমলভাবে, নরমভাবে বের করেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, মুমিনের রূহ এমন সহজে বের হয়, যেমন মশক থেকে পানির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে (মুসনাদে আহমাদ)।

তৃতীয় আয়াতে 'সাবিহাত' অর্থ যারা সাঁতার কাটে। ফেরেশতারা যখন আসমান ও জমিনের মাঝে দ্রুতবেগে উড়ে যান, তখন এই চলা সাঁতারের মতো মনে হয়। চতুর্থ আয়াতে 'সাবিকাত' অর্থ যারা অগ্রসর হয়। একে অপরকে ছাড়িয়ে আল্লাহর আদেশ পালনে ছুটে যায়। পঞ্চম আয়াতে 'মুদাব্বিরাত' অর্থ যারা পরিচালনা করে। ফেরেশতারা আল্লাহর নির্দেশে জগতের বিভিন্ন কাজ সম্পাদন ও ব্যবস্থাপনা করেন।

এখানে আরেকটি বিষয় জেনে রাখা ভালো। আমরা সাধারণত জানি, মানুষের রূহ কবজকারী ফেরেশতার নাম মালাকুল মাউত। সূরা সাজদায় বলা হয়েছে, 'মালাকুল মাউত তোমাদের প্রাণ হরণ করবে' (৩২:১১)। প্রচলিত 'আজরাঈল' নামটি কুরআনে বা সহীহ হাদীসে পাওয়া যায় না। আর সব মানুষের জান শুধু একজন ফেরেশতা করেন, এমনটিও জরুরি নয়। এই আয়াতে বহুবচন 'নাযিআত' ও 'সাবিহাত' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে, অনেক ফেরেশতা এই কাজে নিয়োজিত। মালাকুল মাউত যেন তাঁদের অধিনায়ক, তিনি নির্দেশ দেন আর অন্য ফেরেশতারা কাজ সম্পাদন করেন। সূরা আনআমে বলা হয়েছে, 'আমার দূতেরা তার প্রাণ হরণ করে' (৬:৬১)। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, মুমিনের জন্য আসেন রহমতের ফেরেশতারা, আর কাফিরের জন্য আসেন আযাবের ফেরেশতারা (মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে আবু দাউদ)।

এই পাঁচ শপথের পরে যে কথা বলার জন্য শপথ করা হয়েছে, তা আয়াতে উহ্য, অর্থাৎ উল্লেখ নেই। বক্তব্যটি হলো, 'কিয়ামত অবশ্যই আসবে।' পরের আয়াতগুলোতে কিয়ামতের প্রাথমিক দৃশ্য দেখানো হচ্ছে।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ৬–৯

يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرَّاجِفَةُ ﴿٦﴾

[৬] যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী

تَتْبَعُهَا ٱلرَّادِفَةُ ﴿٧﴾

[৭] অতঃপর পশ্চাতে আসবে পশ্চাদগামী

قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ﴿٨﴾

[৮] সেদিন অনেক হৃদয় ভীত-বিহ্বল হবে।

أَبْصَٰرُهَا خَٰشِعَةٌ ﴿٩﴾

[৯] তাদের দৃষ্টি নত হবে।

আয়াত ৬–৯: প্রথম ও দ্বিতীয় ফুৎকার

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যেদিন প্রকম্পিতকারী প্রকম্পিত করবে।’ ‘রাজিফা’ অর্থ কম্পিত করা। এটি ইসরাফীল আলাইহিস সালামের প্রথম ফুৎকার, যাতে পৃথিবী ও আসমানের সবকিছু প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠবে। সূরা তাকভীর ও ইনফিতারের মতো অন্যান্য সূরায় এই ধ্বংসযজ্ঞের ছবি আছে। সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে যাবে, সমুদ্র উত্তাল হবে।

সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এর অনুগামী আসবে আরেকটি (ফুৎকার)।’ ‘রাদিফা’ অর্থ পরবর্তী বা অনুগামী। প্রথম ফুৎকারে আল্লাহ ছাড়া সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে। কিছুকাল পর দ্বিতীয় ফুৎকারে সবাই জীবিত হয়ে উঠবে। হাদীসে বর্ণিত আছে, দুই ফুৎকারের মাঝে ব্যবধান হবে চল্লিশ। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞেস করা হলো, চল্লিশ দিন? তিনি বললেন, আমি এড়িয়ে গেলাম, অর্থাৎ বলতে পারি না। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, চল্লিশ বছর? তিনি একই উত্তর দিলেন। মাস নিয়েও একই কথা বললেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তাই চল্লিশ কিসের, তা হাদীসে নির্দিষ্ট করা নেই।

অষ্টম ও নবম আয়াতে সেদিনের মানুষের অবস্থা বলা হয়েছে। সেদিন অনেক হৃদয় ‘ওয়াজিফা’, অর্থাৎ ভয়ে কম্পমান থাকবে। আর তাদের দৃষ্টি হবে ‘খাশিআ’, অবনত। এই অপমান ও লজ্জায় তারা চোখ তুলে তাকাতে পারবে না, কারণ তারা এই দিনটিকেই অস্বীকার করত। যে দিনকে তারা অবিশ্বাস করে এসেছে, সেটাই যখন চোখের সামনে এসে দাঁড়াল, লজ্জায় মাথা নিচু হওয়াই স্বাভাবিক।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ১০–১৪

يَقُولُونَ أَءِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴿١٠﴾

[১০] তারা বলেঃ আমরা কি উলটো পায়ে প্রত্যাবর্তিত হবই

أَءِذَا كُنَّا عِظَٰمًا نَّخِرَةً ﴿١١﴾

[১১] গলিত অস্থি হয়ে যাওয়ার পরও

قَالُوا۟ تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٢﴾

[১২] তবে তো এ প্রত্যাবর্তন সর্বনাশা হবে

فَإِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ ﴿١٣﴾

[১৩] অতএব, এটা তো কেবল এক মহা-নাদ

فَإِذَا هُم بِٱلسَّاهِرَةِ ﴿١٤﴾

[১৪] তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।

আয়াত ১০–১৪: মুশরিকদের বিদ্রূপ ও আল্লাহর জবাব

এখানে মক্কার মুশরিকদের কথা উদ্ধৃত করা হয়েছে। তারা বলত, ‘আমরা কি আগের অবস্থায় ফিরে যাব? যখন আমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়ে পরিণত হব?’ তাদের যুক্তি ছিল, কবরে মানুষের হাড় গলে-পচে মাটির সঙ্গে মিশে যায়। সেই মাটি থেকে আবার মানুষ কীভাবে উঠে আসবে?

এ প্রসঙ্গে একটি হাদীস বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের শরীরের সবকিছু মাটি খেয়ে ফেলে, কেবল মেরুদণ্ডের নিম্নভাগের ছোট্ট একটি হাড় (আজবুয যানাব) থাকে। তা থেকেই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। অবশ্য আল্লাহর কুদরত এই হাড়ের ওপর নির্ভরশীল নয়। তিনি যেকোনো উপায়ে মানুষকে আবার সৃষ্টি করতে সক্ষম।

আরও দেখুন, মুশরিকরা বিদ্রূপ করে বলত, ‘সেটা হলে তো সে প্রত্যাবর্তন বড়ই ক্ষতির (খাসিরা) হবে।’ অর্থাৎ যদি সত্যিই আমরা আবার জীবিত হই, তাহলে আমাদের জন্য সেটা বিপর্যয়। তারা নিজেরাই জানত, আখিরাতে বিশ্বাস না করে কেটেছে যে জীবন, সেই জীবনের হিসাব এলে তাদের ভালো কিছু হবে না। এই কথা বলেছিল ঠাট্টা করে, অথচ সত্য বলে ফেলেছিল।

আল্লাহ তাআলা এর জবাবে বলছেন, ‘এ তো কেবল একটি মহাবিস্ফোরণ (ধমক)।’ ‘যাজরা’ অর্থ প্রচণ্ড আওয়াজ বা ধমক। একবার সেই আওয়াজ হবে, আর ‘ফাইযা হুম বিস-সাহিরা’, অমনি সবাই উন্মুক্ত প্রান্তরে (সাহিরা) হাজির হয়ে যাবে। ‘সাহিরা’ শব্দের অর্থ খোলা সমতল ময়দান, যেখানে হাশরের জন্য সব মানুষ একত্র হবে। এই বিশাল কাণ্ড ঘটানোর জন্য আল্লাহর কোনো আয়োজনের প্রয়োজন নেই, একটি নির্দেশই যথেষ্ট।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ১৫–১৯

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰٓ ﴿١٥﴾

[১৫] মূসার বৃত্তান্ত আপনার কাছে পৌঁছেছে কি

إِذۡ نَادَىٰهُ رَبُّهُۥ بِٱلۡوَادِ ٱلۡمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٦﴾

[১৬] যখন তার পালনকর্তা তাকে পবিত্র তুয়া উপত্যকায় আহবান করেছিলেন

ٱذۡهَبۡ إِلَىٰ فِرۡعَوۡنَ إِنَّهُۥ طَغَىٰ ﴿١٧﴾

[১৭] ফেরাউনের কাছে যাও, নিশ্চয় সে সীমালংঘন করেছে।

فَقُلْ هَل لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

[১৮] অতঃপর বলঃ তোমার পবিত্র হওয়ার আগ্রহ আছে কি

وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿١٩﴾

[১৯] আমি তোমাকে তোমার পালনকর্তার দিকে পথ দেখাব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর।

আয়াত ১৫–১৯: মূসা আলাইহিস সালামের দাওয়াত

এখান থেকে নবী-রাসূলদের ঘটনা শুরু হচ্ছে। কুরআনে পূর্ববর্তী নবীদের ঘটনা বর্ণনার দুটি প্রধান উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, মক্কার মুশরিকদের শিক্ষা দেওয়া। দ্বিতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা ও সাহস জোগানো। তিনি নতুন কোনো নবী নন। তাঁর আগেও অনেক নবী এসেছেন এবং একই রকম অস্বীকার ও মিথ্যা অপবাদের মুখোমুখি হয়েছেন। মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনা কুরআনে সবচেয়ে বেশি বর্ণিত হয়েছে। অনেক সূরায় কোনো না কোনোভাবে তাঁর কথা এসেছে।

আল্লাহ বলছেন, 'আপনার কাছে কি মূসার বৃত্তান্ত পৌঁছেছে?' প্রশ্নটি আসলে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য। যেন বলা হচ্ছে, কুরাইশরা আপনার বিরোধিতা করছে, কিন্তু মূসাও তো ফিরআউনের মতো প্রতাপশালী বাদশাহর কাছে দাওয়াত নিয়ে গিয়েছিলেন। তিনিও একই ধরনের প্রতিকূলতার শিকার হয়েছিলেন।

সপ্তদশ আয়াতে বলা হয়েছে, তাঁর রব তাঁকে 'তুওয়া' নামক পবিত্র উপত্যকায় ডেকেছিলেন। এ ঘটনা সূরা ত্বহা ও সূরা কাসাসে বিস্তারিত এসেছে। মূসা আলাইহিস সালাম পরিবারকে নিয়ে সফরে ছিলেন। রাতের অন্ধকারে দূরে আগুন দেখে তিনি সেদিকে গেলেন। সেখানেই আল্লাহ তাঁকে নবুওয়াত দিলেন এবং ফিরআউনের কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন, 'তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, সে সীমালঙ্ঘন করেছে।'

পরের আয়াতে দাওয়াতের চমৎকার ভঙ্গি দেখা যায়। মূসাকে বলা হলো, তুমি ফিরআউনকে জিজ্ঞেস কোরো, 'তুমি কি পবিত্র হতে চাও? আমি কি তোমাকে তোমার রবের পথ দেখাব, যাতে তুমি তাঁকে ভয় করো?' সূরা ত্বহায় আল্লাহ আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, তোমরা তার সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলো, হয়তো সে উপদেশ গ্রহণ করবে বা ভয় পাবে (২০:৪৪)। এখানে দাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। যে ব্যক্তি নিজেকে 'রব' দাবি করে, তার সঙ্গেও প্রথমে প্রশ্নের আকারে, নম্র ভাষায় আলোচনা শুরু করতে বলা হয়েছে। আমরা কি আমাদের পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী বা সহকর্মীদের সঙ্গে এমন কোমলতা অবলম্বন করি?

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ২০–২৬

فَأَرَىٰهُ ٱلْءَايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٢٠﴾

[২০] অতঃপর সে তাকে মহা-নিদর্শন দেখাল।

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿٢١﴾

[২১] কিন্তু সে মিথ্যারোপ করল এবং অমান্য করল।

ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ﴿٢٢﴾

[২২] অতঃপর সে প্রতিকার চেষ্টায় প্রস্থান করল।

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿٢٣﴾

[২৩] সে সকলকে সমবেত করল এবং সজোরে আহ্বান করল

فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٤﴾

[২৪] এবং বললঃ আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।

فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْءَاخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰٓ ﴿٢٥﴾

[২৫] অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকালের ও ইহকালের শাস্তি দিলেন।

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰٓ ﴿٢٦﴾

[২৬] যে ভয় করে তার জন্যে অবশ্যই এতে শিক্ষা রয়েছে।

আয়াত ২০–২৬: নিদর্শন, অহংকার ও ধ্বংস

বিংশ আয়াতে মূসা আলাইহিস সালাম ফিরআউনকে 'বড় নিদর্শন' দেখালেন। এটি তাঁর লাঠির সাপে রূপান্তরিত হওয়ার মুজিযা। সে যুগে জাদুবিদ্যার প্রভাব ছিল প্রবল। মূসা আলাইহিস সালাম জাদুকর ছিলেন না। আল্লাহর ইচ্ছায় লাঠিটি সাপ হয়ে গেল। এত স্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও ফিরআউন ও তার দল ঈমান আনল না। বরং একবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে মিথ্যা বলল এবং অবাধ্য হলো।'

দ্বাবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর সে ঘুরে দাঁড়াল, ঠিকঠাক চেষ্টা করতে লাগল।' অর্থাৎ সে ঈমান আনার বদলে আরও দূরে সরে গেল এবং মূসার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠল। তার ভয় ছিল, না জানি সব জাদুকর মূসার পক্ষে চলে যায়। সূরা আ'রাফ ও ত্বহায় এই ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ত্রয়োবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, সে সবাইকে জমায়েত করল এবং ঘোষণা দিল।

চতুর্বিংশ আয়াতে সে বলল, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।' এই কথা সে বারবার বলে সবাইকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছিল।

পঞ্চবিংশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'ফলে আল্লাহ তাকে ইহকাল ও পরকালের শাস্তিতে পাকড়াও করলেন।' কোনো কোনো মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন, তার প্রথম ও শেষ কথার জন্য শাস্তি। প্রথম কথা 'আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না' এবং শেষ কথা 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব।' অন্য একটি ব্যাখ্যা হলো, দুনিয়ায় সাগরে ডুবে মরার শাস্তি আর আখিরাতে জাহান্নামের শাস্তি।

কুরআনের আরেক জায়গায় আল্লাহ ফিরআউনের লাশ সংরক্ষণের কথা বলেছেন, 'আজ আমি তোমার দেহ রক্ষা করব, যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য নিদর্শন হয়ে থাকো' (সূরা ইউনুস ১০:৯২)। এভাবে ইতিহাসে শুধু কল্পকাহিনী নয়, এক বাস্তব দৃষ্টান্ত আল্লাহ রেখে দিলেন। 'ফিরআউন' আসলে কারও ব্যক্তিনাম নয়, মিশরের শাসকদের উপাধি, যেমন রোমান সম্রাটদের 'কায়সার' বলা হতো। ষড়বিংশ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে আল্লাহকে যারা ভয় করে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।'

এই ঘটনা মক্কার মুশরিকদের জন্য সতর্কবার্তাও ছিল। তাদের কী আছে? মরুভূমির সাধারণ কিছু ব্যবসায়ী, ফিরআউনের বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যাদের কোনো তুলনাই চলে না। যে ফিরআউন এত ক্ষমতা সত্ত্বেও আল্লাহর হাতে ধ্বংস হলো, তার থেকে তারা কি শিক্ষা নেবে না?

আমাদের জন্যও এখানে ভাবার বিষয় আছে। ফিরআউনের ক্ষমতা ছিল বিশাল সাম্রাজ্যজোড়া। আর আমরা? পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশের মতো ছোট্ট দেশের নাম লেখার জায়গা পাওয়াই কঠিন। সেই ছোট্ট দেশের ছোট্ট একটি জেলা, একটি থানা, একটি ওয়ার্ডের সামান্য নেতৃত্ব পেয়েই আমরা অনেক সময় আল্লাহর বিরোধিতা শুরু করি। কখনো একটি মসজিদ কমিটির দায়িত্ব পেয়ে হক কথা বলতে বাধা দিই। সুদের বিরুদ্ধে কথা বলা যাবে না, কুরআনের আইনের কথা বলা যাবে না, সবাইকে খুশি রেখে বলতে হবে, এমন শর্ত চাপিয়ে দিই। সামান্য ক্ষমতা, তাও বড়জোর কয়েক বছরের, তারপর এমন অপমান আসে যে চেহারা দেখানোর জো থাকে না। ফিরআউন ছিল বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী, আমাদের কাছে সে পরিমাণ কিছুই নেই। তবু আমরা অহংকারে তার মতোই। আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আল্লাহ ফেরেশতাদের শপথ করে কিয়ামতের নিশ্চয়তা জানিয়েছেন। শপথের মাধ্যমে বক্তব্যের গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা বোঝানো হয়।
- বান্দার জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে শপথ করা নিষিদ্ধ।

- মৃত্যুর সময় মুমিনের রূহ সহজে বের হয়, আর কাফিরের রূহ কঠোরভাবে টেনে বের করা হয়।
- মৃত্যুর পর পুনরুত্থান নিশ্চিত। হাড় মাটির সঙ্গে মিশে গেলেও আল্লাহ সেখান থেকে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম।
- দাওয়াতের ক্ষেত্রে নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করতে হবে, এমনকি ফিরআউনের মতো জালিমের সঙ্গেও।
- নবীদের ঘটনা শুধু ইতিহাস নয়, আমাদের জন্য উপদেশ ও দ্বীনের পথে অবিচল থাকার প্রেরণা।
- ছোট ক্ষমতা পেয়েও অহংকারে আল্লাহর বিরোধিতা করা ফিরআউনের পথ। ক্ষমতা আল্লাহর আমানত।

সূরা নাযিয়াতের প্রথমাংশে মূসা আলাইহিস সালামের ঘটনার মাধ্যমে ফিরআউনের পরিণাম দেখানো হয়েছে। এখন দ্বিতীয়াংশে আবার পুনরুত্থানের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া হচ্ছে। মক্কার মুশরিকদের ঈমান না আনার প্রধান কারণ ছিল, তারা মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া ও বিচারের মুখোমুখি হওয়ায় বিশ্বাস করত না। তাদের ধারণা ছিল, মানুষ মরে মাটিতে মিশে গেলেই সব শেষ।

এই ধারণা আজও আছে, শুধু ভাষা বদলেছে। 'জীবন তো একটাই, যা করার করে নাও' জাতীয় কথায় আমরা সেই একই মনোভাবের ছায়া দেখতে পাই। অর্থাৎ জবাবদিহি নেই, তাই মন যা চায় করে ফেলো। কুরআন এই ভুল ধারণার জবাব দিয়েছে আল্লাহর অসীম কুদরতের নিদর্শন তুলে ধরে।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ২৭–৩৩

ءَأَنتُمۡ أَشَدُّ خَلۡقٗا أَمِ ٱلسَّمَآءُۚ بَنَىٰهَا ﴿٢٧﴾

[২৭] তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের, যা তিনি নির্মাণ করেছেন

رَفَعَ سَمۡكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾

[২৮] তিনি একে উচ্চ করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَأَغۡطَشَ لَيۡلَهَا وَأَخۡرَجَ ضُحَىٰهَا ﴿٢٩﴾

[২৯] তিনি এর রাত্রিকে করেছেন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং এর সূর্যালোক প্রকাশ করেছেন।

وَٱلۡأَرۡضَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ دَحَىٰهَآ ﴿٣٠﴾

[৩০] পৃথিবীকে এর পরে বিস্তৃত করেছেন।

أَخۡرَجَ مِنۡهَا مَآءَهَا وَمَرۡعَىٰهَا ﴿٣١﴾

[৩১] তিনি এর মধ্য থেকে এর পানি ও ঘাস নির্গত করেছেন

وَٱلۡجِبَالَ أَرۡسَىٰهَا ﴿٣٢﴾

[৩২] পর্বতকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন

مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِأَنۡعَٰمِكُمۡ ﴿٣٣﴾

[৩৩] তোমাদের ও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপকারার্থে।

আয়াত ২৭–৩৩: কে বেশি কঠিন সৃষ্টি, তোমরা না আসমান?

সপ্তবিংশ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুশরিকদের সরাসরি প্রশ্ন করছেন, 'তোমাদের সৃষ্টি করা বেশি কঠিন, না আসমান সৃষ্টি করা, যা তিনি নির্মাণ করেছেন?' যুক্তিটি সরল। যিনি এত বিশাল আসমান সৃষ্টি করেছেন, তাঁর কাছে সাড়ে তিন হাত মানুষকে আবার সৃষ্টি করা কীভাবে কঠিন হবে? আমরা বিশ-পঁচিশ ফুট চওড়া একটি ঘরের ছাদ খুঁটি ছাড়া তুলতে পারি না, অথচ কত বিশাল আসমান কোনো দৃশ্যমান খুঁটি ছাড়া দাঁড়িয়ে আছে (সূরা রা'দ ১৩:২)। সূরা মুলকে বলা হয়েছে, তুমি আসমানে কোনো ত্রুটি বা ফাটল দেখতে পাবে না, আবার চোখ ফিরিয়ে দেখো, কোনো ফাটল চোখে পড়ে কি না (৬৭:৩–৪)। আমরা ছাদ বানালে মশলা কম পড়লে ফাটল ধরে, আর যুগ যুগ ধরে আসমানের কোথাও কোনো ফাটল দেখা যায়নি, তা মেরামত করতেও হয়নি।

এখানে আরেকটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। মানুষের যুক্তি হলো, যে জিনিস একবার তৈরি হয়েছে, তা পুনরায় তৈরি করা আরও সহজ। আল্লাহর ক্ষেত্রে অবশ্য প্রথমবার ও দ্বিতীয়বারের কোনো পার্থক্য নেই। তাঁকে নকশা তৈরি করতে হয় না, স্থপতি ডাকতে হয় না, তিনি শুধু ইচ্ছা করেন আর তা হয়ে যায়। তাই কেউ যদি আল্লাহর জন্য পুনরায় সৃষ্টি করাকে কঠিন মনে করে, সে আল্লাহর কুদরতকে চিনতেই পারেনি।

আয়াতগুলোতে আল্লাহ আসমান ও জমিনের সৃষ্টির বিবরণ দিয়েছেন। আসমানকে তিনি উঁচু করেছেন ('সামকাহা') এবং সুবিন্যস্ত ও নিখুঁত করেছেন ('সাওওয়াহা')। রাতকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছেন এবং দিনের আলো প্রকাশ করেছেন। তারপর জমিনকে প্রশস্ত ও বিস্তৃত করেছেন ('দাহাহা')। এ থেকে প্রশ্ন আসে, আসমান আগে সৃষ্টি হয়েছে, না জমিন? কুরআনের কোথাও মনে হয় আসমান আগে, কোথাও আবার জমিন আগে। সব আয়াত একত্র করে মুফাসসিরগণ যে সমাধান দিয়েছেন তা হলো, জমিনের মূল উপাদান ও কাঠামো আগে সৃষ্টি হয়েছে (সূরা ফুসসিলাত ৪১:৯–১২)। তারপর আসমান সৃষ্টি হয়েছে। এরপর জমিনকে সম্প্রসারিত ও বাসযোগ্য করা হয়েছে। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই

ব্যাখ্যাই বর্ণিত আছে। আয়াতেও 'দাহাহা' (বিস্তৃত করেছেন) শব্দটি এসেছে 'বা'দা যালিক' (এরপর) যোগে।

এই জমিন থেকে তিনি পানি প্রবাহিত করেছেন এবং উদ্ভিদ ও চারণভূমি সৃষ্টি করেছেন (আয়াত ৩১)। জমিনকে স্থিতিশীল রাখতে পাহাড়কে পেরেকের মতো গেঁথে দিয়েছেন (আয়াত ৩২), যেমন সূরা নাবায় আমরা দেখেছি। আর আয়াত ৩৩ বলছে, এ সবই 'তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর কল্যাণের জন্য' ('মাতাআল লাকুম ওয়া লি-আনআমিকুম')। এত নিয়ামত পাওয়ার পরও কি মানুষ আল্লাহর ওপর ও তাঁর পুনরুত্থানের ক্ষমতার ওপর বিশ্বাস করবে না?

প্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে এখানে আরও একটি শিক্ষা আছে। মানুষ আজ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা তৈরি করছে, গবেষণাগারে কৃত্রিম মাংস উৎপাদন করছে। এসব দেখে কেউ কেউ অহংকারে ভাবতে পারে, আমরাই তো সব বানাতে পারি, আল্লাহর প্রয়োজন কী? অথচ মানুষ যা কিছু বানায়, সবই আল্লাহর সৃষ্ট উপাদান থেকে এবং তাঁর দেওয়া জ্ঞান ও সামর্থ্য ব্যবহার করে। কুরআনের চ্যালেঞ্জ আজও অটুট। সবাই মিলেও একটি মাছি সৃষ্টি করতে পারবে না (সূরা হজ্জ ২২:৭৩)। সত্যিকারের প্রাণ সৃষ্টি করার ক্ষমতা কোনো মানুষের নেই। হাদীসে এসেছে, পৃথিবীতে যখন 'আল্লাহ, আল্লাহ' বলার মতো কেউ থাকবে না, তখনই কিয়ামত হবে (সহীহ মুসলিম)। এমন একটি সময় আসতে পারে, যখন মানুষ নিজের আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ হয়ে স্রষ্টাকেই ভুলে যাবে।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ৩৪–৩৬

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلطَّآمَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾

[৩৪] অতঃপর যখন মহাসংকট এসে যাবে।

يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَٰنُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾

[৩৫] অর্থাৎ যেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে

وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾

[৩৬] এবং দর্শকদের জন্যে জাহান্নাম প্রকাশ করা হবে

আয়াত ৩৪–৩৬: মহাসংকটের দিন

চৌত্রিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর যখন মহাসংকট (আত-তাম্মাতুল কুবরা) এসে যাবে।' 'তাম্মা' অর্থ এমন বিপদ, যা সবকিছুকে ঢেকে ফেলে। এখানে কিয়ামত উদ্দেশ্য। পরের আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন মানুষ স্মরণ করবে সে যা করেছে।' কিয়ামতের দিন মানুষের গোটা জীবনের সব কাজ তার মনে পড়ে যাবে। আমি কী করেছি, কোথায় ভুল করেছি, কোন কাজ করা

উচিত ছিল না, সব মনে আসবে। সূরা ফাজরেও এই কথা এসেছে, ‘সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু সে স্মরণে তার কী লাভ?’ (৮৯:২৩)।

ষট্‌ত্রিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যারা দেখার, তাদের সামনে জাহান্নামকে উন্মোচন করা হবে।’ জাহান্নামকে আড়াল সরিয়ে সবার সামনে হাজির করা হবে, যেন সবাই দেখে নেয় তার জন্য কী অপেক্ষা করছে।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ৩৭–৪১

فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾

[৩৭] তখন যে ব্যক্তি সীমালংঘন করেছে

وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

[৩৮] এবং পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে

فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾

[৩৯] তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِۦ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾

[৪০] পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে দন্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং খেয়াল-খুশী থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে

فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾

[৪১] তার ঠিকানা হবে জান্নাত।

আয়াত ৩৭–৪১: জাহান্নামী ও জান্নাতীর পরিচয়

এই কয়েকটি আয়াতে জান্নাতী ও জাহান্নামীর দুটি করে বৈশিষ্ট্য বলে দেওয়া হয়েছে।

জাহান্নামীর বৈশিষ্ট্য দুটি। প্রথমত, সে সীমালঙ্ঘন (তুগইয়ান) করেছে। দ্বিতীয়ত, সে দুনিয়ার জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার অর্থ, আখিরাতের ক্ষতির কথা শুনেও দুনিয়ায় লাভ ও সুখের জন্য যেকোনো অন্যায়ে জড়ানো। কেউ ব্যবসায় ধোঁকা দেয়, খারাপ পণ্য ভালো পণ্যের সঙ্গে মিশিয়ে একই দামে বেচে। মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য বিক্রি করে। কেউ দায়িত্বে থেকে ঘুষ নেয়, বেতনের বাইরে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে। এরা ভাবে, এভাবেই দ্রুত ধনী হওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দেয়, সে আমাদের দলভুক্ত নয় (সহীহ মুসলিম)। তিনি ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হওয়ার কথাও বলেছেন (জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ)। এ ধরনের লোকের ঠিকানা জাহান্নাম, সেটিই তাদের আবাস।

জান্নাতীর বৈশিষ্ট্যও দুটি। প্রথমত, সে রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় রাখে। দ্বিতীয়ত, সে নিজের নফসকে প্রবৃত্তির অশ্লীল ও অন্যায় আকাঙ্ক্ষা থেকে বিরত রাখে। তার ঠিকানা জান্নাত। সূরা আর-রহমানে এর প্রতিধ্বনি আছে, যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দুটি বাগান (৫৫:৪৬)।

এখানে ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। আমরা অনেকেই ক্ষমতাকে কৃতিত্ব বা অহংকারের বিষয় ভাবি, অথচ ক্ষমতা মূলত দায়িত্ব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার অধীনস্তদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। যারা সত্যিকার অর্থে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করতেন, তাঁদের আচরণ ছিল ভিন্ন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর বক্তব্য বর্ণিত আছে, ফুরাত নদীর তীরে একটি ছাগলছানাও যদি না খেয়ে মারা যায়, আমার ভয় হয়, আল্লাহ আমাকে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। দায়িত্বের এই অনুভূতি যার মধ্যে আছে, সে ক্ষমতা নিয়ে অহংকার করতে পারে না।

❖ সূরা নাযিয়াত, আয়াত ৪২–৪৬

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ﴿٤٢﴾

[৪২] তারা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে, কেয়ামত কখন হবে

فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَىٰهَآ ﴿٤٣﴾

[৪৩] এর বর্ণনার সাথে আপনার কি সম্পর্ক

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَىٰهَآ ﴿٤٤﴾

[৪৪] এর চরম জ্ঞান আপনার পালনকর্তার কাছে।

إِنَّمَآ أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَىٰهَا ﴿٤٥﴾

[৪৫] যে একে ভয় করে, আপনি তো কেবল তাকেই সতর্ক করবেন।

كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوٓا۟ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَىٰهَا ﴿٤٦﴾

[৪৬] যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে যেন তারা দুনিয়াতে মাত্র এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

আয়াত ৪২–৪৬: কিয়ামত কবে, সে প্রশ্নের জবাব

মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ব্যঙ্গ করে প্রশ্ন করত, 'কিয়ামত কবে ঘটবে?' আল্লাহ তাআলা জবাব দিচ্ছেন, 'এর আলোচনার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক? এর

চূড়ান্ত জ্ঞান আপনার রবের কাছে।' অর্থাৎ কিয়ামতের সময় বলে দেওয়া আপনার দায়িত্ব নয়। আপনার কাজ কেবল তাদের সতর্ক করা, যারা কিয়ামতকে ভয় করে। আপনাকে তারিখ ঠিক করে দেওয়ার জন্য পাঠানো হয়নি।

কিয়ামত আসবে হঠাৎ, কেউ টের পাবে না। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে, তারা শুধু একটি মহানাদের অপেক্ষা করছে, যা তাদের পাকড়াও করবে অথচ তারা তখনো বিবাদে লিপ্ত থাকবে। তারা ওসিয়ত করারও সুযোগ পাবে না, নিজের পরিবারের কাছে ফিরেও যেতে পারবে না (৩৬:৪৯–৫০)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামত এমন অবস্থায় আসবে, যখন দুজন লোক কাপড় মেলে বেচাকেনা করছে, তারা কেনাবেচা শেষ করার সুযোগ পাবে না। কেউ উটনীর দুধ দোহন করে নিয়ে এসেছে, সে তা পান করার সুযোগ পাবে না। কেউ খাবারের লোকমা মুখে তুলবে, কিন্তু খাওয়ার সময় পাবে না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। একজন বাজারে গেছে, বাজার নিয়ে ফেরার আগেই কিয়ামত হয়ে যাবে। একজন রান্না করছে, রান্না শেষ হওয়ার আগেই সব ধ্বংস হবে। মরার আগে শেষ কথাটুকু বলে যাওয়ার সুযোগও থাকবে না।

আমাদের সমাজে অনেক সময় কিয়ামতের নির্দিষ্ট তারিখের গুজব ছড়ায়। অতীতে এমন গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে অনেকে জমিজমা বিক্রি করে দিয়েছেন। এটা অজ্ঞতারই ফল। কুরআনের শিক্ষা পরিষ্কার, কিয়ামতের সময় কেবল আল্লাহ জানেন।

সূরার শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যেদিন তারা তা দেখবে, মনে হবে যেন তারা দুনিয়ায় মাত্র এক সন্ধ্যা বা এক সকাল অবস্থান করেছে।' সূরা মুমিনূনেও এ কথা এসেছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা পৃথিবীতে কত বছর ছিলে? তারা বলবে, একদিন বা দিনের কিছু অংশ (২৩:১১২–১১৩)। আমরাও কি মাঝেমধ্যে ভাবি না, এই তো সেদিন স্কুলে পড়তাম, এই তো সেদিন পরীক্ষা দিলাম? আসলে আখিরাতের অনন্তকালের তুলনায় ষাট-সত্তর-আশি বছরের জীবন কিছুই নয়। নুহ আলাইহিস সালাম সাড়ে নয়শো বছর জীবিত ছিলেন (সূরা আনকাবূত ২৯:১৪)। কিন্তু অনন্তকালের বিচারে সেটাও তো সামান্য।

প্রসিদ্ধ উক্তি আছে, যা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর নামে প্রচলিত, মানুষ ঘুমন্ত, মরার পর জাগে। ঘুমের মধ্যে আমরা কত কিছু দেখি, কত জায়গায় যাই, কত কিছু খাই। ঘুম ভাঙলে বুঝি, সবই স্বপ্ন ছিল। দুনিয়ার জীবনও তেমনই। কিয়ামতের দিন যখন মানুষ জেগে উঠবে, তখন বুঝবে, এই জীবন কত ক্ষণস্থায়ী ছিল এবং এই সংক্ষিপ্ত পরীক্ষায় তার সাফল্য-ব্যর্থতাই তার চিরস্থায়ী ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করছে।

তাই কিয়ামত কবে হবে, এই হিসাব করার প্রয়োজন নেই। আমার হিসাব আমাকেই করতে হবে, আমি কি আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারব? এই সংক্ষিপ্ত 'সকাল বা সন্ধ্যা'কে যদি সুন্দরভাবে কাটানো যায়, তাহলে পরবর্তী জীবন হবে চিরস্থায়ী সুখের, চিরস্থায়ী জান্নাতের।

শিক্ষা ও উপদেশ

- যিনি আসমান-জমিনের মতো বিশাল সৃষ্টি করেছেন, তাঁর জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা সামান্য ব্যাপার।
- আখিরাতে জাহান্নামীর পরিচয়: সীমালঙ্ঘন ও দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া। জান্নাতীর পরিচয়: রবের সামনে দাঁড়ানোর ভয় ও প্রবৃত্তি দমন।
- ক্ষমতা অহংকারের বিষয় নয়, এটি দায়িত্ব ও আমানত, যার জবাবদিহি করতে হবে।
- ব্যবসায় ধোঁকা, ঘুষ ও অবৈধ উপার্জন দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ারই বহিঃপ্রকাশ।
- কিয়ামতের সময় নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে নিজের প্রস্তুতির চিন্তা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।
- আখিরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন এক সন্ধ্যা বা এক সকালের মতো ক্ষণস্থায়ী। এই সময়কে সুন্দরভাবে কাটাতে পারলেই চিরস্থায়ী সাফল্য।

অধ্যায় ৩

সূরা আবাসা

عبس

অন্ধ সাহাবীর ঘটনা ও আল্লাহর সংশোধন

কুরআনের ৮০তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৪২টি

সূরা আবাসা কুরআনের ৮০তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ৪২। এই সূরার একটি বিশেষত্ব আছে। কুরআনের আর কোনো সূরার নাম ক্রিয়াপদ দিয়ে রাখা হয়নি। নাবা, নাযিয়াত, তাকভীর, ইয়াসীন, রহমান, ওয়াকিয়া, সবই বিশেষ্য। কিন্তু ‘আবাসা’ একটি ক্রিয়া, যার অর্থ ‘সে ভ্রূকুঞ্চিত করল।’ এর কারণ, সূরাটি একটি নির্দিষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে এবং সূরার শুরুতেই সেই ঘটনার কথা বলা হয়েছে।

শানে নুযূল: ঘটনার প্রেক্ষাপট

মক্কী জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নানা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, মক্কার নেতৃস্থানীয়দের কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করেন, তাহলে সাধারণ মুসলমানদের নিরাপত্তা কিছুটা সহজ হবে এবং নেতাদের অনুসারীরা ইসলামের দিকে ঝুঁকবে। কারণ সাধারণত নেতা যে মানসিকতা পোষণ করেন, অনুসারীরাও সেই পথেই চলে।

একদিন তিনি মক্কার বড় বড় কাফির নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। তাদের মধ্যে ছিল আবু জাহল, উতবা ইবনে রাবীআ এবং এ ধরনের আরও প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ভাবছিলেন, এই তো উপযুক্ত সময়। তাদের গুরুত্ব দিয়ে বোঝালে হয়তো তারা ইসলামে আসবে, আর তাদের মাধ্যমে আরও অনেক মানুষ ঈমান আনবে।

ঠিক সেই সময় অন্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখানে এলেন। তিনি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার আত্মীয় এবং একেবারে প্রথম দিকের মুসলমানদের একজন ছিলেন, জন্ম থেকেই দৃষ্টিহীন। তিনি এসে বললেন, ‘ইয়া রাসূলাল্লাহ, আল্লাহ আপনাকে যা শিখিয়েছেন, তা থেকে আমাকে শেখান।’ তিনি এই কথা বারবার বলছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কেউ হলে হয়তো বলতাম, দুই মিনিট পরে আসুন, এখন জরুরি আলাপ চলছে। তিনি তা-ও বলেননি। তিনি কেবল একটু ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, তাঁর মুখে সামান্য বিরক্তির ছাপ পড়ল, এবং তিনি ফিরে গিয়ে নেতাদের সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন।

আল্লাহ তাআলা এই সামান্য আচরণকেই সংশোধন করে দিলেন। ঘটনাটি জামে তিরমিযী ও অন্যান্য হাদীস-গ্রন্থে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত আছে। বিষয়টি একটু গভীরভাবে বোঝা দরকার।

ভ্রূকুঞ্চনের তিন স্তর

আরবিতে বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশের তিনটি স্তরের তিনটি শব্দ আছে। প্রথম 'কালাহা'। এতে রাগে দাঁত কড়মড় করা হয়, মুখ বিকৃত হয়। দ্বিতীয় 'বাসারা'। এতে রাগে চেহারা কালো বা লাল হয়ে ওঠে। সূরা মুদ্দাসসিরে (৭৪:২২) এই শব্দ এসেছে। তৃতীয় 'আবাসা'। এতে শুধু কপালে ভাঁজ পড়ে, ভ্রূ কুঁচকে যায়, রাগ বা মুখ-বিকৃতি নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তিন স্তরের একেবারে সর্বনিম্ন স্তরটিই প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বিরক্তির কারণও ছিল সহজ। তিনি ভাবছিলেন, ইবনে উম্মে মাকতূম তো মুমিন, সবসময় আমার কাছেই থাকেন, জানার অনেক সময় পাবেন। কিন্তু এই নেতারা আমার কথা শুনতেই আসে না, এদের সঙ্গে বসার সুযোগ বিরল। এই মূল্যবান সময়টি কেন নষ্ট হচ্ছে?

লক্ষ করার বিষয় হলো, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম তো দেখতেই পাননি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রূকুঞ্চিত করেছেন বা মুখ ফিরিয়েছেন। তবু আল্লাহ তা সংশোধন করলেন। এর কারণ হলো, দূর থেকে কেউ এই দৃশ্য দেখলে ভাবতে পারত, নবী বুঝি সমাজের সাধারণ ও নিম্নশ্রেণির মুসলমানদের গুরুত্ব দেন না, ধনী ও নেতাদের নিয়েই তাঁর ব্যস্ততা। অথচ বাস্তবে তা সত্য ছিল না। আল্লাহ তাআলা কুরআনে বহু জায়গায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীদের প্রতি কোমল আচরণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে, আপনি যদি রূঢ় ও কঠোরহৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার চারপাশ থেকে সরে যেত (৩:১৫৯)। সূরা কাহফে নির্দেশ এসেছে, যারা সকাল-সন্ধ্যা তাদের রবকে ডাকে, তাদের সঙ্গে নিজেকে ধৈর্যের সঙ্গে রাখুন (১৮:২৮)।

এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট করা দরকার। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে তুচ্ছ করে মুখ ফিরিয়ে নেননি। তিনি সেই মুহূর্তে মক্কার নেতাদের দাওয়াত দেওয়াকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নিখাদ দ্বীনের দাওয়াত। ফকীহ ও মুফাসসিরগণ একে 'খিলাফুল আউলা' বলেন, অর্থাৎ উত্তম বিকল্পটি ছেড়ে অন্য একটি ভালো বিকল্প গ্রহণ। এতে কোনো গুনাহ হয়নি, কিন্তু আল্লাহ সর্বোত্তম পথটি দেখিয়ে দিয়েছেন।

এই আয়াতগুলো কুরআনের সত্যতার প্রমাণ

এই ঘটনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রমাণ করে। কুরআন যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের রচনা হতো, তাহলে তিনি কখনোই নিজের ভুলের বা সংশোধনের কথা কিতাবে লিখতেন না। আমরা যে কেউ বই লিখলে নিজের প্রশংসা ও ভালো দিকগুলোই তুলে

ধরি, যেন মানুষ আমার কথা শোনে। অথচ কুরআনে সরাসরি নবীর আচরণের সংশোধনী এসেছে এবং তিনি সেটি অবিকল প্রকাশ করেছেন। এ থেকেই বোঝা যায়, কুরআন ওহীর বাণী।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই ঘটনার পরও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের সঙ্গে সবসময় অত্যন্ত সম্মানজনক আচরণ করেছেন। তিনি এলে বলতেন, 'মারহাবান বিমান আতাবানী ফীহি রব্বী', অর্থাৎ স্বাগতম সেই ব্যক্তিকে, যার কারণে আমার রব আমাকে সতর্ক করেছেন (বর্ণনাটি তাফসীরের গ্রন্থসমূহে এসেছে)। এই সম্মানের কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁকে এতটা গুরুত্ব দিয়েছেন যে তাঁর জন্য সরাসরি আয়াত নাযিল হয়েছে। বর্ণিত আছে, মদীনায় যুদ্ধ-সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বেশ কয়েকবার মদীনার দায়িত্বশীল হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি মসজিদে নববীর অন্যতম মুআযযিনও ছিলেন।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ১–২

عَبَسَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١﴾

[১] তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

أَن جَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿٢﴾

[২] কারণ, তাঁর কাছে এক অন্ধ আগমন করল।

আয়াত ১–২: ভ্রূকুঞ্চন ও মুখ ফেরানো

প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন, কারণ তাঁর কাছে অন্ধ ব্যক্তি এসেছিল।' লক্ষ করুন, এই আয়াতে কথা বলা হয়েছে প্রথম পুরুষ বা অনুপস্থিত ব্যক্তির ভঙ্গিতে, 'সে ভ্রূকুঞ্চিত করল'। সরাসরি 'আপনি ভ্রূকুঞ্চিত করলেন' বলা হয়নি। আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রে এটিকে 'ইলতিফাত' বলে। এর মধ্যে সম্মান ও কোমলতা আছে।

আমরা সাধারণ জীবনেও এই রীতি দেখি। মসজিদে কোনো সম্মানিত ব্যক্তি জোরে কথা বললে যদি সরাসরি বলি, 'আপনি কথা বলবেন না', তিনি অপমানবোধ করতে পারেন। কিন্তু যদি সাধারণভাবে বলি, 'মসজিদে কারও কারও কথা বলায় পাশের মুসল্লিদের অসুবিধা হচ্ছে', তাহলে তিনি নিজেই বুঝে নেবেন কথাটি কাকে উদ্দেশ্য করে। কুরআন ঠিক এই আদব রক্ষা করেছে। এখানে সরাসরি তিরস্কার করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি কঠোরতা আরও বেশি হতো।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ৩–৪

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُۥ يَزَّكَّىٰٓ ﴿٣﴾

[৩] আপনি কি জানেন, সে হয়তো পরিশুদ্ধ হত

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰٓ ﴿٤﴾

[৪] অথবা উপদেশ গ্রহণ করতো এবং উপদেশ তার উপকার হত।

আয়াত ৩–৪: সম্ভাবনার কথা

তৃতীয় আয়াতে হঠাৎ পুরুষ বদলে 'আপনি' বলা হয়েছে: 'আপনি কী করে জানবেন, সম্ভবত সে পরিশুদ্ধ হতো।' অর্থাৎ আপনার তো জানার উপায় ছিল না যে সে পরিশুদ্ধ হতে এসেছে। এভাবে আল্লাহ বিষয়টিকে আরও হালকা ও কোমলভাবে উপস্থাপন করছেন। আপনি জানতেন না বলেই অন্যদের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছেন। কিন্তু সে হয়তো পরিশুদ্ধ হতো, অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং সেই উপদেশ তার উপকারে আসত।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ৫–৭

أَمَّا مَنِ ٱسْتَغْنَىٰ ﴿٥﴾

[৫] পরন্তু যে বেপরোয়া

فَأَنتَ لَهُۥ تَصَدَّىٰ ﴿٦﴾

[৬] আপনি তার চিন্তায় মশগুল।

وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ ﴿٧﴾

[৭] সে শুদ্ধ না হলে আপনার কোন দোষ নেই।

আয়াত ৫–৭: যে উপেক্ষা করে, তার পেছনে পড়ার দরকার নেই

পঞ্চম থেকে সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যে অমুখাপেক্ষিতা দেখায়, আপনি তার প্রতি মনোযোগ দিচ্ছেন। অথচ সে নিজে পরিশুদ্ধ না হলে আপনার কোনো দায় নেই।' যে ব্যক্তি নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে, দ্বীনের কথা শোনার প্রয়োজন বোধ করে না, আপনি তার পেছনে এত উঠে-পড়ে লেগেছেন। অথচ আপনার দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া (সূরা মায়িদা ৫:৯৯)। কেউ হিদায়াত গ্রহণ না করলে আপনার ওপর কোনো দায় আসবে না। আপনি আপনার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ওঠে। মানুষ কি বক্তার বক্তব্যের কারণে হিদায়াত পায়, নাকি শ্রোতার অন্তরের স্বচ্ছতার কারণে? এই ঘটনা থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়। প্রথমত, বক্তার ইখলাসের অভাব ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের হিদায়াতের জন্য যেমন আন্তরিক ছিলেন, ইবনে উম্মে মাকতূমকে শেখানোর ক্ষেত্রেও তেমনই আন্তরিক ছিলেন। দ্বিতীয়ত, তফাত ছিল শ্রোতার মনোভাবে। একজন বলছিল, আমার কোনো প্রয়োজন নেই। আরেকজন বলছিল, আপনাকে আল্লাহ যা শিখিয়েছেন, তা আমাকেও শেখান।

হিদায়াতের কথা শ্রোতার মধ্যে কাজ করে তখনই, যখন তার মধ্যে গ্রহণের আগ্রহ থাকে। কুরআনের আলো সবার সামনেই আছে, কিন্তু এই আলো সবাইকে পথ দেখায় না। অন্ধের সামনে বাতি জ্বালালেও সে পথ দেখে না, কারণ সমস্যা বাতিতে নয়, দৃষ্টিতে। তাই কুরআন শুনতে বসার সময় আমাদের মনোভাব হওয়া উচিত, আমি হিদায়াত নিতে চাই।

এ প্রসঙ্গে সহীহ বুখারীর (৭৯ নম্বর) একটি হাদীস বিখ্যাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ আমাকে যে হিদায়াত ও জ্ঞান দিয়ে পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ ভূমির ওপর বর্ষিত প্রবল বৃষ্টির মতো। কোনো জমি উর্বর, সে পানি শুষে নেয় এবং প্রচুর ঘাস-গাছ উৎপন্ন করে। কোনো জমি কঠিন, সে পানি ধরে রাখে, তা থেকে মানুষ পান করে, পশুকে পান করায় এবং চাষ করে। আরেক ধরনের জমি সমতল ও পাথুরে, সে না পানি ধরে রাখে, না ঘাস উৎপন্ন করে। বৃষ্টি একই, কিন্তু উপকার নির্ভর করে জমির অবস্থার ওপর। হিদায়াতের বৃষ্টিও সবার কাছে পৌঁছে, আমি কতটুকু গ্রহণ করব, তা নির্ভর করে আমার অন্তরের অবস্থার ওপর।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ৮–১০

وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسۡعَىٰ ٨

[৮] যে আপনার কাছে দৌড়ে আসলো

وَهُوَ يَخۡشَىٰ ٩

[৯] এমতাবস্থায় যে, সে ভয় করে

فَأَنتَ عَنۡهُ تَلَهَّىٰ ١٠

[১০] আপনি তাকে অবজ্ঞা করলেন।

আয়াত ৮–১০: যে ছুটে এসেছে, তাকে উপেক্ষা

অষ্টম থেকে দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যে আপনার কাছে ছুটে এসেছে এবং ভয় করে, আপনি তার প্রতি অমনোযোগী হলেন।' 'ইয়াসআ' অর্থ দৌড়ে আসা, আগ্রহ নিয়ে আসা। 'তালাহহা' শব্দের মূল 'লাহউ', অর্থাৎ অন্য কিছুতে মশগুল হয়ে মনোযোগ সরিয়ে নেওয়া। কুরআনে 'লাহউ' শব্দ খেলাধুলা বা আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফিল করে এমন কাজের জন্যও ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মর্ম হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয় নিয়ে আগ্রহের সঙ্গে ছুটে এসেছে, তার প্রতি মনোযোগ কমে যাওয়া, অন্যদিকে ব্যস্ত হয়ে যাওয়া, আপনার জন্য সমীচীন ছিল না।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ১১–১২

كَلَّآ إِنَّهَا تَذۡكِرَةٞ ١١

[১১] কখনও এরূপ করবেন না, এটা উপদেশবানী।

فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ ﴿١٢﴾

[১২] অতএব, যে ইচ্ছা করবে, সে একে গ্রহণ করবে।

আয়াত ১১–১২: কুরআন উপদেশ, যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করুক

একাদশ আয়াতে 'কাল্লা' দিয়ে আল্লাহ স্পষ্টভাবে নিষেধ করছেন, 'কখনোই নয়!' অর্থাৎ ভবিষ্যতে আর এমন আচরণ করবেন না। 'নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) এক উপদেশবাণী।' দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং যার ইচ্ছা সে তা স্মরণ করবে।' কাউকে জোর করে শোনানোর দায়িত্ব আপনাকে দেওয়া হয়নি। উপদেশ সবার সামনে উপস্থাপিত, যে চায় গ্রহণ করবে, যে চায় না করবে না। গ্রহণ করলে তার জন্য ভালো প্রতিদান, না করলে খারাপ পরিণাম।

পরবর্তী আয়াতগুলোতে কুরআনের মর্যাদার বর্ণনা আসছে। কুরআন কতটা সম্মানিত, ফেরেশতাদের হাতে লিপিবদ্ধ, কতটা পবিত্র ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সেই আলোচনা আগামী অধ্যায়ে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- দাওয়াতের ক্ষেত্রে বড় ব্যক্তিত্বের চেয়ে সাধারণ কিন্তু আগ্রহী মুসলমানকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। দ্বীন শিখতে আসা মানুষকে উপেক্ষা করা উচিত নয়।
- আল্লাহ তাআলা সংশোধন করার সময়ও আদব ও কোমলতা রক্ষা করেছেন। আমাদের সংশোধনের ধরনও এমন হওয়া উচিত।
- নবীর ভুল-ত্রুটির সংশোধন কুরআনে উল্লেখ থাকা প্রমাণ করে যে কুরআন ওহী, নবীর নিজের রচনা নয়।
- হিদায়াত নির্ভর করে শুধু বক্তার বক্তব্যের ওপর নয়, শ্রোতার গ্রহণের আগ্রহ ও অন্তরের স্বচ্ছতার ওপরও।
- দাওয়াতদাতার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া। কাউকে হিদায়াত দেওয়া বা না দেওয়া আল্লাহর হাতে।
- গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তেও আগন্তুক বা সাহায্যপ্রার্থীর প্রতি সহমর্মিতা ও সৌজন্য বজায় রাখা উচিত।

গত অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, আল্লাহ তাআলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানিয়েছেন, তাঁর দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া, কাউকে জোর করে হিদায়াত দেওয়া নয়। কুরআন অন্যত্র বলেছে, আপনি যাকে ভালোবাসেন তাকে হিদায়াত দিতে পারেন না, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দেন (সূরা কাসাস ২৮:৫৬)। আল্লাহ কাকে হিদায়াত দেন? সূরা রা'দে বলা হয়েছে, যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকেই তিনি পথ দেখান (১৩:২৭)। কাজেই 'আল্লাহ আমার হিদায়াত চাননি বলে আমি হিদায়াত পাইনি' বলে আল্লাহকে দোষারোপ করার কোনো সুযোগ নেই।

গুনাহ করতে করতে অন্তরে মরিচা ধরিয়ে ফেলা আমারই কৃতকর্ম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা যখন গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে (জামে তিরমিযী)। কুরআনও বলছে, তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়েছে (সূরা মুতাফফিফীন ৮৩:১৪)।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ১৩–১৬

فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿١٣﴾

[১৩] এটা লিখিত আছে সম্মানিত

مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٤﴾

[১৪] উচ্চ পবিত্র পত্রসমূহে

بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٥﴾

[১৫] লিপিকারের হস্তে

كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٦﴾

[১৬] যারা মহৎ, পূত চরিত্র।

আয়াত ১৩–১৬: কুরআনের মর্যাদা

এই আয়াতগুলোতে কুরআনের উচ্চ মর্যাদার বর্ণনা এসেছে। ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এটি রয়েছে সম্মানিত সহীফাসমূহে।’ ‘সুহুফ’ হলো ‘সহীফা’ অর্থাৎ পাতা বা পৃষ্ঠার বহুবচন। এখানে সেই পৃষ্ঠাগুলোর কথা বলা হয়েছে, যাতে কুরআন লাওহে মাহফূযে লিপিবদ্ধ আছে। সূরা বুরূজে বলা হয়েছে, বরং এ তো মহিমান্বিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে (৮৫:২১–২২)। আমাদের হাতের ছাপা কুরআনের পৃষ্ঠার কথা এখানে বলা হচ্ছে না।

চতুর্দশ আয়াতে এর দুটি বিশেষণ। ‘মারফূআ’ অর্থ সমুচ্চ ও মর্যাদাবান। ‘মুতাহহারা’ অর্থ পবিত্র, যা সব ধরনের কলুষ ও মিশ্রণ থেকে মুক্ত। অর্থাৎ ফেরেশতারা এতে নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু যোগ করেননি, কোনো বানোয়াট কথাও ঢোকানো সম্ভব হয়নি। আবার এর আরেকটি তাৎপর্যও বোঝা যায়। যেহেতু কুরআন পবিত্র, তাই একে স্পর্শ করা ব্যক্তিকেও পবিত্র হতে হবে। সূরা ওয়াকিয়ায় এ কথা এসেছে, পবিত্র ব্যক্তিরা ছাড়া কেউ এটি স্পর্শ করে না (৫৬:৭৯)। এ কারণে অধিকাংশ ফকীহের মতে ওযু ছাড়া কুরআনের পাতা স্পর্শ করা উচিত নয়।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘লিপিকারদের হাতে, যারা মহৎ ও পুণ্যবান।’ ‘সাফারা’ শব্দের অর্থ লিপিকার বা দূত। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে ফেরেশতাদের কথা বলা হয়েছে, যাঁরা সম্মানিত (কিরাম) ও পুণ্যবান (বারারা)। কেউ কেউ বলেছেন, এর দ্বারা সেই

সাহাবায়ে কেরামও উদ্দেশ্য হতে পারেন, যাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশে কুরআন লিপিবদ্ধ করেছেন। হাদীসে এসেছে, যে ব্যক্তি কুরআনে দক্ষ, সে সম্মানিত ও পুণ্যবান ফেরেশতাদের সঙ্গে থাকবে। আর যে ব্যক্তি আটকে আটকে কষ্ট করে তিলাওয়াত করে, তার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

কুরআনের সঙ্গে যা কিছু জড়িত, সবই মর্যাদাবান। এই কিতাব নাযিল হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর ওপর, সর্বশ্রেষ্ঠ ফেরেশতার মাধ্যমে, কদরের রাতে, যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, এবং মক্কা-মদীনার মতো পবিত্র নগরীতে। আর এর সঙ্গে সম্পর্ক রাখার কারণে আল্লাহ মানুষকেও সম্মানিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ এই কিতাবের মাধ্যমে কিছু জাতিকে উঁচু করেন আর অন্যদের নিচে নামিয়ে দেন (সহীহ মুসলিম)। আজকের মুসলিম সমাজ যে অপমান ও পশ্চাৎপদতার শিকার, তার একটি বড় কারণ কুরআনের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব। আমরা কুরআনকে গিলাফে মুড়ে রাখি, বছরে একবার রমযানে তিলাওয়াত করি। আমাদের কতজন শুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে পারে, কতজন এর অর্থ জানে, কতজনের জীবনে এর বিধান আছে? কুরআনের সঙ্গে সম্পর্ক যত দুর্বল হবে, আমাদের লাঞ্ছনা তত বাড়বে।

কুরআনকে একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান বলে বিশ্বাস করা ঈমানের অংশ। যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানের চেয়ে অন্য কোনো বিধানকে উত্তম মনে করে বা কুরআনের বিধানকে অচল বলে ঘোষণা করে, তার ঈমান প্রশ্নবিদ্ধ। সূরা মায়িদায় এ নিয়ে কঠোর হুঁশিয়ারি এসেছে (৫:৪৪–৪৭)। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহর বিধানকে সত্য জেনেও পরিস্থিতির চাপে বা অক্ষমতায় তা পূর্ণ বাস্তবায়ন করতে পারে না, সে গুনাহগার, কিন্তু কাফির নয়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এ বিষয়ে বলেছেন, এটি 'কুফর দূনা কুফর', অর্থাৎ প্রকৃত কুফরের চেয়ে নিম্নস্তরের অবাধ্যতা। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, আমাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ জীবনে কুরআনকে বাস্তব রূপ দিতে হবে, আর সামাজিক জীবনে সত্যিকারের কুরআনের আলো ছড়ানোর চেষ্টা করতে হবে।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ১৭

قُتِلَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَآ أَكۡفَرَهُۥ ﴿١٧﴾

[১৭] মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ

আয়াত ১৭: অকৃতজ্ঞ মানুষের প্রতি তিরস্কার

সপ্তদশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'মানুষ ধ্বংস হোক, সে কত অকৃতজ্ঞ!' 'কুতিলা' আরবি বাগধারায় ভর্ৎসনা ও বদদোয়া। এখানে বিস্ময়ও আছে, মানুষ কীভাবে এতটা অকৃতজ্ঞ হতে পারে? আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, পথ দেখানোর জন্য নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন, তবু সে সবকিছু অস্বীকার করছে। আমরাও কি এতটা অকৃতজ্ঞ নই? কুরআনের কথা তুললে

আমাদের সমাজে অনেক সময় বলা হয়, আপনি নিজের মত চাপিয়ে দিচ্ছেন। অথচ অন্য ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থ মানতে চাইলে কেউ আপত্তি করে না। এটি আমাদের জন্য ভাবনার বিষয়।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ১৮–২৩

مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُۥ ﴿١٨﴾

[১৮] তিনি তাকে কি বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছেন

مِن نُّطْفَةٍ خَلَقَهُۥ فَقَدَّرَهُۥ ﴿١٩﴾

[১৯] শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে সুপরিমিত করেছেন।

ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾

[২০] অতঃপর তার পথ সহজ করেছেন

ثُمَّ أَمَاتَهُۥ فَأَقْبَرَهُۥ ﴿٢١﴾

[২১] অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান ও কবরস্থ করেন তাকে।

ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنشَرَهُۥ ﴿٢٢﴾

[২২] এরপর যখন ইচ্ছা করবেন তখন তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهُۥ ﴿٢٣﴾

[২৩] সে কখনও কৃতজ্ঞ হয়নি, তিনি তাকে যা আদেশ করেছেন, সে তা পূর্ণ করেনি।

আয়াত ১৮–২৩: মানুষের সৃষ্টি, মৃত্যু ও পুনরুত্থান

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ আয়াতে আল্লাহ মানুষকে নিজের সৃষ্টির দিকে তাকাতে বলছেন, 'তিনি তাকে কী থেকে সৃষ্টি করেছেন? এক ফোঁটা শুক্র থেকে, অতঃপর তার নিয়তি নির্ধারণ করেছেন।' 'নুতফা' অর্থ সামান্য পানির ফোঁটা, যাকে সূরা মুরসালাতে 'তুচ্ছ পানি' বলা হয়েছে (৭৭:২০)। এই নগণ্য বস্তু থেকে আল্লাহ মানুষের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর ও সুপরিমিতভাবে গঠন করেছেন। আমাদের খাওয়ার সুবিধার জন্য হাতের আঙুল, সিজদার সুবিধার জন্য শরীরের কাঠামো, যেখানে ভাঁজ প্রয়োজন সেখানে নমনীয় জোড়, সবই তাঁর কারিগরি। গরু-ছাগলের শরীর সিজদার জন্য তৈরি হয়নি, কিন্তু মানুষের গঠন এমনভাবে তৈরি, যেন সে আল্লাহর সামনে রুকু-সিজদা করতে পারে।

বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন।' মুফাসসিরগণ এর দুটি অর্থ করেছেন। এক, মাতৃগর্ভ থেকে পৃথিবীতে আসার পথ সহজ করেছেন। দুই, হিদায়াতের পথ সহজ করেছেন। উভয় অর্থই সঠিক।

একবিংশ আয়াতে মৃত্যুর পর কবরস্থ হওয়াকেও আল্লাহ নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন, 'অতঃপর তাকে মৃত্যু দিয়েছেন এবং কবরস্থ করেছেন।' কেননা মানুষের মৃতদেহ যদি মরুভূমিতে পড়ে থাকত, পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়াত, মানুষ তা দেখে ঘৃণা করত, মানুষের মর্যাদা বলতে কিছু থাকত না। ইসলামে মৃতকে গোসল দেওয়া হয়, পরিচ্ছন্ন কাফন পরানো হয়, সুগন্ধি লাগানো হয়, জানাযার নামায পড়ে সম্মানের সঙ্গে দাফন করা হয়। এই সৌন্দর্যই ইসলামের সত্যতার এক নিদর্শন।

দ্বাবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এরপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন, তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন।' আর ত্রয়োবিংশ আয়াতে এসেছে, 'কখনোই নয়, তিনি তাকে যে আদেশ করেছিলেন, সে তা পূর্ণ করেনি।' 'কাল্লা' অর্থ 'না, কখনো নয়।' এখানে বলা হচ্ছে, আল্লাহ মানুষকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন, সে তা যথাযথ পালন করেনি। এই অকৃতজ্ঞতার সামনে আল্লাহ এখন আরও কিছু নিয়ামতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করছেন।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ২৪–৩২

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦٓ ﴿٢٤﴾

[২৪] মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক

أَنَّا صَبَبْنَا ٱلْمَآءَ صَبًّا ﴿٢٥﴾

[২৫] আমি আশ্চর্য উপায়ে পানি বর্ষণ করেছি

ثُمَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٦﴾

[২৬] এরপর আমি ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি

فَأَنۢبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٧﴾

[২৭] অতঃপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য

وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٨﴾

[২৮] আঙ্গুর, শাক-সব্জি

وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٢٩﴾

[২৯] যয়তুন, খর্জূর

وَحَدَآئِقَ غُلْبًا ﴿٣٠﴾

[৩০] ঘন উদ্যান

وَفَٰكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣١﴾

[৩১] ফল এবং ঘাস

مَّتَٰعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَٰمِكُمْ ﴿٣٢﴾

[৩২] তোমাদেরও তোমাদের চতুস্পদ জন্তুদের উপাকারার্থে।

আয়াত ২৪–৩২: খাদ্যের নিয়ামত

চতুর্বিংশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'মানুষ যেন তার খাদ্যের দিকে লক্ষ করে।' নিজের অস্তিত্বের পাশাপাশি তার খাবার নিয়েও ভাবা দরকার। আল্লাহ এখানে খাদ্য উৎপাদনের পুরো প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন।

প্রথমে বৃষ্টি। 'আমি প্রচুর পানি বর্ষণ করি।' ভেবে দেখুন, এক ঘন্টার বৃষ্টির পুরো পানি যদি একসঙ্গে ঢেলে দেওয়া হতো, যেখানে পড়ত সেখানে গর্ত হয়ে যেত, মানুষ মারা যেত, ঘর ভেঙে যেত। কিন্তু আল্লাহ ফোঁটায় ফোঁটায় ধীরে ধীরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যেভাবে আমাদের উপকার হয়। তারপর 'আমি জমিনকে বিদীর্ণ করি।' ক্ষুদ্র একটি দানা মাটি ফুঁড়ে উঠে আসে। এরপর আল্লাহ জমিন থেকে শস্যদানা, আঙুর, শাকসবজি, জলপাই, খেজুর, ঘন বাগান, ফলমূল ও চারণভূমি উৎপন্ন করেন। এ সবকিছুই 'তোমাদের ও তোমাদের গবাদি পশুর জীবিকার জন্য।'

একটি ঘটনা এখানে স্মরণযোগ্য। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার এই আয়াত পড়ছিলেন। 'ফাকিহা' (ফল) তো আমরা চিনি, কিন্তু 'আব্ব' (গবাদি পশুর জন্য চারণ-ঘাস) কী জিনিস? তিনি নিজেই বললেন, 'হে উমর, এ রকম অতিরিক্ত খুঁটিনাটি জানতে চাওয়া তোমার কাজ নয়।' এরপর তিনি বললেন, 'আমাদের যতটুকু বলা হয়েছে, তাতেই আমল করি' (সহীহ বুখারী)। এই ঘটনায় একটি আদব আছে। কুরআনের যা স্পষ্ট, তা মানার চেষ্টা করা এবং যা অস্পষ্ট, তা নিয়ে অতিরিক্ত বিতর্কে না জড়ানো।

একই মাটি থেকে পেঁয়াজ ও রসুন, আঙুর ও খেজুর কীভাবে ভিন্ন ভিন্ন রং, গন্ধ ও স্বাদ নিয়ে জন্ম নেয়, ভেবে দেখা যায়। পেঁয়াজের পরতে পরতে সুন্দর আবরণ, ফলের মধ্যে মিষ্টি-টক-তেতো নানা স্বাদ, অথচ মাটি পিষে এর কোনোটির স্বাদই পাওয়া যায় না। এসবই আল্লাহর কারিগরি।

এই আয়াতগুলো রিযিক সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়। অনেকে জনসংখ্যা বাড়ার ভয়ে খাদ্য সংকটের আশঙ্কা করে। অথচ আল্লাহ যাকে দুনিয়ায় পাঠান, তার রিযিকও সঙ্গে পাঠান। কুরআনে এসেছে, পৃথিবীতে বিচরণকারী এমন কোনো প্রাণী নেই, যার রিযিকের দায়িত্ব আল্লাহর

ওপর নয় (সূরা হূদ ১১:৬)। দারিদ্র্যের ভয়ে সন্তানকে হত্যা করতে নিষেধ করা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, আমিই তাদের রিযিক দিই, তোমাদেরও (১৭:৩১)। আজকের পৃথিবীতে যেসব জায়গায় অনাহার ও দুর্ভিক্ষ দেখা যায়, তার বেশির ভাগই খাদ্য উৎপাদনের ঘাটতি নয়, বরং মানুষের জুলুম, অন্যায় বণ্টন ও কৃত্রিম সংকটের ফল। আল্লাহ যথেষ্ট সরবরাহ করেছেন।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ৩৩–৩৭

فَإِذَا جَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿٣٣﴾

[৩৩] অতঃপর যেদিন কর্ণবিদারক নাদ আসবে

يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ﴿٣٤﴾

[৩৪] সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে

وَأُمِّهِۦ وَأَبِيهِ ﴿٣٥﴾

[৩৫] তার মাতা, তার পিতা

وَصَٰحِبَتِهِۦ وَبَنِيهِ ﴿٣٦﴾

[৩৬] তার পত্নী ও তার সন্তানদের কাছ থেকে।

لِكُلِّ ٱمْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٧﴾

[৩৭] সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।

আয়াত ৩৩–৩৭: কিয়ামতের মহানাদ ও সেদিনের আত্মকেন্দ্রিকতা

ত্রয়োত্রিংশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'যখন কর্ণবিদারক মহানাদ (সাখখা) আসবে।' 'সাখখা' এমন আওয়াজ, যা কান বধির করে দেয়। এটি কিয়ামতের নাম। এর পরের আয়াতগুলোতে সেদিনের এক ভয়াবহ বাস্তবতা বলা হয়েছে। 'সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা-বাবা থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে।' প্রত্যেকের জন্য সেদিন এমন একটি অবস্থা থাকবে, যা তাকে অন্য সবকিছু থেকে বেখেয়াল করে দেবে (আয়াত ৩৭)।

এর উদ্দেশ্য এই নয় যে আমরা আজ থেকে আত্মীয়দের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করব। উদ্দেশ্য হলো, যাঁদের ছাড়া আমি একটা দিনও কাটাতে পারি না, মা, বাবা, সন্তান, স্ত্রী, তাঁরাও সেদিন আমাকে ভুলে যাবে। আমিও তাঁদের কাছ থেকে পালাব, কারণ তাঁরা হয়তো আমার কাছে কোনো নেকি চেয়ে বসবে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, সেদিন মানুষ নগ্ন অবস্থায় ওঠানো হবে, তারা কি একে অপরের দিকে তাকাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বললেন, সেদিনের পরিস্থিতি এতটাই কঠিন হবে যে কেউ কারও দিকে তাকানোর কথা ভাববেই না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

এই দুনিয়াতেও সামান্য সংকটে বোঝা যায়, কে কার কতটা আপন। করোনা মহামারির সময় আমরা দেখেছি, অনেক জায়গায় আক্রান্ত স্বজনের মৃতদেহ নিতে কেউ আসেনি। কিয়ামতের সংকট তো এর চেয়ে লক্ষ গুণ বেশি। এজন্য কারও জন্য আখিরাত নষ্ট করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সন্তানকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবৈধ উপার্জন করা, পরিবারের বিলাসী জীবনযাত্রার জন্য হারাম-হালালের পার্থক্য ভুলে যাওয়া, এ সবকিছুর জবাব নিজেকেই দিতে হবে। সেদিন কেউ এসে বলবে না, আমার বাবা আমার জন্য উপার্জন করেছেন, তাঁর শাস্তি আমাকে দিয়ে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে শরীর হারাম খাদ্যে বেড়ে উঠেছে, জাহান্নামই তার জন্য উপযুক্ত (মুসনাদে আহমাদ, সুনানে বায়হাকী)।

❖ সূরা আবাসা, আয়াত ৩৮–৪২

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٨﴾

[৩৮] অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে উজ্জ্বল

ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٣٩﴾

[৩৯] সহাস্য ও প্রফুল্ল।

وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤٠﴾

[৪০] এবং অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে ধুলি ধূসরিত।

تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤١﴾

[৪১] তাদেরকে কালিমা আচ্ছন্ন করে রাখবে।

أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿٤٢﴾

[৪২] তারাই কাফের পাপিষ্ঠের দল।

আয়াত ৩৮–৪২: দুই দলের দুই চেহারা

সূরার শেষ আয়াতগুলোতে সেদিনের মানুষের চেহারার বর্ণনা আছে। 'সেদিন কিছু মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল।' আর 'কিছু মুখমণ্ডল হবে ধুলিমলিন, কালিমাচ্ছন্ন।' প্রথম দল মুমিন, আনন্দে উদ্ভাসিত। দ্বিতীয় দল 'কাফারা' ও 'ফাজারা', অর্থাৎ আল্লাহকে অস্বীকারকারী ও পাপাচারী।

সূরার শুরুর ঘটনার সঙ্গে এই সমাপ্তির মিল আছে। মক্কার সর্দাররা ইসলামের সত্যতা জানত, কিন্তু নিজেদের নেতৃত্ব, সামাজিক মর্যাদা ও বংশগৌরব হারানোর ভয়ে ইসলাম গ্রহণ করত না। আল্লাহ তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, সেদিন তোমাদের সমাজ, নেতা, দল, গোষ্ঠী কেউ তোমার কাজে আসবে না। প্রত্যেকে নিজের চিন্তায় বিভোর থাকবে। সুতরাং সেদিন যদি আলোকোজ্জ্বল চেহারা নিয়ে উঠতে চাও, আজ ইসলাম গ্রহণ করো এবং তা পালন করো।

এই সতর্কবাণী কেবল মক্কার সর্দারদের জন্য নয়, আমাদের জন্যও। আমরা অনেক সময় সামাজিক মর্যাদা, বংশ, দল বা পরিচয়ের কারণে সত্য গ্রহণে দ্বিধা করি। এ সবই ক্ষণস্থায়ী। সংখ্যার বিচারে আমরা মুসলমান বলে পরিচিত হতে পারি, কিন্তু পরিচয় বা কাগজপত্রে নামের সঙ্গে 'মুহাম্মাদ' বা 'ইসলাম' থাকলেই কেউ মুসলমান হয়ে যায় না। ঈমান, নামাজ, তাওহীদ, শিরক থেকে বেঁচে থাকা, এসবই পরীক্ষার বিষয়। আখিরাতে চোখ খুললেই বোঝা যাবে, আমাদের মধ্যে কতজন সত্যিকার মুসলমান ছিলাম।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কুরআন সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন কিতাব। এর সঙ্গে সম্পর্ক বাড়ালে আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করেন, সম্পর্ক ছিন্ন করলে অপমান আসে।
- হিদায়াত না পাওয়ার জন্য আল্লাহকে দোষ দেওয়া যাবে না। গুনাহ অন্তরে মরিচা ধরায়, আর হিদায়াত পায় সে-ই, যে তা গ্রহণ করতে চায়।
- মানুষের সৃষ্টি, শরীরের গঠন, মৃত্যুর পর সম্মানজনক দাফন, সবই আল্লাহর নিয়ামত।
- খাদ্য উৎপাদনের প্রক্রিয়া আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন। রিযিকের চিন্তা আল্লাহর, আমাদের দায়িত্ব হালাল উপায়ে তা অন্বেষণ করা।
- কিয়ামতের দিন আপনজনও পালিয়ে বেড়াবে। তাই কারও জন্য হারাম উপার্জনে জড়িয়ে আখিরাত নষ্ট করা উচিত নয়।
- সামাজিক মর্যাদা, নেতৃত্ব বা গোষ্ঠীর ভয়ে সত্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা বড় ক্ষতি।
- আখিরাতের পরিচয় নামে বা কাগজে নয়, ঈমান ও আমলে।

অধ্যায় ৪

সূরা তাকভীর

التكوير

সূর্য যেদিন গুটিয়ে নেওয়া হবে এবং জিবরীলের বিশ্বস্ততা

কুরআনের ৮১তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ২৯টি

সূরা তাকভীর কুরআনের ৮১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২৯। সূরার মূল আলোচ্য বিষয় দুটি। প্রথমত, কিয়ামতের ভয়াবহ কিছু দৃশ্য। দ্বিতীয়ত, যে ফেরেশতা কুরআন নিয়ে এসেছেন, সেই জিবরীল আলাইহিস সালামের বিশ্বস্ততা ও মর্যাদা। নামকরণ হয়েছে প্রথম আয়াতের 'কুউবিরাত' শব্দের মূল ধাতু 'তাকভীর' থেকে, যার অর্থ কোনো কিছু গুটিয়ে ফেলা। প্রথম ১৪ আয়াতে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র এঁকেছেন। এই চিত্র দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ছয় আয়াতে বিচার শুরু হওয়ার আগে পৃথিবী কীভাবে ধ্বংস হবে তার বিবরণ। পরের সাত আয়াতে বিচারের দিনে কী ঘটবে তার বর্ণনা। এরপর ১৪ নম্বর আয়াতে সবকিছুর পরিণতি ঘোষিত হয়েছে। 'ইযা' (যখন) শব্দ দিয়ে শুরু হওয়া বারোটি বাক্যের জবাব এসেছে শেষ আয়াতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে যেন চোখে দেখতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, সূরা ইনফিতার ও সূরা ইনশিকাক পড়ে (জামে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)। মানুষের ঈমান ও পুরো জীবনকে নিয়মের মধ্যে রাখতে হলে কিছু বিশ্বাস সবসময় অন্তরে জাগিয়ে রাখতে হয়। কিয়ামতের বিচার ও সেদিনের ভয়াবহতার চিন্তা যার অন্তরে জাগ্রত, সে অন্যায় থেকে বিরত থাকে। এজন্যই আখিরাতে বিশ্বাস ঈমানের অন্যতম স্তম্ভ।

❖ সূরা তাকভীর, আয়াত ১–৬

إِذَا ٱلشَّمۡسُ كُوِّرَتۡ ١

[১] যখন সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে

وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتۡ ٢

[২] যখন নক্ষত্র মলিন হয়ে যাবে

وَإِذَا ٱلۡجِبَالُ سُيِّرَتۡ ٣

[৩] যখন পর্বতমালা অপসারিত হবে

وَإِذَا ٱلۡعِشَارُ عُطِّلَتۡ ٤

[৪] যখন দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীসমূহ উপেক্ষিত হবে

وَإِذَا ٱلۡوُحُوشُ حُشِرَتۡ ٥

[৫] যখন বন্য পশুরা একত্রিত হয়ে যাবে

وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ سُجِّرَتۡ ٦

[৬] যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে

আয়াত ১–৬: পৃথিবীর মহাধ্বংসের ছয় দৃশ্য

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সূর্যকে গুটিয়ে নেওয়া হবে।' 'তাকভীর' অর্থ জড়িয়ে ফেলা বা গুটিয়ে ফেলা। এর প্রকৃত স্বরূপ আল্লাহই ভালো জানেন। মুফাসসিরগণ দুটি অর্থ করেছেন। এক, সূর্যের আলো নিভিয়ে নিষ্প্রভ করে দেওয়া হবে। দুই, সূর্যের কাজ শেষ হয়ে যাবে। আমরা কোনো কাপড় ব্যবহার শেষে যেমন ভাঁজ করে রেখে দিই, তেমনি সূর্যের উদয়-অস্তের ধারা সেদিন শেষ হবে। সহীহ বুখারীর এক হাদীসে বলা হয়েছে, কিয়ামতের দিন সূর্য ও চন্দ্র গুটিয়ে ফেলা হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন তারকাগুলো খসে পড়বে।' 'ইনকাদারাত' অর্থ ঝরে পড়া ও বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া। আসমানের তারকারা নিজ কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়বে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন পর্বতমালাকে চালিত করা হবে।' এর অর্থ পাহাড় তার স্থান থেকে সরে যাবে। অন্য আয়াতগুলো মিলিয়ে দেখলে বোঝা যায়, পাহাড় প্রথমে চলতে শুরু করবে, তারপর ধুনা তুলার মতো উড়তে থাকবে (সূরা ক্বারিআ ১০১:৫), এরপর ধুলোয় পরিণত হবে (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৫–৬), শেষে মরীচিকার মতো অস্তিত্বহীন হয়ে যাবে (সূরা নাবা ৭৮:২০)। পাহাড় যেহেতু পৃথিবীর পেরেক, সেই পেরেক তুলে নিলে জমিন আর স্থির থাকবে না। আমাদের সমাজে কিয়ামত নিয়ে কিছু কাহিনি প্রচলিত আছে, যেমন পাহাড় বা মসজিদগুলো রেলগাড়ির মতো একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে যাবে। এসবের কোনো ভিত্তি কুরআন বা সহীহ হাদীসে নেই। আয়াতের অর্থ হলো, পাহাড় স্থানচ্যুত হবে, উড়ে যাবে, অস্তিত্ব হারাবে। সূরা ইবরাহীমে বলা হয়েছে, সেদিন এই পৃথিবী অন্য পৃথিবীতে পরিবর্তিত হবে (১৪:৪৮)। আর সূরা আম্বিয়ায় আছে, আমি আসমানকে গুটিয়ে ফেলব, যেভাবে লিখিত পাতা গুটিয়ে রাখা হয় (২১:১০৪)।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন দশ মাসের গর্ভবতী উটনীগুলো উপেক্ষিত হবে।' 'ইশার' হলো 'উশারা'-র বহুবচন, অর্থ দশ মাসের গর্ভবতী উটনী, যা প্রসবের অপেক্ষায়। কুরআন নাযিলের সময় আরবের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ ছিল উট। আজকের যুগে দামি গাড়ির মতো তা ছিল মর্যাদার প্রতীক। গর্ভবতী উটনীর মূল্য আরও বেশি, কারণ সে শিগগিরই আরেকটি উট জন্ম দেবে এবং দুধ দেবে। কিন্তু কিয়ামতের আতঙ্ক এত তীব্র হবে যে মানুষ এই অমূল্য সম্পদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। যে সম্পদের জন্য আজ আমরা জীবন বাজি রাখি, সেদিন তা বেকার হয়ে যাবে।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন বন্য প্রাণীদের একত্র করা হবে।' 'উহুশ' অর্থ বন্য জন্তু। মুফাসসিরগণের এখানে দুটি মত আছে। একটি হলো, কিয়ামতের ভয়াবহ সময়ে বন্য পশুরা আতঙ্কে বনজঙ্গল ছেড়ে এক জায়গায় জড়ো হবে, যেমন আমরা দেখি বিপদের সময় প্রাণীরা একত্র হয়ে যায়। অন্য মতটি ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, পশুদেরও কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করা হবে এবং তাদের পারস্পরিক বিচার হবে। সূরা আনআমে বলা হয়েছে, পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী ও পাখি তোমাদের মতোই একেকটি জাতি, এরপর তাদের সবাইকে তাদের রবের কাছে একত্র করা হবে (৬:৩৮)।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সমুদ্রগুলোকে উত্তাল (বা প্রজ্বলিত) করা হবে।' 'সুজ্জিরাত' শব্দের একটি অর্থ আগুনে জ্বালানো। ভাত রান্নার সময় হাঁড়ির পানি যেভাবে ফুটে ফেনা উপচে পড়ে এবং বাষ্প হয়ে যায়, সমুদ্রের বিশাল জলরাশি সেদিন তেমনি উত্তপ্ত হয়ে বাষ্প হয়ে যাবে। মুফাসসিরগণ বলেন, সমুদ্রে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হবে। আরেকটি ব্যাখ্যা হলো, সব সমুদ্র একে অপরের সঙ্গে মিশে একাকার হবে। দুটি ব্যাখ্যাই কিয়ামতের ভয়াবহতাকে ফুটিয়ে তোলে।

❖ সূরা তাকভীর, আয়াত ৭–৯

وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٧﴾

[৭] যখন আত্মাসমূহকে যুগল করা হবে

وَإِذَا ٱلْمَوْءُۥدَةُ سُئِلَتْ ﴿٨﴾

[৮] যখন জীবন্ত প্রোথিত কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে

بِأَىِّ ذَنۢبٍ قُتِلَتْ ﴿٩﴾

[৯] কি অপরাধে তাকে হত্যা করা হল

আয়াত ৭–৯: বিচারের দিনের প্রথম তিন দৃশ্য

সপ্তম আয়াত থেকে বিচারের দিনের বিবরণ শুরু। 'যখন প্রাণসমূহকে (দেহের সঙ্গে) জোড়া লাগানো হবে।' 'যুওয়িজাত' শব্দটি এসেছে 'যাওয' (জোড়া) থেকে। এর দুটি অর্থ করা যায়।

প্রথম অর্থ, কিয়ামতের দিন মানুষকে কবর থেকে ওঠানোর সময় তার রূহকে দেহের সঙ্গে পুনরায় সংযুক্ত করা হবে। এটাই পুনরুত্থান।

দ্বিতীয় অর্থ, প্রত্যেক মানুষকে তার সমগোত্রীয়দের সঙ্গে একত্র করা হবে, ভালো আমলকারী ভালো আমলকারীদের সঙ্গে, পাপী পাপীদের সঙ্গে, যে যে ধর্ম ও আদর্শ গ্রহণ করেছিল তার অনুসারীদের সঙ্গে। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। সূরা সাফফাতে আল্লাহ বলেন, 'একত্র করো জালিমদের ও তাদের সঙ্গীদের' (৩৭:২২)। আল্লাহ অপরাধীদের বলবেন, আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও।

এই আয়াত একটি হাদীসের কথা মনে করিয়ে দেয়। একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামত কবে? তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, তুমি তার জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ? সাহাবী বললেন, বেশি কিছু নয়, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি যাকে ভালোবাসো, তার সঙ্গেই থাকবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এখন প্রশ্ন, আমার ভালোবাসা কার প্রতি সবচেয়ে বেশি? আল্লাহ, রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের প্রতি, নাকি দুনিয়ার অন্য কিছু ব্যক্তি বা বিষয়ের প্রতি? যে যাকে ভালোবাসে, সে তার মতোই চলে। যে রাসূলকে ভালোবাসে, তার জীবনে সুন্নাহ ফুটে ওঠে। হিসাব খুব সহজ।

অষ্টম ও নবম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন জীবন্ত পুঁতে ফেলা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল?' জাহিলী যুগে আরবের কোনো কোনো গোত্রে কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেওয়ার কুপ্রথা ছিল। সবাই এমন করত না, তবে একটি বড় অংশের মধ্যে এই নিষ্ঠুরতা ছিল। আল্লাহ তাআলা সেদিন সেই নির্যাতিত শিশুকে জিজ্ঞেস করবেন, কেন তোমাকে মেরে ফেলা হলো। এখানে অপরাধী শিশু নয়, অপরাধী তার পিতা। তবু ভিকটিমকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে অপরাধের ভয়াবহতাকে আরও জোরালোভাবে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন কাউকে মারধর করা হলে আমরা প্রথমে জিজ্ঞেস করি, তোমাকে মারা হলো কেন, যাতে যে মেরেছে তার অপরাধের ওজন বোঝা যায়।

কুরআন অন্যত্র বলেছে, তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হলে তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং সে ক্ষোভে ভরে ওঠে (সূরা নাহল ১৬:৫৮)। আজও অনেকের মধ্যে এই জাহিলী মানসিকতা কাজ করে। মেয়ে হয়েছে শুনে অনেকে মন খারাপ করেন, বলতে দ্বিধা করেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দুই কন্যাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, কিয়ামতের দিন আমি ও সে এভাবে আসব, এই বলে তিনি দুই আঙুল মিলিয়ে দেখালেন (সহীহ মুসলিম)।

এই আয়াত থেকে আরেকটি সমকালীন শিক্ষাও পাওয়া যায়। হাদীসে এসেছে, মানুষের সৃষ্টি মায়ের গর্ভে ৪০ দিন বীর্যরূপে, তারপর ৪০ দিন জমাট রক্তরূপে, তারপর ৪০ দিন মাংসপিণ্ডরূপে থাকে, এরপর ফেরেশতা পাঠিয়ে তাতে রূহ ফুঁকে দেওয়া হয় (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। অর্থাৎ ১২০ দিন পর গর্ভের সন্তানে রূহ দেওয়া হয়। রূহ আসার পর গর্ভপাত ঘটানো একজন মানুষকে হত্যার সমতুল্য ও হারাম। রূহ ফুঁকে দেওয়ার আগের সময়ে বিনা কারণে গর্ভপাত ঘটানোকেও অধিকাংশ ফকীহ নাজায়েয বলেছেন, যদিও এ বিষয়ে তাঁদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। মায়ের জীবন হুমকির মুখে থাকলে নির্ভরযোগ্য চিকিৎসক ও আলেমের পরামর্শ নিতে হবে। আজ 'অ্যাবরশন' শব্দের নরম পোশাক পরিয়ে আমরা অনেক সময় এই গুরুতর বিষয়ের ভয়াবহতাকে হালকা করে ফেলি। অথচ শব্দ বদলালেও প্রকৃত অবস্থা বদলায় না। জাহিলী যুগে জন্মের পর কন্যা সন্তানকে হত্যা করা হতো, আর আজ জন্মের আগেই মেরে ফেলা হয়। আমরা অপরাধকে অপরাধ বলে গণ্য করি না বলেই আমাদের দায় আরও বেশি।

❖ সূরা তাকভীর, আয়াত ১০–১৪

وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ﴿١٠﴾

[১০] যখন আমলনামা খোলা হবে

وَإِذَا ٱلسَّمَآءُ كُشِطَتْ ﴿١١﴾

[১১] যখন আকাশের আবরণ অপসারিত হবে

وَإِذَا ٱلْجَحِيمُ سُعِّرَتْ ﴿١٢﴾

[১২] যখন জাহান্নামের অগ্নি প্রজ্বলিত করা হবে

وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ ﴿١٣﴾

[১৩] এবং যখন জান্নাত সন্নিকটবর্তী হবে

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ أَحْضَرَتْ ﴿١٤﴾

[১৪] তখন প্রত্যেকেই জেনে নিবে সে কি উপস্থিত করেছে।

আয়াত ১০–১৪: আমলনামা, আসমান, জাহান্নাম ও জান্নাত

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আমলনামাসমূহ খুলে দেওয়া হবে।' 'সুহুফ' অর্থ লিখিত পাতা। প্রত্যেকের হাতে তার আমলনামা পৌঁছে যাবে। এই আমলনামায় ছোট-বড় কিছুই বাদ থাকবে না (সূরা কাহফ ১৮:৪৯)।

একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আসমানের আবরণ সরিয়ে ফেলা হবে।' 'কুশিতাত' অর্থ পশুর চামড়া যেভাবে ছিলে ফেলা হয়। আসমানের আবরণ ছিলে ফেলার মতো সরিয়ে ফেলা হবে, যাতে যা আজ গোপন, তা সেদিন প্রকাশ হয়ে পড়ে।

দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন জাহান্নামকে প্রজ্বলিত করা হবে।' 'সুউইরাত' অর্থ আগুনকে আরও উত্তপ্ত ও লেলিহান করা। আর ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন জান্নাতকে নিকটে আনা হবে।' 'উযলিফাত' অর্থ কাছে আনা। জাহান্নাম আরও প্রজ্বলিত হবে আর জান্নাতকে মানুষের চোখের সামনে হাজির করা হবে, যাতে মানুষ আফসোস করতে পারে। তাদের যেখানে যাওয়ার কথা ছিল, সেটি নিকটে এসেছে, অথচ নিজেদের কর্মফলে অন্য পথে যেতে হচ্ছে। আফসোস আরও বেড়ে যাবে।

এই বারোটি 'ইযা'-র জবাব এসেছে চতুর্দশ আয়াতে। 'তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।' এখানে কিয়ামতের দিন মানুষের গোটা জীবনের স্মৃতি তার সামনে এসে দাঁড়াবে। রাতের অন্ধকারে কেউ না দেখলেও যা সে করেছে, সব তার মনে ভেসে উঠবে। আল্লাহ যখন পাপের তালিকা দেবেন, কেউ অস্বীকার করবে না, অস্বীকার করার সুযোগও থাকবে না। কেউ এ কথা বলার সুযোগ পাবে না যে আল্লাহ বোধহয় ভুল বুঝেছেন, আমার হিসাব সঠিক হয়নি। প্রত্যেকের অন্তরে এই অনুভূতিই জাগবে, আমি সত্যিই অপরাধী।

পরের আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা জিবরীল আলাইহিস সালামের বিশ্বস্ততা ও মর্যাদা নিয়ে আলোচনা করবেন। কারণ মক্কার মুশরিকরা তাঁকেও শত্রু মনে করত এবং বলত, ফেরেশতা আমাদের মূর্তির বিরুদ্ধে আয়াত নিয়ে আসে। সেই আলোচনা আগামী অধ্যায়ে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কিয়ামতের চিত্র নিয়মিত পড়া ও স্মরণ করা ঈমানকে সতেজ রাখে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে।
- কিয়ামতে সূর্য, তারকা, পাহাড় ও সমুদ্র সবই ধ্বংস হবে। দুনিয়ার কোনো শক্তিই সেদিন টিকবে না।
- যে সম্পদের জন্য মানুষ আজ জীবন বাজি রাখে, কিয়ামতের আতঙ্কে সেদিন তা মূল্যহীন হয়ে যাবে।
- মানুষ হাশরে তার ভালোবাসার মানুষ ও আদর্শের সঙ্গেই উত্থিত হবে। তাই আমাদের ভালোবাসার কেন্দ্র আল্লাহ, রাসূল ও সৎ মানুষ হওয়া উচিত।
- কন্যা সন্তানকে বোঝা মনে করা জাহিলী মানসিকতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যাদের লালন-পালনকে জান্নাতের পথ বলেছেন।

- নিরীহ প্রাণের প্রতি অন্যায় যেভাবেই ঘটুক, কিয়ামতে এর বিচার হবে। রূহ আসার পর গর্ভপাত হত্যার শামিল।
- কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে নিজের আমল দেখতে পাবে এবং নিজেই নিজের অপরাধ স্বীকার করবে।

সূরা তাকভীরের প্রথম চোদ্দো আয়াতে কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনার পর এখন বাকি আয়াতগুলোতে আল্লাহ তাআলা কুরআনের উৎস ও বাহক জিবরীল আলাইহিস সালামের মর্যাদা ও বিশ্বস্ততা তুলে ধরছেন। এর পেছনে একটি প্রেক্ষাপট আছে। মক্কার মুশরিকরা জিবরীলকে নিজেদের শত্রু ভাবত। তাদের যুক্তি ছিল সরল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের শত্রু, আর জিবরীল তাঁর বন্ধু, তাই জিবরীলও আমাদের শত্রু। শিরকের বিরুদ্ধে কঠোর আয়াত নাযিল করে তাদের কোণঠাসা করার পেছনে জিবরীলের ভূমিকা বড়, এমন ধারণাও তাদের ছিল। ইয়াহূদীদের মধ্যেও জিবরীলের প্রতি বিদ্বেষ ছিল। সূরা বাকারার ৯৭–৯৮ আয়াতে আল্লাহ সেই মনোভাবের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জিবরীলের শত্রু, সে জেনে রাখুক, জিবরীল আল্লাহর নির্দেশে আপনার অন্তরে কুরআন নাযিল করেন, যা পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী এবং মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও সুসংবাদ। আর যে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, রাসূল, জিবরীল ও মীকাঈলের শত্রু, আল্লাহও এমন কাফিরদের শত্রু।

এই প্রেক্ষাপটে এই সূরায় জিবরীলের সম্মান, শক্তি ও আমানতদারির ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

❖ সূরা তাকভীর, আয়াত ১৫–১৮

فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلۡخُنَّسِ ١٥

[১৫] আমি শপথ করি যেসব নক্ষত্রগুলো পশ্চাতে সরে যায়।

ٱلۡجَوَارِ ٱلۡكُنَّسِ ١٦

[১৬] চলমান হয় ও অদৃশ্য হয়

وَٱلَّيۡلِ إِذَا عَسۡعَسَ ١٧

[১৭] শপথ নিশাবসান ও

وَٱلصُّبۡحِ إِذَا تَنَفَّسَ ١٨

[১৮] প্রভাত আগমন কালের

আয়াত ১৫–১৮: শপথ

পঞ্চদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ফালা উকসিমু বিল-খুন্নাস'। এখানে 'লা' (না) শব্দটি আপাতদৃষ্টিতে নেতিবাচক মনে হলেও আসলে এটি অতিরিক্ত, যা শপথের গুরুত্ব ও জোর

বাড়ানোর জন্য আসে। অর্থাৎ 'আমি শপথ করছি।' আরবিতে শপথ প্রকাশের দুটি রীতি আছে। কখনো 'ওয়াও' (و) দিয়ে, যেমন 'ওয়াশ-শামসি', কখনো 'উকসিমু' (আমি শপথ করছি) ক্রিয়া দিয়ে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে কুরআনে প্রায়ই 'লা' যুক্ত হয়, যেমন 'লা উকসিমু বি-ইয়াওমিল কিয়ামাহ' (৭৫:১)।

'খুন্নাস' শব্দের মূল ধাতু 'খানাসা', অর্থ পেছনে সরে যাওয়া বা আত্মগোপন করা। সূরা নাসে আমরা 'আল-খান্নাস' (পিছিয়ে যাওয়া ওয়াসওয়াসাদাতা শয়তান) শব্দটি পড়েছি। 'জাওয়ার' অর্থ চলমান আর 'কুন্নাস' অর্থ লুকিয়ে যাওয়া। অধিকাংশ মুফাসসির, এর মধ্যে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা রয়েছেন, বলেছেন, এখানে সেই তারকা ও গ্রহের শপথ করা হয়েছে, যেগুলো আকাশে চলতে থাকে, কখনো পিছিয়ে যায়, আবার কখনো দিনের আলোতে অদৃশ্য হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেছেন, বন্য হরিণ বা গরুর শপথ, যারা দৌড়ায় এবং আবার গুহায় লুকিয়ে পড়ে। মর্ম একই, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির নিদর্শন দিয়ে শপথ করেছেন।

এরপর শপথ করা হয়েছে রাতের, যখন তা অন্ধকারে ঘনিয়ে আসে (অথবা বিদায় নেয়, 'আসআসা' শব্দের দুটি অর্থই সম্ভব), এবং সকালের, যখন তা নিঃশ্বাস নেয়। সকালের নিঃশ্বাসের চিত্রটি অতি সুন্দর। রাতের গভীর অন্ধকার যেন একটা চাদর, যা পৃথিবীকে ঢেকে রেখেছে। কম্বলে মুখ ঢেকে ঘুমালে যেমন দম বন্ধ লাগে, তেমনি অন্ধকারের চাদরে আলো যেন আবদ্ধ থাকে। ভোরে আলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে, যেন সে এতক্ষণ পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে।

❖ সূরা তাকভীর, আয়াত ১৯–২১

إِنَّهُۥ لَقَوۡلُ رَسُولٖ كَرِيمٖ ١٩

[১৯] নিশ্চয় কোরআন সম্মানিত রসূলের আনীত বাণী

ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي ٱلۡعَرۡشِ مَكِينٖ ٢٠

[২০] যিনি শক্তিশালী, আরশের মালিকের নিকট মর্যাদাশালী

مُّطَاعٖ ثَمَّ أَمِينٖ ٢١

[২১] সবার মান্যবর, সেখানকার বিশ্বাসভাজন।

আয়াত ১৯–২১: সম্মানিত বার্তাবাহক

শপথগুলোর পর যে কথা বলার জন্য এত আয়োজন, তা এই আয়াতে আছে। 'নিশ্চয়ই এটি (কুরআন) একজন সম্মানিত রাসূলের বাণী।' এখানে 'রাসূল' অর্থ বার্তাবাহক। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে জিবরীল আলাইহিস সালামকে বোঝানো হয়েছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নয়। পরের আয়াতগুলোর বিশেষণ থেকেও তা পরিষ্কার। সূরা হাক্কায়

অনুরূপ শব্দ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য এসেছে (৬৯:৪০), কিন্তু সেখানে প্রসঙ্গ আলাদা। অর্থাৎ কুরআন নবীর নিজের বানানো কথা নয়, এটি আল্লাহর কাছ থেকে জিবরীলের মাধ্যমে আসা ওহী।

জিবরীল ফেরেশতা। ফেরেশতাদের প্রকৃতিতে অবাধ্যতার প্রবণতা নেই। আল্লাহ মানুষ ও জিনকে প্রবৃত্তি দিয়েছেন, তাই তারা ভালো পথে চললে পুরস্কৃত হয়, মন্দ পথে চললে শাস্তি পায়। কিন্তু ফেরেশতাদের সেই প্রবৃত্তি নেই। সূরা তাহরীমে তাদের পরিচয়ে বলা হয়েছে, তারা কঠোর ও শক্তিশালী, আল্লাহর আদেশ কখনো অমান্য করে না এবং যা আদেশ পায় তা-ই পালন করে (৬৬:৬)। তাই জিবরীল ওহীর সঙ্গে নিজের পক্ষ থেকে কিছু যোগ বা বিয়োগ করার প্রশ্নই ওঠে না।

বিংশ আয়াতে জিবরীলের দুটি বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে। তিনি 'যী কুওয়াহ' (মহাশক্তিধর) এবং 'ইনদা যিল আরশি মাকীন' (আরশের অধিপতির কাছে মর্যাদাবান)। শক্তির উল্লেখের একটি তাৎপর্য আছে। আগের যুগে জ্যোতিষী ও গণকরা ঊর্ধ্ব জগৎ থেকে ফেরেশতাদের কথা চুরি করে শুনতে চাইত। তখন উল্কাপিণ্ড তাদের তাড়া করত (সূরা মুলক ৬৭:৫, সূরা জিন ৭২:৮–৯)। জিবরীল এত শক্তিশালী ও সুরক্ষিত যে ওহী চুরি, ছিনতাই বা বিকৃত করার কোনো সুযোগ নেই। সূরা নাজমে তাঁকে 'শাদীদুল কুওয়া' বলা হয়েছে (৫৩:৫)। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরীলকে তাঁর আসল রূপে দেখেছেন, তাঁর ছয়শো ডানা ছিল (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

একবিংশ আয়াতে আরও দুটি বৈশিষ্ট্য এসেছে। 'মুতাঈন' অর্থ আনুগত্য করা হয় এমন, অর্থাৎ ঊর্ধ্ব জগতে ফেরেশতাদের মধ্যে তাঁর কথা মান্য করা হয়, তিনি তাঁদের অধিনায়ক। আর 'আমীন' অর্থ বিশ্বস্ত। আল্লাহ তাঁকে যে আমানত দিয়েছেন, তা তিনি বিন্দুমাত্র পরিবর্তন না করে পৌঁছে দেন। এভাবে পাঁচটি গুণে জিবরীলের প্রশংসা করা হয়েছে: সম্মানিত, শক্তিমান, আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান, অনুসরণীয় ও বিশ্বস্ত।

❖ সূরা তাকভীর, আয়াত ২২–২৫

وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُونٍ ﴿٢٢﴾

[২২] এবং তোমাদের সাথী পাগল নন।

وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأُفُقِ ٱلْمُبِينِ ﴿٢٣﴾

[২৩] তিনি সেই ফেরেশতাকে প্রকাশ্য দিগন্তে দেখেছেন।

وَمَا هُوَ عَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴿٢٤﴾

[২৪] তিনি অদৃশ্য বিষয় বলতে কৃপনতা করেন না।

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَٰنٍ رَّجِيمٍ ﴿٢٥﴾

[২৫] এটা বিতাড়িত শয়তানের উক্তি নয়।

আয়াত ২২–২৫: নবীর সত্যতা

দ্বাবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তোমাদের সঙ্গী উন্মাদ নন।' মক্কার লোকেরা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাগল বলত। কুরআনে এ কথাও উল্লেখ আছে, তারা বলত, 'হে যার ওপর উপদেশ নাযিল হয়েছে, আপনি তো নিশ্চয়ই উন্মাদ' (সূরা হিজর ১৫:৬)। কেন এমন বলত? কারণ একটি সমাজ বছরের পর বছর ধরে অন্যায়ে অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেই অন্যায় আর অন্যায় মনে হয় না, তা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। সুদ, মিথ্যা, জুলুম, বংশগৌরব, কন্যাহত্যা সবই চলত। ঈসা আলাইহিস সালামের পর দীর্ঘ সময় কোনো নবী আসেননি। এমন পরিবেশে হঠাৎ একজন মানুষ দাঁড়িয়ে বললেন, তোমরা এসব ছাড়ো, আমার কাছে ফেরেশতা এসে ওহী নিয়ে আসে। এই কথা শুনে তারা ভেবে নিল, নিশ্চয়ই তাঁর মাথায় সমস্যা হয়েছে। অথচ তারাই তাঁকে নবুওয়াতের আগে 'আল-আমীন' (বিশ্বস্ত) বলে ডাকত। যাঁর সত্যবাদিতা সম্পর্কে এত দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ছিল, তিনি হঠাৎ মিথ্যাবাদী বা উন্মাদ হয়ে গেলেন, এই যুক্তি টেকে না।

ত্রয়োবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি তাঁকে (জিবরীলকে) স্পষ্ট দিগন্তে দেখেছেন।' অর্থাৎ যিনি তাঁর কাছে ওহী নিয়ে আসেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে চোখের সামনে পরিষ্কারভাবে চিনেছেন। সূরা নাজমেও এর বিবরণ এসেছে (৫৩:৭–১৪)। সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী, তিনি জিবরীলকে আসল রূপে দুবার দেখেছেন। একবার মক্কায় দিগন্ত জুড়ে, আরেকবার মিরাজের রাতে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে। কাজেই কোনো জিন বা শয়তান তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে, আর তিনি তা ওহী মনে করছেন, এমন সম্ভাবনার কোনো অবকাশ নেই। প্রথম ওহীর পর তিনি ভয়ে কাঁপছিলেন, খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত আছে। কোনো প্রতারক এমন ভীত হয় না।

চতুর্বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তিনি গায়েবের বিষয়ে কৃপণ নন।' এখানে 'যানীন' (অভিযুক্ত) ও 'দানীন' (কৃপণ) দুটি কিরাআত আছে। উভয়ের মর্ম একই রকম, তিনি অদৃশ্য বিষয়ের ব্যাপারে অভিযুক্ত নন, কৃপণও নন। এ কথা বলার কারণ হলো, মক্কায় জ্যোতিষী ও গণকদের বড় প্রভাব ছিল। তারা অদৃশ্যের খবর জানার দাবি করে টাকা নিত। জটিল বিষয়ে বেশি টাকা না পেলে গোপন রাখত। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে যা প্রাপ্ত হন, বিনা পারিশ্রমিকে সবকিছু স্পষ্ট করে বলে দেন, গোপন করেন না।

গণক-জ্যোতিষীদের ব্যবসা আজও চলে। তারা নিজেদের ভবিষ্যৎ জানে না, অথচ অন্যের ভাগ্য বলার দাবি করে। একশোটি কথা বললে দুটি হয়তো মিলে যায়, তা আন্দাজ মাত্র। অদৃশ্যের জ্ঞান

একমাত্র আল্লাহর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে গিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের নামায কবুল হয় না (সহীহ মুসলিম)। আর যে গণকের কথাকে সত্য মনে করে, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করল (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)।

পঞ্চবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর এটি কোনো বিতাড়িত শয়তানের বাণী নয়।' শয়তান তো গুনাহ, ঝগড়া, আত্মীয়তা ছিন্ন করা, সুদ ও জুলুমের পরামর্শ দেয়। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেন, তা শয়তানের কথার সম্পূর্ণ উল্টো। তিনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতে বলেন, ইয়াতীমের হক আদায় করতে বলেন, জুলুম করতে নিষেধ করেন। শয়তান কি নিজের বিরুদ্ধেই পরামর্শ দেবে?

❖ সূরা তাকভীর, আয়াত ২৬–২৯

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ﴿٢٦﴾

[২৬] অতএব, তোমরা কোথায় যাচ্ছ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٧﴾

[২৭] এটা তো কেবল বিশ্বাবাসীদের জন্যে উপদেশ

لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴿٢٨﴾

[২৮] তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সোজা চলতে চায়।

وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢٩﴾

[২৯] তোমরা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অভিপ্রায়ের বাইরে অন্য কিছুই ইচ্ছা করতে পার না।

আয়াত ২৬–২৯: কোথায় যাচ্ছ? আল্লাহর ইচ্ছা ও বান্দার ইচ্ছা

ষড়বিংশ আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'তাহলে তোমরা কোথায় যাচ্ছ?' এত সুস্পষ্ট প্রমাণ সামনে আসার পরও তোমরা কোন পথে চলেছ? সপ্তবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এটি তো বিশ্বজগতের জন্য উপদেশ মাত্র।' আর অষ্টবিংশ আয়াতে, 'তোমাদের মধ্যে যে সরল পথে চলতে চায়।'

ঊনত্রিংশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'আর তোমরা ইচ্ছা করতে পারো না, যদি না বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ ইচ্ছা করেন।' এখানে একটি প্রশ্ন জাগতে পারে। আল্লাহ যদি না চান, তাহলে কেউ সরল পথে চলতে পারবে না। তাহলে মক্কার মুশরিকরা ঈমান আনেনি কেন? আল্লাহ কি তা চাননি? এর মাধ্যমে কি আল্লাহর ওপর দোষ চাপানো যায়?

না, যায় না। আলেমগণ আল্লাহর ইচ্ছাকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। এক 'ইরাদা কাওনিয়্যা', অর্থাৎ সৃষ্টিগত ইচ্ছা, যার মাধ্যমে আল্লাহ কোনো কিছু ঘটতে দেন। এই জগতে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কিছুই ঘটে না। আরেকটি 'ইরাদা শারইয়্যা', অর্থাৎ বিধানগত ইচ্ছা, যার মাধ্যমে তিনি আমাদের জন্য কিছু বিধান দিয়েছেন এবং সেগুলো পালনে সন্তুষ্ট হন। আল্লাহ কুফর ও গুনাহ ঘটতে দেন, কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট নন।

বিষয়টি একটি পরীক্ষার হলের মতো। শিক্ষক দেখছেন কোনো ছাত্র অঙ্কে ভুল করছে। কিন্তু পরীক্ষার হলের নিয়ম অনুযায়ী তিনি সেই মুহূর্তে বলে দিতে পারেন না। আমরা সবাই জীবনের পরীক্ষার হলে আছি। সত্য-মিথ্যা, ভালো-মন্দ, আলো-অন্ধকার সব আমাদের সামনে স্পষ্ট। এরপরও কেউ যদি স্বেচ্ছায় ভুল পথে যেতে চায়, আল্লাহ তাকে সে পথে চলার সুযোগ দেন। পরিণাম কী হবে, তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেককে সেই কাজের জন্যই সহজ করে দেওয়া হয়েছে, যার জন্য সে সৃষ্টি হয়েছে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এই বিশ্বাসের মর্ম হলো, আমরা কাজ করব, ফলাফল আল্লাহর হাতে। আমরা ভালো পথে চলার চেষ্টা করব এবং তাওফীক কামনা করব।

সূরা তাকভীরে এভাবে দুটি বিষয় আমাদের সামনে এসেছে। প্রথমত, কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র। দ্বিতীয়ত, কুরআনের বিশ্বস্ততা, যা জিবরীলের মাধ্যমে নবীর কাছে পৌঁছেছে এবং যেখানে কোনো মিশ্রণের সম্ভাবনা নেই।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কুরআন শয়তান বা জ্যোতিষীর বাণী নয়। এটি আল্লাহর বাণী, জিবরীলের মাধ্যমে নবীর কাছে পৌঁছে, কোনো পরিবর্তন বা চুরির সুযোগ ছাড়াই।
- জিবরীল আলাইহিস সালাম সম্মানিত, শক্তিশালী, বিশ্বস্ত ও আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। ফেরেশতাদের কাছে পাপ করার প্রবৃত্তি নেই।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন সর্বজনস্বীকৃত সত্যবাদী। তাঁকে পাগল বা প্রতারক বলার কোনো ভিত্তি ছিল না।
- জ্যোতিষী, গণক ও হাত দেখার ব্যবসায় বিশ্বাস করা ঈমানের পরিপন্থী। অদৃশ্যের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর।
- আল্লাহ সত্য-মিথ্যা উভয় পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। কেউ ভুল পথে গেলে তার দায় তার নিজের।
- আমাদের উচিত সরল পথে চলার চেষ্টা করা এবং আল্লাহর কাছে তাওফীক চাওয়া।

অধ্যায় ৫

সূরা ইনফিতার

الإنفطار

কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলল?

কুরআনের ৮২তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১৯টি

সূরা ইনফিতার কুরআনের ৮২তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৯। 'ইনফিতার' অর্থ ফেটে যাওয়া বা বিদীর্ণ হওয়া। সূরা তাকভীরের মতো এই সূরাতেও কিয়ামতের ভয়াবহ চিত্র আঁকা হয়েছে। আগের অধ্যায়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই হাদীস দেখেছি, যে ব্যক্তি কিয়ামতের দিনকে যেন চোখে দেখতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিকাক পাঠ করে।

শুধু তিলাওয়াত নয়, অর্থ বোঝাও জরুরি

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা দরকার। হাদীসে এই সূরাগুলো পড়ার কথা বলা হয়েছে কিয়ামতের দৃশ্য 'দেখার' জন্য। এই উদ্দেশ্য কেবল আরবি পড়ে অর্জন করা সম্ভব নয়। অর্থ না বুঝে দশ খতম, একশো খতম দিলেও কিয়ামতের চিত্র মনের মধ্যে ফুটে ওঠে না। কুরআনের যাঁরা প্রথম শ্রোতা ছিলেন, তাঁরা আরবি ভাষাভাষী ছিলেন, তিলাওয়াতের সঙ্গে সঙ্গেই অর্থ বুঝে ফেলতেন।

আমাদের মধ্যে দুটি প্রান্তিক প্রবণতা দেখা যায়। একদল মনে করে, কেবল তিলাওয়াতই যথেষ্ট, অর্থ বোঝার দরকার নেই। অন্যদল বলে, অর্থ না বুঝে তিলাওয়াতের কোনো লাভ নেই। দুটি ধারণাই ভুল। তিলাওয়াত নিজেই ইবাদত, আল্লাহর যিকির, এতে অন্তর প্রশান্ত হয় (সূরা রা'দ ১৩:২৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাব থেকে একটি হরফ পড়ে, সে একটি নেকি পায়, আর নেকি দশগুণ হয় (জামে তিরমিযী)। কিন্তু কুরআন নাযিল হয়েছে বোঝার ও চিন্তা করার জন্য। আল্লাহ বলেন, এটি এক বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি, যাতে তারা এর আয়াত নিয়ে চিন্তা করে (সূরা সাদ ৩৮:২৯)। তিলাওয়াতের সওয়াব ও অর্থ বোঝার উপকার, উভয়ই আমাদের অর্জন করতে হবে।

❖ সূরা ইনফিতার, আয়াত ১–৫

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ①

[১] যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে

وَإِذَا ٱلۡكَوَاكِبُ ٱنتَثَرَتۡ ٢

[২] যখন নক্ষত্রসমূহ ঝরে পড়বে

وَإِذَا ٱلۡبِحَارُ فُجِّرَتۡ ٣

[৩] যখন সমুদ্রকে উত্তাল করে তোলা হবে

وَإِذَا ٱلۡقُبُورُ بُعۡثِرَتۡ ٤

[৪] এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে

عَلِمَتۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ وَأَخَّرَتۡ ٥

[৫] তখন প্রত্যেকে জেনে নিবে সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে এবং কি পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে।

আয়াত ১–৫: কিয়ামতের চার দৃশ্য ও আমলনামার প্রস্তুতি

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আসমান বিদীর্ণ হবে।' সূরা তাকভীরে বলা হয়েছিল, আসমানের আবরণ ছিলে ফেলা হবে (৮১:১১)। পশুর চামড়া যেভাবে ছিলে ফেলা হয়, আসমানও তেমনি খুলে যাবে। এখানে বলা হচ্ছে, তা ফেটে যাবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন তারকাগুলো ঝরে পড়বে।' 'ইনতাসারাত' অর্থ বিক্ষিপ্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়া।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন সমুদ্রগুলোকে উদ্বেলিত করা হবে।' 'ফুজ্জিরাত' অর্থ বিস্ফোরিত করা, ফাটিয়ে দেওয়া। সূরা তাকভীরে 'সুজ্জিরাত' (প্রজ্বলিত) বলা হয়েছিল। মুফাসসিরগণ বলেন, প্রবল ভূমিকম্পে জমিন ফেটে যাবে, সমুদ্রের তলদেশের আগুনের উৎস উন্মুক্ত হবে, সমুদ্রের পানি একে অপরের সঙ্গে মিশে যাবে এবং উত্তপ্ত হয়ে উপচে পড়বে। ভাত রান্নার সময় হাঁড়ির পানি যেভাবে ফুটে ফেনা হয়ে উপচে পড়ে, ঠিক তেমন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন কবরসমূহকে উল্টে দেওয়া হবে।' 'বুসিরাত' অর্থ উন্মোচিত করা, তোলপাড় করা। এর দুটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথমটি, প্রথম ফুৎকারের ফলে ভূমিকম্পে কবর ফেটে ভেতরের সবকিছু বেরিয়ে আসবে। দ্বিতীয়টি, দ্বিতীয় ফুৎকারে মানুষ জীবিত হয়ে কবর থেকে উঠে আসবে।

পঞ্চম আয়াতে এই সবের পরিণতি ঘোষিত হয়েছে, 'তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে, সে কী আগে পাঠিয়েছে এবং কী পেছনে রেখে এসেছে।' 'কাদ্দামাত' ও 'আখখারাত' শব্দের দুটি ব্যাখ্যা সম্ভব।

প্রথম ব্যাখ্যা, দুনিয়া থেকে আখিরাতের জন্য সে কী পাঠিয়েছে, যেমন দান-সদকা, নামায, রোযা, আর দুনিয়ায় কী রেখে এসেছে, যেমন মসজিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল, এতিমখানা, পুণ্য জ্ঞান বা

সৎ সন্তান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ মারা গেলে তার আমল বন্ধ হয়ে যায় তিনটি ছাড়া: সদকায়ে জারিয়া, উপকারী জ্ঞান ও নেক সন্তান, যে তার জন্য দোয়া করে (সহীহ মুসলিম)।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, সে কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়েছে (কাদ্দামা) এবং কোন বিষয়কে পেছনে ফেলেছে (আখখারা)। আমাদের জীবনে আমরা কাকে অগ্রাধিকার দিই? ব্যবসা, চাকরি, জীবনযাত্রা? আযান হলো, কাজের চাপে ভাবলাম, থাক, আজ ঘরেই পড়ে নিই। তাহলে আমি কাজকে অগ্রাধিকার দিলাম, নামাযকে পেছনে ফেললাম। ব্যবসায়ীর জন্য নামাযের সময়ে ক্রেতার ভিড় বাড়ে, সেটাই পরীক্ষা, আমি জামাআত ধরব নাকি ক্রেতা ধরে রাখব। সুন্নাত অনুসরণ করলে সমাজ উপহাস করে, তাই যদি বন্ধুমহলে মিশে থাকার জন্য সুন্নাত ছেড়ে দিই, তাহলে বোঝা গেল সুন্নাতকে নয়, সমাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। কিয়ামতের দিন প্রত্যেকে জানবে, আমার কোন বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত ছিল আর আমি কাকে দিয়েছি।

❖ সূরা ইনফিতার, আয়াত ৬–৮

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ٦

[৬] হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল

ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ٧

[৭] যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন এবং সুষম করেছেন।

فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ٨

[৮] যিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।

আয়াত ৬–৮: ‘কিসে তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে ধোঁকায় ফেলল?’

এই আয়াতটি কুরআনের অন্যতম মর্মস্পর্শী আয়াত। বহু মানুষ এর মাধ্যমে হিদায়াতের পথে ফিরে এসেছে। আল্লাহ তাআলা কোনো বিশেষ শ্রেণির নয়, সব মানুষকে সম্বোধন করে বলছেন, ‘হে মানুষ, কিসে তোমাকে তোমার মহান (কারীম) রবের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলল?’

এই প্রশ্ন একই সঙ্গে দুটি সময়ের জন্য প্রযোজ্য। এক, আজ আল্লাহ আমাদের সতর্ক করছেন, এখনো সময় আছে, কেন ধোঁকায় পড়ে আছ? দুই, কিয়ামতের দিন যখন মানুষ নিজের আমলনামা দেখবে, তখন আল্লাহ তিরস্কার করে জিজ্ঞেস করবেন, তোমার সব প্রয়োজন আমি মিটিয়েছি, যশ, সম্পদ, সন্তান, সুস্থতা সব দিয়েছি, তবু কেন ধোঁকায় পড়লে?

এখানে আল্লাহর নাম 'কারীম' ব্যবহার করা হয়েছে, 'রাহমান' নয়। কারীম বলা হয় তাঁকে, যিনি চাওয়ার আগেই দেন, প্রয়োজনের চেয়েও বেশি দেন, এবং সম্মানের সঙ্গে দেন। আমরা সারা জীবন নাফরমানি করলেও আল্লাহ আমাদের দম আটকে দেন না। যে হাত দিয়ে আমরা তাঁর অবাধ্য হই, সেই হাত অচল করে দেন না, যে মুখে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলি, সেই মুখ বন্ধ করে দেন না। আল্লাহর এই ক্ষমতা ও সময় দেওয়াই মানুষকে ধোঁকায় ফেলে। সে ভাবে, আল্লাহ তো কিছু বলছেন না, তাহলে সবকিছু ঠিকই আছে। বর্ণিত আছে, কেউ জিজ্ঞেস করলে 'কিসে ধোঁকায় ফেলল?' ফুদাইল ইবনে ইয়ায রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আমি বলব, তোমার ঢেকে রাখা পর্দাগুলো আমাকে ধোঁকায় ফেলেছে। অর্থাৎ আল্লাহ আমার গুনাহ গোপন রেখেছেন বলে আমি সাহসী হয়েছি।

পরের আয়াতে সেই নিয়ামতের বিবরণ আছে, 'যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন, অতঃপর সুসামঞ্জস্য করেছেন।' আমাদের চোখ, নাক, মুখ, হাত-পা কীভাবে বসানো হয়েছে, ভেবে দেখুন। চোখ যদি পিঠে থাকত, হাত যদি একটি সামনে আর একটি পেছনে হতো, কী দুর্দশা হতো! হাতের আঙুলগুলো সমান নয়, কোনোটি ছোট, কোনোটি বড়। এই ভিন্নতার কারণেই আমরা শক্ত করে ধরতে, খেতে, লিখতে পারি। সব আঙুল সমান হলে ধরার কাজ করা কঠিন হতো। আল্লাহ বলেন, 'যে আকৃতিতে ইচ্ছা, তিনি তোমাকে গঠন করেছেন' (আয়াত ৮)। সূরা তীনে বলা হয়েছে, আমি মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছি (৯৫:৪)।

মুসনাদে আহমাদ ও সুনানে ইবনে মাজাহর একটি হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার নিজের হাতের তালুতে থুথু ফেললেন, তারপর বললেন, আল্লাহ বলেন, হে আদমসন্তান, তুমি কীভাবে আমাকে অক্ষম করতে পারো? আমি তোমাকে এই (তুচ্ছ বস্তু) থেকে সৃষ্টি করেছি, তারপর তোমাকে সুঠাম করেছি, এরপর যখন রূহ গলায় এসে পৌঁছায় তখন বলো, আমি সদকা করছি, অথচ তখন আর সদকার সময় নেই।

❖ সূরা ইনফিতার, আয়াত ৯–১২

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِٱلدِّينِ ﴿٩﴾

[৯] কখনও বিভ্রান্ত হয়ো না; বরং তোমরা দান-প্রতিদানকে মিথ্যা মনে করো।

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَٰفِظِينَ ﴿١٠﴾

[১০] অবশ্যই তোমাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত আছে।

كِرَامًا كَٰتِبِينَ ﴿١١﴾

[১১] সম্মানিত আমল লেখকবৃন্দ।

يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾

[১২] তারা জানে যা তোমরা কর।

আয়াত ৯–১২: কিয়ামত অস্বীকার ও সংরক্ষণকারী ফেরেশতা

নবম আয়াতে 'কাল্লা' (কখনো নয়) দিয়ে বলা হচ্ছে, 'বরং তোমরা প্রতিদান দিবসকে মিথ্যা বলো।' এত নিয়ামত পাওয়ার পরও তোমাদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসেনি। কারণ কী? তোমরা বিচারের দিনকে সত্য বলে বিশ্বাস করো না, অন্তত দৃঢ়ভাবে করো না। আমাদের অবস্থাও কি ভিন্ন? আমরা মুখে আখিরাতে বিশ্বাস করি, কিন্তু সেই বিশ্বাস কতটা মজবুত? যদি দৃঢ় বিশ্বাস থাকত, তাহলে এই অল্প কয়েক দিনের জীবনের জন্য সামান্য জমির আইল নিয়ে মানুষকে মেরে ফেলতাম না, রাজনৈতিক বা অন্য কোনো স্বার্থে অন্যায়ভাবে মানুষের ক্ষতি করতাম না। আমরা বিশ্বাস করি, দুনিয়াই সবকিছু, দুনিয়ার ক্ষমতাই চূড়ান্ত, তাই সাহস করে অন্যায় করি।

দশম থেকে দ্বাদশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'নিশ্চয়ই তোমাদের ওপর রয়েছে তত্ত্বাবধায়করা, সম্মানিত লিপিকাররা। তারা জানে তোমরা যা করো।' 'হাফিযীন' অর্থ সংরক্ষণকারী, 'কিরামান' অর্থ সম্মানিত, 'কাতিবীন' অর্থ লেখক। অনেকে এগুলোকে ফেরেশতাদের নাম মনে করে। কিন্তু এগুলো নাম নয়, বিশেষণ। কুরআনে তাঁদের নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ নেই। সূরা কাফে বলা হয়েছে, ডান ও বামে দুজন গ্রহণকারী বসে আছে। মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে, তার কাছে একজন প্রহরী প্রস্তুত থাকে (৫০:১৭–১৮)।

এই ফেরেশতারা আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ লিখে রাখছেন। শুধু তাঁরা নন, কিয়ামতের দিন আরও সাক্ষী হবে। আল্লাহ নিজেই সবকিছু দেখছেন। আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও সাক্ষ্য দেবে। সূরা ইয়াসীনে আল্লাহ বলেছেন, আজ আমি তাদের মুখে মোহর এঁটে দেব, তাদের হাত আমার সঙ্গে কথা বলবে এবং তাদের পা সাক্ষ্য দেবে তারা যা অর্জন করত (৩৬:৬৫)। সূরা ফুসসিলাতে আছে, তাদের কান, চোখ ও ত্বক তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে (৪১:২০–২১)। মানুষ নিজের অঙ্গকে ধমকে বলবে, তোমরা কেন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলে? অঙ্গরা উত্তর দেবে, যে আল্লাহ সবকিছুকে কথা বলান, তিনিই আমাদের কথা বলিয়েছেন। আজ মোবাইলের ভেতর থেকে যেভাবে আওয়াজ বেরোয়, তেমনি হাতের আঙুল থেকে আওয়াজ আসবে, যে এই হাত দিয়ে অমুক কাজ করা হয়েছিল, ওই পা দিয়ে অমুক পাপের জায়গায় যাওয়া হয়েছিল। তখন 'আমি মুখ বন্ধ রাখব' বলার সুযোগও থাকবে না, কারণ মুখেই মোহর পড়বে।

আজ কোনো অফিস বা রাস্তায় 'সিসি ক্যামেরা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত' লেখা থাকলে আমরা সতর্ক হই, ভুল করতে সাহস পাই না। অথচ আল্লাহ আমাদের প্রতিটি কাজ দেখছেন এবং ফেরেশতারা

রেকর্ড করছেন, একথা বিশ্বাস করেও আমরা তাঁর সামনে নাফরমানি করতে লজ্জা পাই না। ঘরের দরজা বন্ধ করে যে গুনাহ করা হয়, তা পৃথিবীর কেউ না দেখলেও ফেরেশতারা সঙ্গেই থাকেন। এই চিন্তা মনে জাগরূক রাখলে নির্জনেও গুনাহ করতে বিবেকে বাধবে।

❖ সূরা ইনফিতার, আয়াত ১৩–১৬

إِنَّ ٱلۡأَبۡرَارَ لَفِي نَعِيمٖ ﴿١٣﴾

[১৩] সৎকর্মশীলগণ থাকবে জান্নাতে।

وَإِنَّ ٱلۡفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٖ ﴿١٤﴾

[১৪] এবং দুষ্কর্মীরা থাকবে জাহান্নামে

يَصۡلَوۡنَهَا يَوۡمَ ٱلدِّينِ ﴿١٥﴾

[১৫] তারা বিচার দিবসে তথায় প্রবেশ করবে।

وَمَا هُمۡ عَنۡهَا بِغَآئِبِينَ ﴿١٦﴾

[১৬] তারা সেখান থেকে পৃথক হবে না।

আয়াত ১৩–১৬: নেককার ও পাপীর পরিণতি

ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই সৎকর্মশীলরা (আবরার) থাকবে নিয়ামতের মধ্যে।' চতুর্দশ আয়াতে, 'আর পাপাচারীরা (ফুজ্জার) থাকবে জাহান্নামে।' 'আবরার' অর্থ পুণ্যবান। 'ফুজ্জার' অর্থ সীমালঙ্ঘনকারী পাপাচারী। পঞ্চদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা প্রতিদান দিবসে তাতে প্রবেশ করবে।' আর ষোড়শ আয়াতে, 'এবং তারা তা থেকে অনুপস্থিত থাকতে পারবে না।' অর্থাৎ জাহান্নামে প্রবেশের পর সেখান থেকে বের হওয়া, পালানো বা ফাঁকি দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহ আমাদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করুন।

❖ সূরা ইনফিতার, আয়াত ১৭–১৯

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ﴿١٧﴾

[১৭] আপনি জানেন, বিচার দিবস কি

ثُمَّ مَآ أَدۡرَىٰكَ مَا يَوۡمُ ٱلدِّينِ ﴿١٨﴾

[১৮] অতঃপর আপনি জানেন, বিচার দিবস কি

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا وَٱلْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ ﴿١٩﴾

[১৯] যেদিন কেউ কারও কোন উপকার করতে পারবে না এবং সেদিন সব কতৃ(ো2468;্ব হবে আল্লাহর।

আয়াত ১৭–১৯: কেউ কারও উপকার করতে পারবে না

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে আল্লাহ একই প্রশ্ন দুবার করেছেন, 'আপনি কি জানেন প্রতিদান দিবস কী?' প্রশ্নের মাধ্যমে সেদিনের ভয়াবহতা ও বিস্ময় বোঝানো হচ্ছে। আপনি কি কল্পনা করতে পারেন সেদিনটি কেমন? এটি আসলে আপনার কল্পনার বাইরে।

ঊনবিংশ আয়াতে জবাব, 'সেদিন কোনো ব্যক্তি অন্য কারও জন্য কোনো কিছুর মালিক হবে না। আর সেদিন সব কর্তৃত্ব আল্লাহরই।' কেউ কারও উপকার করতে পারবে না, সামান্যতম সাহায্যও নয়। আজ আমরা ভাবি, কোনো প্রভাবশালী ব্যক্তি বা নেতার সুপারিশ আমাকে বাঁচিয়ে দেবে। বিপদে পড়লে ফোন করলেই বস রক্ষা করবেন। কিন্তু সেদিন ফোন করার কেউ থাকবে না, কোনো সুপারিশকারী কারও পক্ষে নিজের ইচ্ছায় এগিয়ে আসতে পারবে না।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি উপদেশ স্মরণযোগ্য। সূরা শুআরার 'আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন' আয়াত নাযিল হলে তিনি কুরাইশদের ডেকে বললেন, 'হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ, নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারব না' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তিনি তাঁর কন্যা, ফুফু ও আত্মীয়দের নাম ধরে ধরে এই কথা বলেছেন। আরেকটি হাদীসে তিনি বলেছেন, খেজুরের একটি টুকরা সদকা করে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। কিয়ামতের দিন 'আমি নবীর মেয়ে', 'আমি অমুক বংশের', 'আমি অমুক দলের', 'আমি অমুক পীরের মুরীদ' বলে কেউ রক্ষা পাবে না। প্রত্যেককে নিজ আমলের দ্বারা নিজেকে বাঁচাতে হবে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কিয়ামতের দৃশ্য বোঝার জন্য শুধু তিলাওয়াত নয়, অর্থ জেনে কুরআন পড়া দরকার। তিলাওয়াতের সওয়াব ও অর্থ বোঝার উপকার, দুটিই অর্জন করা উচিত।
- আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেছেন সুন্দরভাবে, অজস্র নিয়ামত দিয়েছেন। এই নিয়ামতের কারণে ধোঁকায় পড়ে অবাধ্য হওয়া বড় অকৃতজ্ঞতা।
- আখিরাতে বিশ্বাস দৃঢ় না হলে অন্যায়ে সাহস বাড়ে। বিশ্বাসকে মজবুত করতে হবে।
- আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজ ফেরেশতারা লিখছেন এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে। এই চিন্তা নির্জনেও গুনাহ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।

- আমরা জীবনে কাকে অগ্রাধিকার দিচ্ছি, আল্লাহ ও সুন্নাহকে নাকি দুনিয়ার স্বার্থ ও সমাজের চাপকে, তা কিয়ামতের দিন প্রকাশ পাবে।
- বংশ, দল বা কোনো ব্যক্তির পরিচয় আখিরাতে কাজে আসবে না। নিজের আমলই নাজাতের উপায়।

অধ্যায় ৬

সূরা মুতাফফিফীন

المطففين

মাপে কম দেওয়ার ভয়াবহ পরিণতি ও নেককারদের আমলনামা

কুরআনের ৮৩তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৩৬টি

সূরা মুতাফফিফীন কুরআনের ৮৩তম সূরা। এটি একটি সামাজিক অপরাধকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে, আর তা হলো লেনদেনে ঠকবাজি। এর মাক্কী ও মাদানী হওয়া নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মদীনায় এলেন, তখন মদীনার ব্যবসায়ীরা মাপে সবচেয়ে বেশি কম দিত। এরপর এই সূরা নাযিল হলে তারা মাপ ঠিক করে নেয়, ফলে তাদের মাপ হয়ে গেল সবচেয়ে ভালো (সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে নাসায়ী)। এ বর্ণনার কারণে অনেক মুফাসসির একে মাদানী বলেছেন, আবার অনেকে মক্কী সূরা হিসেবেই গণ্য করেন। আয়াত সংখ্যা ৩৬। সূরার শুরুতেই আল্লাহ তাআলা একটি সামাজিক অপরাধের কঠোর নিন্দা করেছেন।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ১–৩

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

[১] যারা মাপে কম করে, তাদের জন্যে দুর্ভোগ

ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُوا۟ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾

[২] যারা লোকের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পূর্ণ মাত্রায় নেয়

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

[৩] এবং যখন লোকদেরকে মেপে দেয় কিংবা ওজন করে দেয়, তখন কম করে দেয়।

আয়াত ১–৩: মাপে কম দেওয়ার অপরাধ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়াইলুল লিল মুতাফফিফীন’। ‘ওয়াইল’ শব্দের অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী এটি জাহান্নামের একটি উপত্যকার নামও। ‘মুতাফফিফ’ শব্দের মূল ‘তাতফীফ’, যার অর্থ কোনো জিনিসে সামান্য কমতি করা, তুচ্ছ পরিমাণ কম দেওয়া। অর্থাৎ যারা ওজন বা পরিমাপে ঠকায়।

পরের দুই আয়াতে তাদের চরিত্র বলা হয়েছে, 'যারা লোকদের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণ মাত্রায় নেয়, আর যখন তাদের মেপে বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়।' আগের যুগে পরিমাপের দুটি পদ্ধতি ছিল। একটি 'কায়ল', অর্থাৎ নির্দিষ্ট পাত্র দিয়ে মেপে দেওয়া। অন্যটি 'ওয়াযন', অর্থাৎ ওজন করা। আজ আমরা পরিমাপে মিটার, লিটার ও কেজি ব্যবহার করি। যন্ত্র বদলালেও বিষয়বস্তু বদলায়নি।

বিষয়টিকে অনেকে সামান্য ভাবে। এক কেজিতে নয়শো পঞ্চাশ গ্রাম দিলাম, পঞ্চাশ গ্রাম কম, চুরি বা ডাকাতি তো নয়! কিন্তু আল্লাহ তাআলা এটিকে অত্যন্ত গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য করেছেন। কারণ এখানে সম্পদের লোভই একমাত্র সমস্যা নয়। যে ব্যক্তি এভাবে ঠকায়, সে আসলে মনে করে, আমাকে কেউ দেখছে না, আমার জবাবদিহি করতে হবে না। আল্লাহ যে সবকিছু দেখছেন ও শুনছেন, এই বিশ্বাস তার অন্তর থেকে হারিয়ে যায়। এটি আল্লাহর ব্যাপারে বেপরোয়া মনোভাব। আর এখান থেকেই ছোট ছোট অপরাধ বড় অপরাধে রূপ নেয়। প্রথমে একটু কম দিতে হয়তো দ্বিধা হয়। পরদিন খাদ্যে ভেজাল মেশাতে শুরু করে। ধীরে ধীরে অপরাধটি তার কাছে একটি শিল্পে পরিণত হয়।

একবার আরেকজন দেখে নিজেও একই কাজ শুরু করে। একপর্যায়ে সমাজের পুরো বাজারব্যবস্থায় ধস নামে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। যে জাতির ওপর মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে যায়, সেই জাতি আর এগোতে পারে না। ব্যবসায়ীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতার বদলে কে কত বেশি ঠকিয়ে জিততে পারে, সেই প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ধনী আরও ধনী হয়, গরিব আরও গরিব হয়।

এ ধরনের জাতির পরিণতি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, যে সম্প্রদায় মাপে ও ওজনে কম দেয়, তারা দুর্ভিক্ষ, জীবনযাত্রার কষ্ট ও শাসকের জুলুমে আক্রান্ত হয় (সুনানে ইবনে মাজাহ)। আমরা প্রায়ই জুলুমের শিকার হওয়ার অভিযোগ করি। এর একটি কারণ আমরা নিজেরাও কোনো না কোনো পর্যায়ে জুলুমে জড়িত। বড় পদের লোকেরা বড় জুলুম করে, ছোট পদের লোকেরা ছোট জুলুম করে। আমিও সেই আসনে বসলে হয়তো একই কাজ করতাম। আমাদের কৃতকর্মের কারণেই আল্লাহ আমাদের ওপর জালিম শাসক চাপিয়ে দেন।

'তাতফীফ' আমাদের সবার জীবনে

মাপে কম দেওয়ার কথা শুনলে আমাদের মনে শুধু দোকানদারের ছবি আসে। অথচ 'তাতফীফ' আমাদের সবার জীবনের সঙ্গে জড়িত। কয়েকটি উদাহরণ দেখুন।

কর্মক্ষেত্রে: আমার সঙ্গে চুক্তি আট ঘন্টা কাজের। আমি দেরিতে অফিসে এলাম, কাজের ফাঁকে মোবাইলে সামাজিক মাধ্যম ঘাঁটলাম, সাত ঘন্টাও পূর্ণ কাজ করলাম না, কিন্তু মাস শেষে পুরো

বেতন নিলাম। এটি সময়ে মাপে কম দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুসলমানরা তাদের শর্তের ওপর প্রতিষ্ঠিত (সুনানে আবু দাউদ)। কেউ যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে সময়মতো কাজ পুরো করতে না পারে, তাহলে মাস শেষে কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে বলা উচিত, আমি যথাযথ সময় দিতে পারিনি, আপনি চাইলে এই পরিমাণ বেতন কেটে নিন। কর্তৃপক্ষ হয়তো কাটবে না, কিন্তু অন্তত নিজের দায়িত্ব থেকে সচেতনভাবে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা হলো। কারণ কিয়ামতের দিন বান্দার হক আল্লাহ মাফ করবেন না, যতক্ষণ না বান্দা নিজে মাফ করে।

পরিবারে: আমি স্ত্রীর কাছ থেকে সুন্দর আচরণ আশা করি, কিন্তু নিজে স্বামী হিসেবে তাঁর প্রাপ্য আচরণ পুরো দিই না। সন্তানের কাছ থেকে আনুগত্য চাই, কিন্তু বাবা হিসেবে সুশিক্ষা, শিষ্টাচার, সময় ও চরিত্র গঠনের যে হক সন্তানের আছে, তা আদায় করি না। এসবও পাওনা আদায়ে কম দেওয়া।

আল্লাহর হকের ক্ষেত্রে: নামাযে রুকু-সিজদা ঠিকমতো না করা, তাড়াহুড়ো করে নামায শেষ করাও আল্লাহর হকে কম দেওয়া। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে, প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণতা আছে এবং তাতফীফ আছে, অর্থাৎ নামাযেও। এক ব্যক্তি রুকু-সিজদা তাড়াতাড়ি সারছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর সে, যে নিজের নামায থেকে চুরি করে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, নামায থেকে কীভাবে চুরি করে? তিনি বললেন, সে রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে করে না (মুসনাদে আহমাদ)।

লেনদেনে: পণ্যের গায়ে যা লেখা আছে, ভেতরে তার চেয়ে কম থাকা। মজুরি দিতে টালবাহানা করা। রিকশাচালকের সঙ্গে পাঁচ টাকা নিয়ে বচসা করি, অথচ রেস্তোরাঁয় দুইশো টাকা হাসিমুখে ব্যয় করে আসি। কেউ হয়তো রিকশাচালককে বললেন, বাসায় গিয়ে টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি, আর আধা ঘণ্টা সে দাঁড়িয়ে থাকল। ভুলে গেলে ক্ষমা চাওয়া উচিত, ইচ্ছাকৃত হলে এর পরিণতি ভালো নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, শ্রমিকের ঘাম শুকিয়ে যাওয়ার আগে তার মজুরি দিয়ে দাও (সুনানে ইবনে মাজাহ)।

শুআইব আলাইহিস সালামের কওমকে এই অপরাধের জন্যই আল্লাহ ধ্বংস করেছিলেন। তিনি তাদের বলেছিলেন, তোমরা মাপে ও ওজনে কম দিয়ো না, আমি তোমাদের সমৃদ্ধ অবস্থায় দেখছি (সূরা হূদ ১১:৮৪)। কুরআনের অন্যত্র নির্দেশ এসেছে, মাপে পূর্ণ করো, সঠিক দাঁড়িপাল্লায় ওজন করো, এটাই কল্যাণকর ও পরিণামে উত্তম (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৩৫)।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ৪–৬

أَلَا يَظُنُّ أُوْلَٰٓئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ ﴿٤﴾

[৪] তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে৷

لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾

[৫] সেই মহাদিবসে

يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٦﴾

[৬] যেদিন মানুষ দাঁড়াবে বিশ্ব পালনকর্তার সামনে৷

আয়াত ৪–৬: 'তারা কি ভাবে না যে তাদের পুনরুত্থিত করা হবে?'

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'তারা কি ভাবে না যে তারা পুনরুত্থিত হবে, এক মহাদিনে?' এই ঠকবাজির পেছনে আসল কারণটি এখানে উঠে এসেছে৷ যে ব্যক্তি আখিরাতে পুনরুত্থানে সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে, সে মাপে কম দিতে পারে না৷ সে ভাবে, এখানে সিসি ক্যামেরা নেই, কেউ দেখছে না, সাক্ষী নেই৷ কিন্তু আল্লাহ দেখছেন৷

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের রবের সামনে দাঁড়াবে৷' হাদীসে এসেছে, সেদিন মানুষ ঘামে এমনভাবে ডুবে থাকবে যে কারও ঘাম তার কান পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)৷

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ৭–১২

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ﴿٧﴾

[৭] এটা কিছুতেই উচিত নয়, নিশ্চয় পাপাচারীদের আমলনামা সিজ্জীনে আছে৷

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا سِجِّينٌ ﴿٨﴾

[৮] আপনি জানেন, সিজ্জীন কি

كِتَٰبٌ مَّرْقُومٌ ﴿٩﴾

[৯] এটা লিপিবদ্ধ খাতা৷

وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ﴿١٠﴾

[১০] সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের

ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴿١١﴾

[১১] যারা প্রতিফল দিবসকে মিথ্যারোপ করে৷

وَمَا يُكَذِّبُ بِهِۦٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾

[১২] প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপিষ্ঠই কেবল একে মিথ্যারোপ করে।

আয়াত ৭–১২: 'সিজ্জীন' ও অস্বীকারকারীদের পরিণতি

সপ্তম আয়াতে 'কাল্লা' (কখনোই নয়) বলে আল্লাহ তাদের ধারণাকে খণ্ডন করছেন। তারা ভাবে, তাদের বিচার হবে না, তারা বেঁচে যাবে। কিন্তু 'নিশ্চয়ই পাপাচারীদের আমলনামা রয়েছে সিজ্জীনে।' 'সিজ্জীন' শব্দের মূল 'সিজন', অর্থ কারাগার। অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আপনি কি জানেন সিজ্জীন কী?' নবম আয়াতে উত্তর, 'এটি একটি লিপিবদ্ধ কিতাব।' 'মারকূম' অর্থ চিহ্নিত ও লিখিত। এটি একটি নির্দিষ্ট দফতর বা রেজিস্টার, যেখানে পাপীদের আমল লিপিবদ্ধ থাকে। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, কাফিরের রূহ যখন আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তখন আসমানের দরজা তার জন্য খোলা হয় না। আল্লাহ বলেন, তার আমলনামা সিজ্জীনে লিখে দাও, যা সর্বনিম্ন জমিনে (মুসনাদে আহমাদ)। অর্থাৎ 'সিজ্জীন' একই সঙ্গে আমলনামার নাম এবং তা সংরক্ষণের নিকৃষ্ট স্থানকেও বোঝায়। সাত জমিনের নিচের এক সংকীর্ণ কারাগার।

দশম ও একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যারোপকারীদের জন্য, যারা প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে।' অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা যাদের মাপে কম দেওয়া অপরাধী বলে চিহ্নিত করেছেন, তারা আসলে বিচার দিবসকে মিথ্যা বলে। দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'একমাত্র প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী পাপিষ্ঠই তাকে অস্বীকার করে।' যারা মাপে কম দেয়, তারা ফাজির (পাপাচারী) ও মু'তাদী (সীমালঙ্ঘনকারী), আর এর মূল কারণ বিচার দিবসে অবিশ্বাস।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ১৩–১৭

إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَٰتُنَا قَالَ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿١٣﴾

[১৩] তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হলে সে বলে, পুরাকালের উপকথা।

كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾

[১৪] কখনও না, বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয় মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

كَلَّآ إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾

[১৫] কখনও না, তারা সেদিন তাদের পালনকর্তার থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে।

ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا۟ ٱلْجَحِيمِ ﴿١٦﴾

[১৬] অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾

[১৭] এরপর বলা হবে, একেই তো তোমরা মিথ্যারোপ করতে।

আয়াত ১৩–১৭: অন্তরে মরিচা ও রবের দর্শন থেকে বঞ্চনা

ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, সে বলে, এসব পূর্ববর্তীদের উপকথা।' 'আসাতীরুল আউয়ালীন' বলে তারা কুরআনের কথাগুলোকে অতীতের কাল্পনিক গল্প বলে উড়িয়ে দিত। আজও আমাদের সমাজে এই মনোভাবের ছায়া আছে। মসজিদে মৃত্যু, কবর, জাহান্নামের আলোচনা শুরু হলে কেউ কেউ বলে, হুজুর, এসব বাদ দিন, এ তো আসমানের ওপর আর জমিনের নিচের কথা। ইসলামে এত কঠোরতা নেই, এগুলো হুজুরদের বানানো কথা। সত্যের কথাগুলো তাদের কাছে তেতো লাগে। কিন্তু আল্লাহর বাণী ও রাসূলের হাদীসকে উপেক্ষা করা কঠিন পরিণতি ডেকে আনে।

চতুর্দশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কখনোই নয়, বরং তারা যা অর্জন করত, তা-ই তাদের অন্তরে মরিচারূপে জমে গেছে।' 'রান' অর্থ মরিচা বা ময়লা। পাপ করতে করতে তাদের অন্তরে মরিচা ধরে গেছে। এখন কোনটা সঠিক আর কোনটা ভুল, সে পার্থক্য তারা আর টের পায় না। হাদীসে এসেছে, বান্দা যখন কোনো গুনাহ করে, তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। সে তাওবা করে ফিরে এলে অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। কিন্তু আবার গুনাহ করলে দাগ বাড়তে থাকে, এমনকি পুরো অন্তর ঢেকে যায়। আল্লাহ যে 'রান'-এর কথা বলেছেন, এটাই সেটি (জামে তিরমিযী ও সুনানে ইবনে মাজাহ)।

পঞ্চদশ আয়াতে ভয়াবহ ঘোষণা, 'কখনোই নয়, সেদিন তারা তাদের রবের (দর্শন) থেকে অন্তরালে থাকবে।' 'মাহজূবূন' অর্থ পর্দার আড়ালে রাখা। এর থেকে আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ প্রমাণ করেছেন, আখিরাতে মুমিনরা আল্লাহকে দেখতে পাবেন, কারণ পাপীদের বঞ্চিত করার উল্লেখ থেকে বোঝা যায়, মুমিনদের সামনে আল্লাহ প্রকাশিত হবেন। ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াত থেকে সেটাই বুঝেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা অবশ্যই তোমাদের রবকে দেখবে, যেমন পূর্ণিমার রাতে চাঁদ দেখো (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এটি জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত। যে ব্যক্তি এই দর্শনের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবে, তার চেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত আর কেউ নেই।

ষোড়শ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তারা অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' আর সপ্তদশ আয়াতে, 'তারপর বলা হবে, এটাই সেই বস্তু, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।' যে জাহান্নামের কথা শুনে তোমরা বিশ্বাস করতে না, যে বিশ্বাসের অভাবে মানুষকে ঠকাতে, সেটাই এই জাহান্নাম। এভাবে তাদের তিরস্কার করা হবে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- মাপে কম দেওয়া শুধু দোকানদারদের সমস্যা নয়। চাকরির সময়, কাজের মান, স্ত্রী-সন্তানের হক, এমনকি নামাযের রুকু-সিজদাতেও আমরা অনেক সময় 'তাতফীফ' করি।
- নিজের পাওনা পূর্ণ আদায় করা আর অন্যের পাওনা কম দেওয়া, দ্বিমুখী এই মানদণ্ড ইসলাম পছন্দ করে না।
- মাপে কম দেওয়ার মূল কারণ আখিরাতে বিশ্বাসের দুর্বলতা। আল্লাহ সব দেখছেন, এই বোধ জাগ্রত রাখতে হবে।
- ঠকবাজি সমাজের আস্থা নষ্ট করে। যে সমাজে আস্থা নেই, সেখানে উন্নতিও নেই।
- শ্রমিকের মজুরি ঘাম শুকানোর আগেই দেওয়া উচিত।
- বান্দার হক আখিরাতে আল্লাহ নিজে মাফ করবেন না। তাই দুনিয়াতেই হকদারের কাছ থেকে মাফ চেয়ে নেওয়া বা হক ফিরিয়ে দেওয়া দরকার।
- গুনাহ অন্তরে মরিচা ধরায়। তাওবা সেই মরিচা পরিষ্কার করে।
- আখিরাতে মুমিনরা আল্লাহকে দেখার সৌভাগ্য পাবেন, আর পাপীরা এ থেকে বঞ্চিত থাকবে।

সূরা মুতাফফিফীনের প্রথমাংশে ঠকবাজ ও কিয়ামত-অস্বীকারকারী পাপীদের পরিণতি বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা কুরআনে যেখানে কোনো বিষয়ের আলোচনা করেন, সেখানে তার বিপরীত বিষয়ও আনেন। পাপিষ্ঠদের আলোচনার পর এখন ১৮ নম্বর আয়াত থেকে নেককারদের কথা শুরু হচ্ছে। পাপীরা তাদের রবের দর্শন থেকে বঞ্চিত হবে, জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে, আর তাদের ধিক্কার দেওয়া হবে। এবার দেখা যাক নেককারদের পুরস্কার।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ১৮–২১

كَلَّآ إِنَّ كِتَٰبَ ٱلۡأَبۡرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾

[১৮] কখনও না, নিশ্চয় সৎলোকদের আমলনামা আছে ইল্লিয়্যীনে।

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

[১৯] আপনি জানেন ইল্লিয়্যীন কি

كِتَٰبٞ مَّرۡقُومٞ ﴿٢٠﴾

[২০] এটা লিপিবদ্ধ খাতা।

يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾

[২১] আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতাগণ একে প্রত্যক্ষ করে।

আয়াত ১৮–২১: ইল্লিয়্যীন

অষ্টাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কখনোই নয়, নিশ্চয়ই নেককারদের আমলনামা রয়েছে ইল্লিয়্যীনে।' 'ইল্লিয়্যীন' শব্দের মূল ধাতু 'উলূ', অর্থ উচ্চতা। আমরা নামাযে 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' বলি, সেই 'আ'লা'-র মূল ধাতুও একই। অর্থাৎ ইল্লিয়্যীন হলো সুউচ্চ স্থান। মুফাসসিরগণ বলেন, এটি সপ্ত আসমানের ওপরে, আরশের নিচে অবস্থিত। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহুর দীর্ঘ হাদীসে এসেছে, মুমিন বান্দার রূহ যখন আসমানে ওঠানো হয়, আল্লাহ বলেন, আমার বান্দার আমলনামা ইল্লিয়্যীনে লিখে দাও (মুসনাদে আহমাদ)। আগের অধ্যায়ে সিজ্জীনের বর্ণনায় যেমন আমলনামা ও রূহ উভয়ের নিম্নগামী হওয়ার কথা এসেছে, এখানেও তেমনি আমলনামা ও রূহ উভয়ের ঊর্ধ্বগামী হওয়ার ইঙ্গিত আছে। কিয়ামতের দিন যখন শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে, আল্লাহ মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া দেহকে পুনরায় গঠন করবেন। তখন সিজ্জীন থেকে পাপীদের রূহ তাদের দেহে প্রবেশ করবে, আর ইল্লিয়্যীন থেকে নেককারদের রূহ তাদের দেহে প্রবেশ করবে।

ঊনবিংশ আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি কি জানেন ইল্লিয়্যূন কী?' এখানে 'ইল্লিয়্যীন' ও 'ইল্লিয়্যূন' একই শব্দ, শুধু আরবি ব্যাকরণের নিয়মে রূপ পরিবর্তিত হয়েছে। বিংশ আয়াতে উত্তর দেওয়া হয়েছে, 'এটি একটি লিপিবদ্ধ কিতাব।' আর একবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা তা দেখে।' অর্থাৎ নেককারদের আমলনামা কেবল আল্লাহর সবচেয়ে কাছের ফেরেশতারাই প্রত্যক্ষ করেন। এটি নেককারদের বিশেষ সম্মানের নিদর্শন। আন্তর্জাতিক চুক্তিতে যেমন রাষ্ট্রপ্রধানরা সাক্ষী থাকেন, সাধারণ মানুষ থাকে না, তেমনি নেককারদের আমলনামার সাক্ষী হন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারা।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ২২–২৪

إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾

[২২] নিশ্চয় সৎলোকগণ থাকবে পরম আরামে

عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾

[২৩] সিংহাসনে বসে অবলোকন করবে।

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ ٱلنَّعِيمِ ﴿٢٤﴾

[২৪] আপনি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবেন।

আয়াত ২২–২৪: নেককারদের আসন ও চেহারার সজীবতা

দ্বাবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই নেককাররা থাকবে নিয়ামতের মধ্যে।' 'আবরার' শব্দটি 'বিররুন' থেকে এসেছে, অর্থ নেককার বা পুণ্যবান। এই নিয়ামত শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সবরকম। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, আবরার তাঁরা, যাঁরা কোনো সৃষ্টিজীবকে কষ্ট দেন না, এমনকি পিঁপড়াকেও না।

এই কথাটি আমাদের ভাবনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পিঁপড়া, মৌমাছি, হুদহুদ ও সুরাদ পাখি হত্যা করতে নিষেধ করেছেন (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ)। তিনি আরও বলেছেন, এক নারী একটি বিড়ালকে বেঁধে রেখে খাবার দেয়নি, ফলে বিড়ালটি মারা যায়, এই কারণে সে জাহান্নামে গেল। আর এক ব্যক্তি পিপাসায় কাতর কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। যে ব্যক্তি আল্লাহকে সত্যিকার ভালোবাসে, সে আল্লাহর সব সৃষ্টিকে ভালোবাসে। শীতের রাতে যদি রাস্তার কুকুর বা বিড়াল কষ্ট পায়, আর সামর্থ্য থাকলে পুরোনো কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া যায়, তাহলে এটাও নেকির কাজ। অবশ্য ক্ষতিকর প্রাণী, যেমন মশা, সাপ, বিচ্ছু, যেগুলো মানুষের ক্ষতি করে, এগুলো থেকে নিজেকে বাঁচাতে শরীয়ত অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু অকারণে, প্রয়োজন ছাড়া, কোনো প্রাণীকে হত্যা করা যাবে না।

ত্রয়োবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে।' 'আরাইক' হলো 'আরীকা'-র বহুবচন, অর্থ সুসজ্জিত সিংহাসন বা আসন। তারা কী দেখবে? মুফাসসিরগণ বলেন, নিজেদের নিয়ামত দেখবে এবং আল্লাহর দর্শন লাভ করবে।

চতুর্বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আপনি তাদের মুখমণ্ডলে নিয়ামতের সজীবতা দেখতে পাবেন।' 'নাদরাতুন না'ঈম' অর্থ নিয়ামতের দীপ্তি ও সজীবতা। যখন কারও মন ভালো থাকে, কোনো সুসংবাদ পায়, তার চেহারায় একটি উজ্জ্বলতা ফুটে ওঠে। জান্নাতীদের চেহারায় ঠিক তেমন অনন্ত আনন্দের ছাপ থাকবে।

এই দর্শনের কথা একটু বিস্তারিত বলা দরকার। আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেছেন, যারা সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে উত্তম প্রতিদান ও আরও অতিরিক্ত (সূরা ইউনুস ১০:২৬)। সহীহ মুসলিমের হাদীসে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে একজন ঘোষক বলবেন, আল্লাহর কাছে তোমাদের একটি প্রতিশ্রুতি আছে, তিনি তা পূর্ণ করতে চান। তারা বলবে, কী সেটি? তিনি কি আমাদের পাল্লা ভারী করেননি, চেহারা উজ্জ্বল করেননি, জান্নাতে প্রবেশ করাননি, জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেননি? তখন পর্দা সরানো হবে, তারা আল্লাহর দিকে তাকাবে। আল্লাহর দিকে তাকানোর চেয়ে প্রিয় আর কিছু তাদের দেওয়া হয়নি। 'যিয়াদা'

(অতিরিক্ত) অর্থ এটিই। আল্লাহ সকল সৌন্দর্যের স্রষ্টা। তাঁর নিজের সৌন্দর্য কেমন হবে, কোনো ভাষা তা ব্যক্ত করতে পারে না। এই দর্শন জাহান্নামীরা পাবে না, শুধু জান্নাতীরা পাবে, আর তা জান্নাতের সব নিয়ামতের চেয়ে উপভোগ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের রবকে দেখবে যেমন পূর্ণিমার চাঁদ দেখো। এতে কোনো ভিড়ও হবে না, ধাক্কাধাক্কিও না।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ২৫–২৮

يُسۡقَوۡنَ مِن رَّحِيقٖ مَّخۡتُومٖ ﴿٢٥﴾

[২৫] তাদেরকে মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে।

خِتَٰمُهُۥ مِسۡكٞۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلۡيَتَنَافَسِ ٱلۡمُتَنَٰفِسُونَ ﴿٢٦﴾

[২৬] তার মোহর হবে কস্তুরী। এ বিষয়ে প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।

وَمِزَاجُهُۥ مِن تَسۡنِيمٍ ﴿٢٧﴾

[২৭] তার মিশ্রণ হবে তসনীমের পানি।

عَيۡنٗا يَشۡرَبُ بِهَا ٱلۡمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾

[২৮] এটা একটা ঝরণা, যার পানি পান করবে নৈকট্যশীলগণ।

আয়াত ২৫–২৮: সিলমোহরযুক্ত পানীয় ও তাসনীম

পঞ্চবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাদের পান করানো হবে সিলমোহর-আঁটা বিশুদ্ধ পানীয় থেকে।' 'রাহীক' অর্থ নির্ভেজাল, খাঁটি পানীয়। 'মাখতূম' অর্থ মোহর করা, অর্থাৎ একেবারে অক্ষত, কেউ স্পর্শ করেনি। ষড়বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এর মোহর হবে মিশক।' এর দুটি অর্থ। একটি, পাত্রের মুখ মিশক দিয়ে আটকানো থাকবে। অন্যটি, এর শেষ স্বাদ ও ঘ্রাণ মিশকের মতো হবে। দুনিয়ার কোনো মিশকের সঙ্গে এর তুলনা হয় না।

এরপর বলা হয়েছে, 'আর এটার জন্যই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত।' 'তানাফুস' অর্থ কোনো মূল্যবান জিনিসের জন্য তীব্র আগ্রহে এগিয়ে যাওয়া। দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ, পদ ও সম্পদের জন্য আমরা যে প্রতিযোগিতা করি, আসল প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত এই জান্নাতী নিয়ামতের জন্য।

সপ্তবিংশ ও অষ্টবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর এর মিশ্রণ হবে তাসনীম থেকে, এটি একটি ঝরনা, যা থেকে পান করবে নৈকট্যপ্রাপ্তরা।' 'তাসনীম' অর্থ উচ্চ থেকে প্রবাহিত। আয়াতে জান্নাতীদের দুই শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এক, 'আবরার' (নেককার), তাদের সিলমোহরযুক্ত পানীয়ের সঙ্গে তাসনীমের একটু মিশ্রণ দেওয়া হবে। দুই, 'মুকাররাবূন' (বিশেষ নৈকট্যপ্রাপ্ত),

তারা সরাসরি তাসনীমের খাঁটি ঝরনা থেকে পান করবে। প্রত্যেকের প্রতিদান তার আমল অনুযায়ী ভিন্ন, এতে পূর্ণ ইনসাফ আছে। এই ভিন্নতার কারণে কারও মনে কোনো হিংসা বা ক্ষোভ থাকবে না। আল্লাহ বলেছেন, তাদের অন্তর থেকে আমি সব বিদ্বেষ দূর করে দেব (সূরা হিজর ১৫:৪৭)। কেউ ভাববে না, ওকে বেশি দেওয়া হলো, আমাকে কেন কম? আমরা কি কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাকামে মাহমূদ দাবি করি? সেই প্রশ্নই মনে জাগে না। প্রত্যেকে যা পাবে, তাতেই পরম তৃপ্ত থাকবে। একটি আফসোসই শুধু থাকবে, হায়, দুনিয়ায় যদি আরেকটু বেশি আমল করতাম।

এই নিয়ামতগুলোর কথা মাঝে মাঝে স্মরণ করা উচিত। দুনিয়ার সামান্য আরাম বা সুখের জন্য কেউ যদি চিরস্থায়ী জান্নাত থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ২৯–৩৩

إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجۡرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضۡحَكُونَ ٢٩

[২৯] যারা অপরাধী, তারা বিশ্বাসীদেরকে উপহাস করত।

وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمۡ يَتَغَامَزُونَ ٣٠

[৩০] এবং তারা যখন তাদের কাছ দিয়ে গমন করত তখন পরস্পরে চোখ টিপে ইশারা করত।

وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ٣١

[৩১] তারা যখন তাদের পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরত, তখনও হাসাহাসি করে ফিরত।

وَإِذَا رَأَوۡهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّونَ ٣٢

[৩২] আর যখন তারা বিশ্বাসীদেরকে দেখত, তখন বলত, নিশ্চয় এরা বিভ্রান্ত।

وَمَآ أُرۡسِلُواْ عَلَيۡهِمۡ حَٰفِظِينَ ٣٣

[৩৩] অথচ তারা বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধায়করূপে প্রেরিত হয়নি।

আয়াত ২৯–৩৩: যারা মুমিনদের ঠাট্টা করত

এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ দুনিয়ায় মুমিনদের প্রতি অপরাধীদের আচরণের বিবরণ দিয়েছেন। 'যারা অপরাধ করেছে, তারা মুমিনদের দেখে হাসত।' 'যখন তারা মুমিনদের পাশ দিয়ে যেত, তারা চোখ টিপে ইশারা করত।' 'যখন তারা নিজেদের পরিবারে ফিরে যেত, আনন্দ-ফুর্তিতে ফিরত।' 'আর যখন তাদের দেখত, বলত, এরা তো পথভ্রষ্ট।' আর আল্লাহ বলছেন, 'তাদের ওপর তাদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি।' অর্থাৎ মুমিনদের বিচার করার বা তাদের সঠিক-ভুল বলার অধিকার তাদের নেই।

মক্কায় কুরাইশ সর্দাররা দুর্বল ও দরিদ্র মুসলমান, যেমন বিলাল, সুহাইব ও আম্মার রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে ঠাট্টা করে বলত, এরা নাকি জান্নাতি! এরা যদি সত্যিই আল্লাহর প্রিয় হতো, তাহলে আল্লাহ দুনিয়াতেও কিছু দিতেন। আমাদের তো দুনিয়ায় সবকিছু দিয়েছেন, সুতরাং আমরাই আখিরাতেও সফল। তাদের এই ধারণা ভুল ছিল। দুনিয়ার ধন-সম্পদ আল্লাহর প্রিয় হওয়ার প্রমাণ নয়।

আজও আমাদের সমাজে এই মনোভাব দেখা যায়। যাঁরা দ্বীন মেনে চলেন, পর্দা করেন, দাড়ি রাখেন, ঘুষ বা সুদের সুযোগ থাকলেও এড়িয়ে চলেন, তাঁদের অনেককে বোকা, সেকেলে বা কট্টরপন্থী বলে ঠাট্টা করা হয়। এই আয়াতগুলো তাঁদের জন্য সান্ত্বনা। আল্লাহ দেখছেন কে কাকে নিয়ে হাসছে।

❖ সূরা মুতাফফিফীন, আয়াত ৩৪–৩৬

فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنَ ٱلْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

[৩৪] আজ যারা বিশ্বাসী, তারা কাফেরদেরকে উপহাস করছে।

عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾

[৩৫] সিংহাসনে বসে, তাদেরকে অবলোকন করছে

هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُوا۟ يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

[৩৬] কাফেররা যা করত, তার প্রতিফল পেয়েছে তো

আয়াত ৩৪–৩৬: সেদিনের হাসি

চতুস্ত্রিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আজ যারা ঈমান এনেছে, তারা কাফিরদের দেখে হাসবে।' পঞ্চত্রিংশ আয়াতে, 'সুসজ্জিত আসনে বসে তারা তাকিয়ে থাকবে।' ষটিত্রংশ আয়াতে প্রশ্ন, 'কাফিররা যা করত, তার প্রতিফল কি তারা পেয়েছে?'

কিয়ামতের দিন জান্নাতীদের জন্য আসনে বসে জাহান্নামীদের অবস্থা দেখার ব্যবস্থা থাকবে। দুনিয়ায় যারা তাঁদের ঠাট্টা করেছিল, তাদের পরিণতি দেখে তাঁরা হাসবেন। তবে এই হাসি বিদ্বেষ বা প্রতিশোধের স্পৃহা থেকে নয়। জান্নাতীদের অন্তরে কোনো হিংসা, ক্ষোভ বা বিদ্বেষ থাকবে না। এই হাসি এই কারণে যে আল্লাহর ওয়াদা সত্য প্রমাণিত হয়েছে, ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ঈমান ও ধৈর্যের প্রতিদান মিলেছে।

যাঁরা দুনিয়ায় ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করে দ্বীনের ওপর অবিচল আছেন, তাঁরা মনে রাখুন, ঠাট্টাকারীরা এখন যা হাসার হাসুক, একদিন আপনারাও হাসবেন। আর ফজরের নামাযে উঠতে আপনার যে কষ্ট হয়, ঘুমের লোভ ছেড়ে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যে উঠে আসেন, কবরে জান্নাতের সঙ্গে

সংযোগ খুলে দেওয়া হবে, আর বলা হবে, এবার নববধূর মতো নিশ্চিন্তে ঘুমাও (জামে তিরমিযী)। আর যাঁরা অলসতা করেছে, তাদের বলা হবে, এবার ঘুমের স্বাদ ভোগ করো।

শিক্ষা ও উপদেশ

- নেককারদের আমলনামা ইল্লিয়্যীনে, যেখানে কেবল আল্লাহর সবচেয়ে নৈকট্যপ্রাপ্ত ফেরেশতারাই তা দেখেন। এটি নেককারদের বিশেষ সম্মান।
- জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত আল্লাহর দর্শন। এই দর্শনের আশা নিয়ে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী আনন্দ ত্যাগ করা সহজ হয়ে যায়।
- জান্নাতীদের মধ্যে মর্যাদার স্তরভেদ থাকলেও কারও মনে হিংসা থাকবে না।
- যে আল্লাহকে ভালোবাসে, সে তাঁর সব সৃষ্টির প্রতি দয়া করে। অকারণে কোনো প্রাণীকে কষ্ট দেওয়া নেককারের চরিত্র নয়।
- দ্বীনের পথে চলতে গিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করা সাহাবীদের সুন্নাত। এর প্রতিদান আখিরাতে নিশ্চিত।
- দুনিয়ায় সুখে থেকেও আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে-ই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত। আর দুনিয়ায় কষ্ট সহ্য করেও যে আখিরাতে লাভবান, সে-ই প্রকৃত লাভবান।
- সূরাটিতে প্রথমে মাপে কম দেওয়ার অপরাধ, তারপর পাপীদের পরিণতি, তারপর নেককারদের পুরস্কার ও জান্নাতের নিয়ামত আলোচিত হয়েছে।

অধ্যায় ৭

সূরা ইনশিকাক

الإنشقاق

ডান হাতে আমলনামা পাওয়ার সৌভাগ্য

কুরআনের ৮৪তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ২৫টি

সূরা ইনশিকাক কুরআনের ৮৪তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২৫। আগের সূরাগুলোর মতো এর বিষয়বস্তুও কিয়ামত, পুনরুত্থান ও বিচার দিবস। 'ইনশিকাক' অর্থ বিদীর্ণ হওয়া। আসমানের মতো এত সুদৃঢ় সৃষ্টি যদি ফেটে যায়, তাহলে সেদিনের ভয়াবহতা কেমন হবে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কিয়ামতকে চোখে দেখার মতো অনুভব করতে চায়, সে যেন সূরা তাকভীর, ইনফিতার ও ইনশিকাক পাঠ করে। সেই তিন সূরার এটি তৃতীয়।

❖ সূরা ইনশিকাক, আয়াত ১–৫

إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴿١﴾

[১] যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾

[২] ও তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং আকাশ এরই উপযুক্ত

وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾

[৩] এবং যখন পৃথিবীকে সম্প্রসারিত করা হবে।

وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾

[৪] এবং পৃথিবী তার গর্ভস্থিত সবকিছু বাইরে নিক্ষেপ করবে ও শূন্যগর্ভ হয়ে যাবে।

وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾

[৫] এবং তার পালনকর্তার আদেশ পালন করবে এবং পৃথিবী এরই উপযুক্ত।

আয়াত ১–৫: আসমান ও জমিনের আনুগত্য

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন আসমান বিদীর্ণ হবে।' দ্বিতীয় আয়াতে, 'এবং তার রবের নির্দেশ পালন করবে, আর তার জন্য এটাই যথার্থ।' এখানে 'আযিনাত' শব্দের মূল অর্থ কান

পেতে শোনা। আসমান তার রবের আদেশ শুনবে এবং সম্পূর্ণ মেনে নেবে। 'ওয়া হুক্কাত' অর্থ, আর এটাই তার জন্য সমীচীন ও উপযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ নির্দেশ দিলে আসমানের মতো বিশাল সৃষ্টিও বিনা দ্বিধায় ফেটে পড়বে, আর এটাই তার প্রকৃতি।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যখন জমিনকে সম্প্রসারিত করা হবে।' 'মুদ্দাত' শব্দটি 'মাদ্দ' (টানা) থেকে এসেছে। যেমন তাজবীদে মাদ্দ অর্থ আলিফ টেনে পড়া। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, জমিনকে চামড়ার মতো টেনে সমতল করে দেওয়া হবে, উঁচু-নিচু পাহাড়-টিলা কিছুই থাকবে না। পুরো পৃথিবী হবে এক সমতল হাশরের ময়দান। এই ময়দানে সব মানুষ একত্র হবে।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর জমিন তার ভেতরের সবকিছু বের করে দেবে এবং খালি হয়ে যাবে।' জমিনকে যখন টেনে প্রসারিত করা হবে, তখন ভেতরে যা আছে, সবই বেরিয়ে আসবে। এর মধ্যে দাফনকৃত মানুষ যেমন আছে, তেমনি আছে খনিজ সম্পদ ও গুপ্তধন। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, সেদিন জমিন তার কলিজার টুকরোগুলো বের করে দেবে, স্তম্ভের মতো সোনা-রুপার স্তূপ। তখন হত্যাকারী বলবে, এর জন্যই আমি হত্যা করেছিলাম! আত্মীয়তা ছিন্নকারী বলবে, এর জন্যই আমি আত্মীয়তা ছিন্ন করেছিলাম! চোর বলবে, এর জন্যই আমার হাত কাটা গিয়েছিল! তারপর তারা সেটা ফেলে চলে যাবে, কেউ তা থেকে কিছু নেবে না। দুনিয়ায় যার জন্য মানুষ রক্ত ঝরায়, সেদিন তা মূল্যহীন।

পঞ্চম আয়াতে আবার বলা হয়েছে, জমিনও তার রবের আদেশ পালন করবে এবং এটাই তার জন্য যথার্থ।

❖ সূরা ইনশিকাক, আয়াত ৬

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدۡحٗا فَمُلَٰقِيهِ ٦

[৬] হে মানুষ, তোমাকে তোমরা পালনকর্তা পর্যন্ত পৌঁছতে কষ্ট স্বীকার করতে হবে, অতঃপর তার সাক্ষাৎ ঘটবে।

আয়াত ৬: মানুষের পরিশ্রম, গন্তব্য একটাই

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ সব মানুষকে সম্বোধন করে বলছেন, 'হে মানুষ, তুমি তোমার রবের দিকে কঠোর পরিশ্রম করে ছুটে চলেছ, অতঃপর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে।' 'কাদিহুন' অর্থ কঠোর পরিশ্রমী, আর 'কাদহান' দিয়ে সেই পরিশ্রমকে আরও জোরালো করা হয়েছে। প্রত্যেক মানুষ কোনো না কোনো লক্ষ্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করছে। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কেউ দুনিয়ার জন্য, কেউ আল্লাহর অবাধ্যতার পথে। কিন্তু সবাই চলেছে একই গন্তব্যের দিকে, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর দিকে।

এটি পরীক্ষার মতো। একজন ছাত্র নিষ্ঠার সঙ্গে পড়ছে, আরেকজন অলসতা করছে। কিন্তু পরীক্ষার তারিখ দুজনের জন্যই এগিয়ে আসছে। দুজনকেই একদিন পরীক্ষকের সামনে দাঁড়াতে হবে। যে প্রস্তুতি নিয়েছে, সে সফল হবে। যে নেয়নি, সে ব্যর্থ হবে। আমরা সবাই দুনিয়ায় এসে নিজের নাম নিবন্ধন করেছি। এখন একেকটি দিন, একেকটি ধাপ পার করে আমরা পরীক্ষার হলের দিকে এগোচ্ছি।

❖ সূরা ইনশিকাক, আয়াত ৭–৯

فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ۝٧

[৭] যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۝٨

[৮] তার হিসাব-নিকাশ সহজে হয়ে যাবে

وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ۝٩

[৯] এবং সে তার পরিবার-পরিজনের কাছে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যাবে

আয়াত ৭–৯: ডান হাতে আমলনামা ও সহজ হিসাব

সপ্তম থেকে নবম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘অতঃপর যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তার হিসাব নেওয়া হবে সহজভাবে, আর সে তার পরিবারের কাছে আনন্দিত চিত্তে ফিরে যাবে।’

‘সহজ হিসাব’ কী, তা আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি বললেন, সহজ হিসাব হলো শুধু আমলনামা পেশ করা (আরদ)। কিন্তু যার হিসাব নিয়ে প্রশ্ন শুরু হবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। অর্থাৎ আল্লাহ বান্দার আমলনামা দেখে বলবেন, যাও, ঠিক আছে। এটাই সহজ হিসাব। কিন্তু যদি আল্লাহ জিজ্ঞেস করেন, তুমি এটা কেন করলে, তাহলে ধরা পড়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেখানে এমন কোনো উত্তর নেই, যা দিয়ে মানুষ নিজেকে বাঁচাতে পারবে। ‘আমি বৃদ্ধ ছিলাম’, ‘অসুস্থতার কারণে ফজরে উঠতে পারিনি’, এসব অজুহাত আল্লাহর সামনে টিকবে না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দোয়া শিখিয়েছেন, **আল্লাহুম্মা হাসিবনী হিসাবান ইয়াসীরা**, হে আল্লাহ, আমার হিসাব সহজ করুন (মুসনাদে আহমাদ)। আমরা নিয়মিত এই দোয়া করতে পারি।

একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। যে মানুষ যেমন আচরণ করে, আল্লাহও তার সঙ্গে তেমন আচরণ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা

হয় না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তিনি আরও বলেছেন, এক ব্যক্তি লোকদের ঋণ দিত এবং তার কর্মচারীকে বলত, যে অভাবী, তাকে ছাড় দিয়ো, হয়তো আল্লাহ আমাদেরও ছাড় দেবেন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আমরা যদি অন্যের প্রত্যেকটি পাওনা পাই-পাই করে হিসাব করি, কারও ভুল ক্ষমা না করি, তবে নিজের হিসাবও কঠিন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যেখানে আমার নিজের হক, ক্ষমা করলে অন্য কারও ক্ষতি নেই, রাষ্ট্র বা প্রতিষ্ঠানের আমানতে কোনো ঘাটতি আসে না, সেখানে ক্ষমা করা ও ছাড় দেওয়া উত্তম। তবে আমানতের দায়িত্বের ক্ষেত্রে, যেমন সরকারি তহবিল বা অন্যের সম্পদ, যেখানে ক্ষমার অধিকার আমার নেই, সেখানে শক্তভাবে হিসাব নেওয়াই দায়িত্ব।

ঊনবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, সে তার পরিবারের কাছে আনন্দিত হয়ে ফিরে যাবে। আমরা দেখি, পরীক্ষায় ভালো ফল করলে ছাত্ররা আত্মীয়দের ফোন করে জানায়, আমি এ-প্লাস পেয়েছি। কিয়ামতের দিন সফল ব্যক্তিও আনন্দে আত্মহারা হয়ে সবাইকে ডেকে ডেকে বলবে, এই নাও, আমার আমলনামা পড়ে দেখো (সূরা হাক্কা ৬৯:১৯)। সে নিজেই যেন সাক্ষাৎকার দেবে, আমি সবসময় বিশ্বাস করতাম যে আমি আমার হিসাবের মুখোমুখি হব। সেই বিশ্বাসই আজ আমার জন্য সফলতা সহজ করেছে।

❖ সূরা ইনশিকাক, আয়াত ১০–১৫

وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهْرِهِۦ ﴿١٠﴾

[১০] এবং যাকে তার আমলনামা পিঠের পশ্চাদ্দিক থেকে দেয়া, হবে

فَسَوْفَ يَدْعُوا۟ ثُبُورًا ﴿١١﴾

[১১] সে মৃত্যুকে আহবান করবে

وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٢﴾

[১২] এবং জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

إِنَّهُۥ كَانَ فِىٓ أَهْلِهِۦ مَسْرُورًا ﴿١٣﴾

[১৩] সে তার পরিবার-পরিজনের মধ্যে আনন্দিত ছিল।

إِنَّهُۥ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ ﴿١٤﴾

[১৪] সে মনে করত যে, সে কখনও ফিরে যাবে না।

بَلَىٰٓ ۚ إِنَّ رَبَّهُۥ كَانَ بِهِۦ بَصِيرًا ﴿١٥﴾

[১৫] কেন যাবে না, তার পালনকর্তা তো তাকে দেখতেন।

আয়াত ১০–১৫: পিঠের পেছন থেকে আমলনামা পাওয়া ব্যক্তি

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যাকে তার আমলনামা পিঠের পেছন দিক থেকে দেওয়া হবে।' সূরা হাক্কায় বলা হয়েছে, বাম হাতে দেওয়া হবে (৬৯:২৫)। মুফাসসিরগণ বলেন, তার বাম হাত পিঠের পেছনে বেঁধে সেখান দিয়ে আমলনামা ধরিয়ে দেওয়া হবে। আখিরাতের এই অবস্থার প্রকৃত ধরন আল্লাহই ভালো জানেন। এটি তার জন্য চরম অপমান ও লাঞ্ছনা।

একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে মৃত্যুকে ডাকবে।' সে বলবে, হায়, আমি যদি ধ্বংস হয়ে যেতাম! আর দ্বাদশ আয়াতে, 'সে প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।' এই পরিণতির কারণ বলা হয়েছে ত্রয়োদশ আয়াতে, 'সে তার পরিবারের মধ্যে আনন্দ-উল্লাসে থাকত।' যে সময় আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করা, ক্ষমা চাওয়া দরকার ছিল, তখন সে হাসত। গুনাহ করে আনন্দ করত, পরিবারের কাছে এমনভাবে ফিরত যেন কোনো জবাবদিহি নেই। চতুর্দশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে ভেবেছিল, সে কখনোই ফিরে যাবে না।' 'ইয়াহূর' অর্থ ফিরে যাওয়া, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা। পঞ্চদশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'অবশ্যই (ফিরে যাবে)। নিশ্চয়ই তার রব তাকে সবসময় দেখছিলেন।' সে কোথায় নাফরমানি করছে, কোথায় অন্যের ক্ষতি করছে, কোথায় জুলুম করছে, আল্লাহ সবই দেখছেন।

❖ সূরা ইনশিকাক, আয়াত ১৬–১৯

فَلَآ أُقۡسِمُ بِٱلشَّفَقِ ﴿١٦﴾

[১৬] আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার

وَٱلَّيۡلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾

[১৭] এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে

وَٱلۡقَمَرِ إِذَا ٱتَّسَقَ ﴿١٨﴾

[১৮] এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে

لَتَرۡكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٖ ﴿١٩﴾

[১৯] নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে।

আয়াত ১৬–১৯: শপথ ও স্তরে স্তরে অগ্রযাত্রা

এখানে আল্লাহ তাআলা তিনটি সৃষ্টির শপথ করেছেন। ষোড়শ আয়াতে 'শাফাক' বা সূর্যাস্তের পর আকাশে যে লালচে আভা দেখা যায়। সপ্তদশ আয়াতে রাত এবং 'যা কিছু সে একত্র করে'। রাত নামলে পশুপাখি সবাই নিজ নিজ নীড়ে ফিরে যায়, রাত যেন সবকিছুকে একত্রিত করে। অষ্টাদশ আয়াতে পূর্ণিমার চাঁদ, যখন তা পূর্ণতা লাভ করে।

এই তিন শপথের পর ঊনবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তোমরা অবশ্যই স্তর থেকে স্তরে আরোহণ করবে।’ ‘তাবাক’ অর্থ স্তর বা অবস্থা। মুফাসসিরগণ বলেছেন, এটি মানুষের জীবনের ধাপগুলোর কথা, মাতৃগর্ভের ভ্রূণ থেকে শিশু, কিশোর, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, তারপর মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান, হাশর ও হিসাব। প্রতিটি ধাপ আগের ধাপ থেকে ভিন্ন, আর কেউ এই ধাপগুলো এড়াতে পারে না।

আমরা প্রতিদিন নিজের জীবনেই এর নমুনা দেখি। এককালে মাথার চুল কালো ছিল, আজ সাদা হচ্ছে। দাঁত উঠেছিল, পড়ে গিয়েছিল, আবার উঠেছিল, এবার আবার পড়ছে। শরীরের শক্তি কমছে। এসবই মৃত্যুর বার্তা। আমরা প্রতিদিন কারও না কারও মৃত্যুসংবাদ শুনি, জানাযায় অংশ নিই। এই সবই আমাদের শেখাচ্ছে যে আমাদেরও সেই পথ ধরতে হবে।

❖ সূরা ইনশিকাক, আয়াত ২০–২১

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٢٠﴾

[২০] অতএব, তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনে না

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَۜ ﴿٢١﴾

[২১] যখন তাদের কাছে কোরআন পাঠ করা হয়, তখন সেজদা করে না।

আয়াত ২০–২১: কুরআন শুনে নত না হওয়ার আফসোস

বিংশ আয়াতে আল্লাহ প্রশ্ন করছেন, ‘তাদের কী হলো, তারা ঈমান আনে না?’ আর একবিংশ আয়াতে, ‘যখন তাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয়, তারা সিজদা করে না।’ এখানে ‘সিজদা’ অর্থ নতি স্বীকার ও আনুগত্য করা। তবে এটি একটি তিলাওয়াতের সিজদার আয়াতও বটে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরায় সিজদা করেছেন (সহীহ মুসলিম)। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এই আয়াত পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের ওপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব। এই আয়াত পড়ার বা শোনার পর একটি সিজদা করে নেওয়া উচিত।

❖ সূরা ইনশিকাক, আয়াত ২২–২৫

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

[২২] বরং কাফেররা এর প্রতি মিথ্যারোপ করে।

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

[২৩] তারা যা সংরক্ষণ করে, আল্লাহ তা জানেন।

فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٢٤

[২৪] অতএব, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونٍ ٢٥

[২৫] কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত পুরস্কার।

আয়াত ২২–২৫: কাফিরদের শাস্তি ও মুমিনদের নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান

দ্বাবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বরং কাফিররা মিথ্যারোপ করে।' তারা না বোঝার কারণে অস্বীকার করে না। তারা বোঝে, কুরআন সত্য ও অলৌকিক। কিন্তু অহংকার ও জেদের কারণে মানতে চায় না। ত্রয়োবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আল্লাহ ভালোভাবেই জানেন, তারা (অন্তরে) যা গোপন রাখে।'

চতুর্বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।' এখানে সুসংবাদ শব্দটি তিরস্কার ও কটাক্ষের অর্থে এসেছে, যেমন দুষ্টু সন্তানকে মা বলেন, ঘরে এসো, মজা দেখাচ্ছি। অর্থাৎ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি অপেক্ষা করছে।

পঞ্চবিংশ আয়াতে ব্যতিক্রম ঘোষণা করা হয়েছে, 'তবে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান।' 'গাইরু মামনূন' অর্থ যা কখনো কাটা বা কমানো হবে না, কখনো শেষ হবে না, এবং যার জন্য কোনো খোঁটাও দেওয়া হবে না। এটি জান্নাতের নিয়ামত।

আমরা 'আমলে সালেহ' বলতে সাধারণত নামায, রোযা, হজ, যাকাতকেই বুঝি। এগুলো অবশ্যই আমলে সালেহ, কিন্তু আমলে সালেহ আরও ব্যাপক। যেকোনো ভালো কাজ, কারও উপকার করা, শীতবস্ত্র দেওয়া, কেউ রিকশা উঁচু জায়গায় তুলতে পারছে না আর আমি ধাক্কা দিয়ে সাহায্য করা, এমনকি পশুর প্রতি দয়া করা, সবই আমলে সালেহ।

এখানে আমাদের সমাজে দুটি ভুল ধারণার কথা বলা দরকার। এক দল মনে করে, 'সেবাই ধর্ম', মানুষের সেবা করলেই যথেষ্ট, ঈমান জরুরি নয়। আরেক দল মনে করে, মুসলমান পরিচয়ই যথেষ্ট, নামায না পড়লেও, ভালো কাজ না করলেও জান্নাতে যাওয়া যাবে। দুটিই ভুল। আয়াতে ঈমান ও আমলে সালেহ দুটিই একসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। ঈমান আমলে সালেহ কবুলের শর্ত, আর আমলে সালেহ ঈমানের প্রমাণ।

অমুসলিমরা যে জনকল্যাণমূলক কাজ করে, এ নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ মুমিনের কোনো নেকি কমান না, তাকে দুনিয়াতেও দান করেন, আখিরাতেও

প্রতিদান দেন। আর কাফির তার নেক কাজের প্রতিদান দুনিয়ায় ভোগ করে। আখিরাতে এলে তার জন্য কোনো নেকি অবশিষ্ট থাকে না (সহীহ মুসলিম)। আল্লাহ কারও প্রতি অবিচার করেন না, তাই তাদের ভালো কাজের বিনিময় দুনিয়াতেই দিয়ে দেন। তবে দুনিয়ার বৈষয়িক সাফল্য কেবল এই কারণেই নয়, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবকাশ ও পরীক্ষাও হতে পারে। আর মুমিনের জন্য দুনিয়ায় অভাব, কষ্ট বা পিছিয়ে থাকা আল্লাহর অসন্তুষ্টি প্রমাণ করে না। এসবই আমাদের পরীক্ষার অংশ।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আসমান ও জমিনের মতো বিশাল সৃষ্টিও আল্লাহর নির্দেশ মেনে নেয়। মানুষের ওপরই আল্লাহর আনুগত্য সবচেয়ে বেশি প্রযোজ্য।
- আমরা সবাই পরিশ্রম করছি, কিন্তু সবার গন্তব্য একটাই, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো। প্রস্তুতির ওপর পরিণাম নির্ভর করে।
- হিসাব কঠিন হলে বাঁচার উপায় নেই, তাই সহজ হিসাবের দোয়া নিয়মিত করা উচিত।
- যে অন্যের ভুল ক্ষমা করে, আল্লাহ তার প্রতি ক্ষমাশীল হবেন বলে আশা করা যায়।
- গুনাহ করে আনন্দ করা, আখিরাতের জবাবদিহিকে ভুলে থাকা ধ্বংসের লক্ষণ।
- জীবনের প্রতিটি ধাপ, শৈশব থেকে বার্ধক্য, আমাদের মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। এই বার্তা থেকে শিক্ষা নেওয়া দরকার।
- ঈমান ও আমলে সালেহ দুটিই জরুরি। শুধু সেবা বা শুধু ঈমানের দাবি যথেষ্ট নয়।
- এই সূরার সিজদার আয়াত পড়লে বা শুনলে সিজদা করা উচিত।

অধ্যায় ৮

সূরা বুরূজ

البروج

আসহাবুল উখদূদ: অগ্নিকুণ্ডের ঘটনা

কুরআনের ৮৫তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ২২টি

সূরা বুরূজ কুরআনের ৮৫তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২২। এই সূরা এমন এক সময়ে নাযিল হয়, যখন মক্কার মুশরিকরা মুসলমানদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী ঈমানদারদের পরীক্ষা ও কষ্টের ঘটনা তুলে ধরে মক্কার মুমিনদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন এবং ধৈর্য ধরতে উৎসাহিত করছেন। সূরার মূল আলোচ্য বিষয় কাফিরদের পরিণতি এবং আল্লাহর অসীম কুদরত।

❖ সূরা বুরূজ, আয়াত ১–৩

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ﴿١﴾

[১] শপথ গ্রহ-নক্ষত্র শোভিত আকাশের

وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ﴿٢﴾

[২] এবং প্রতিশ্রুত দিবসের

وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ﴿٣﴾

[৩] এবং সেই দিবসের, যে উপস্থিত হয় ও যাতে উপস্থিত হয়

আয়াত ১–৩: তিনটি শপথ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘শপথ বুরূজবিশিষ্ট আসমানের।’ ‘বুরূজ’ হলো ‘বুরজ’-এর বহুবচন, অর্থ দুর্গ, মিনার বা বিশাল তারকা। মুফাসসিরদের এখানে বিভিন্ন মত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ বলেছেন, বুরূজ অর্থ বিশাল তারকারাজি। কেউ বলেছেন, আসমানের এমন কক্ষপথ বা মঞ্জিল, যেখানে সূর্য-চন্দ্র ও গ্রহরা চলাচল করে। আবার কারও মতে, প্রহরী ফেরেশতাদের দুর্গ। সব মতেই আসমানের বিশালতা ও দৃঢ়তার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং প্রতিশ্রুত দিনের।’ প্রতিশ্রুত দিন হলো কিয়ামত, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ বারবার দিয়েছেন। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং সাক্ষ্যদাতার ও যার সাক্ষ্য দেওয়া হয়, তার শপথ।’ ‘শাহিদ’ ও ‘মাশহূদ’ নিয়ে মুফাসসিরদের একাধিক মত আছে।

জামে তিরমিযীতে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি হাদীস বর্ণিত আছে, যাতে বলা হয়েছে, 'ইয়াওমুল মাওউদ' হলো কিয়ামত, 'শাহিদ' হলো জুমার দিন এবং 'মাশহূদ' হলো আরাফার দিন। অন্য মতে, শাহিদ অর্থ ফেরেশতা ও নবী-রাসূলগণ, যাঁরা কিয়ামত সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবেন, আর মাশহূদ অর্থ কিয়ামত বা বান্দাদের আমল।

❖ সূরা বুরূজ, আয়াত ৪–৯

قُتِلَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡأُخۡدُودِ ٤

[৪] অভিশপ্ত হয়েছে গর্ত ওয়ালারা অর্থাৎ

ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلۡوَقُودِ ٥

[৫] অনেক ইন্ধনের অগ্নিসংযোগকারীরা

إِذۡ هُمۡ عَلَيۡهَا قُعُودٞ ٦

[৬] যখন তারা তার কিনারায় বসেছিল।

وَهُمۡ عَلَىٰ مَا يَفۡعَلُونَ بِٱلۡمُؤۡمِنِينَ شُهُودٞ ٧

[৭] এবং তারা বিশ্বাসীদের সাথে যা করেছিল, তা নিরীক্ষণ করছিল।

وَمَا نَقَمُواْ مِنۡهُمۡ إِلَّآ أَن يُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلۡعَزِيزِ ٱلۡحَمِيدِ ٨

[৮] তারা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল

ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ٩

[৯] যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু।

আয়াত ৪–৯: গর্তওয়ালাদের অভিশাপ

এই শপথগুলোর পর আল্লাহ বলছেন, 'ধ্বংস হোক গর্তওয়ালারা।' 'আসহাবুল উখদূদ' অর্থ গর্তের অধিবাসী। 'উখদূদ' অর্থ মাটি খুঁড়ে বানানো গভীর গর্ত বা পরিখা। আয়াতটি আপাতদৃষ্টিতে একটি বদদোয়ার মতো শোনায়। আল্লাহ যখন কাউকে এভাবে অভিশাপ দেন, তা বাস্তবায়িতই হয়ে যায়। 'কুতিলা' শব্দের শাব্দিক অর্থ 'নিহত হয়েছে', যা আরবি বাগধারায় অভিশাপ বোঝায়। অর্থাৎ তাদের ধ্বংস নিশ্চিত হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা ভালো, মজলুমের বদদোয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌঁছায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মজলুমের

দোয়াকে ভয় করো, কারণ তার ও আল্লাহর মাঝে কোনো পর্দা নেই (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইন্ধনপূর্ণ আগুনের' ষষ্ঠ আয়াতে, 'যখন তারা তার পাশে বসেছিল' সপ্তম আয়াতে, 'আর তারা মুমিনদের সঙ্গে যা করছিল, তা প্রত্যক্ষ করছিল।' অর্থাৎ তারা বিশাল গর্তে আগুন জ্বালিয়ে তার পাশে বসে মুমিনদের নির্যাতন দেখছিল। অষ্টম আয়াতে এর কারণ বলা হয়েছে, 'তারা তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছিল শুধু এই কারণে যে তারা ঈমান এনেছিল পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর।' এটাই ছিল মুমিনদের একমাত্র অপরাধ। নবম আয়াতে আল্লাহর পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 'যাঁর জন্য আসমান-জমিনের রাজত্ব, আর আল্লাহ সবকিছুর সাক্ষী।'

গর্তওয়ালাদের ঘটনা

এই আয়াতগুলোর প্রেক্ষাপট নিয়ে মুফাসসিরগণ সহীহ মুসলিমের (কিতাবুয যুহদ) একটি দীর্ঘ হাদীসের উল্লেখ করেন, যা সুহাইব রুমী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন। এই হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি পূর্ববর্তী উম্মতের ঘটনা বলেছেন। তিনি এটি সূরা বুরূজের তাফসীর হিসেবে সরাসরি উল্লেখ করেননি, কিন্তু আয়াতের বর্ণনার সঙ্গে ঘটনার মিল আছে বলে তাফসীরবিদগণ একে এই আয়াতের ব্যাখ্যা হিসেবে এনেছেন।

ঘটনাটি এই। আগের যুগে একজন বাদশাহ ছিলেন, যাঁর একজন জাদুকর ছিল। জাদুকর বৃদ্ধ হয়ে গেলে বাদশাহকে বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার জাদুবিদ্যা কাউকে শিখিয়ে যেতে চাই। আমাকে একজন বুদ্ধিমান ছেলে দিন। বাদশাহ একটি ছেলেকে পাঠালেন। কোনো কোনো বর্ণনায় ছেলেটির নাম আবদুল্লাহ ইবনুস সামির বলা হয়েছে, তবে সহীহ হাদীসে নাম নেই।

ছেলেটি জাদুকরের কাছে যাওয়ার পথে একজন রাহিব (সংসারত্যাগী আল্লাহভক্ত ধর্মগুরু)-কে পেল। সে তাঁর কাছে বসত এবং তাঁর কথা শুনে মুগ্ধ হলো। এভাবে জাদুকরের কাছে যেতে তার দেরি হতো, ফলে জাদুকর তাকে মারধর করত, বাড়ি ফিরতেও দেরি হতো বলে পরিবারের কাছেও বকুনি খেত। রাহিব তাকে বলল, জাদুকরকে বলো, বাড়ির লোক আটকে রেখেছিল, আর বাড়িতে বলো, জাদুকর আটকে রেখেছিল।

একদিন রাস্তায় একটি বিশাল হিংস্র জন্তু পড়ে থাকায় সব লোকের যাতায়াত বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেটি ভাবল, আজ বোঝা যাবে রাহিব উত্তম, না জাদুকর উত্তম। সে একটি পাথর হাতে নিয়ে বলল, হে আল্লাহ, রাহিবের পথ যদি আপনার কাছে জাদুকরের পথের চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে এই পাথরের আঘাতে এই জন্তুকে মেরে ফেলুন, যাতে লোকজন চলতে পারে। সে পাথর ছুড়ল, আর জন্তুটি মারা গেল। এই খবর সবাই জেনে ফেলল। রাহিব তাকে বললেন, বাছা,

তুমি আজ আমার চেয়ে উত্তম হয়ে গেছ। তোমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেলা হবে। যদি পরীক্ষায় পড়ো, আমার কথা কাউকে বোলো না।

ছেলেটি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ করত। বাদশাহর একজন সভাসদ অন্ধ ছিলেন। তিনি অনেক উপহার নিয়ে ছেলেটির কাছে এলেন। ছেলেটি বলল, আমি কাউকে সুস্থ করি না, সুস্থ করেন আল্লাহ। তুমি যদি আল্লাহর ওপর ঈমান আনো, আমি দোয়া করব। সভাসদ ঈমান আনলেন এবং আল্লাহ তাঁকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি যখন বাদশাহর কাছে গেলেন, বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে কে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিল? তিনি বললেন, আমার রব। বাদশাহ বললেন, আমি ছাড়া তোমার আর কোনো রব আছে? তিনি বললেন, আমার ও আপনার রব আল্লাহ। বাদশাহ তাঁকে নির্যাতন করলে তিনি ছেলেটির কথা বলে দিলেন।

ছেলেটিকে ধরে আনা হলে সে রাহিবের কথা বলে দিল। রাহিবকে বলা হলো, ধর্ম ছেড়ে দাও। তিনি রাজি হলেন না। করাত দিয়ে তাঁর মাথা চিরে দুই ভাগ করা হলো। সভাসদকেও একইভাবে হত্যা করা হলো। এরপর ছেলেটিকে বলা হলো, ধর্ম ছেড়ে দাও। সে অস্বীকার করল। তখন একদল সৈন্যের সঙ্গে তাকে পাহাড়ের চূড়ায় পাঠানো হলো, যাতে ধর্ম না ছাড়লে সেখান থেকে ফেলে দেওয়া হয়। ছেলেটি দোয়া করল, হে আল্লাহ, আপনি যেভাবে চান, এদের থেকে আমাকে রক্ষা করুন। পাহাড় কেঁপে উঠল আর সৈন্যরা পড়ে গেল। ছেলেটি হেঁটে বাদশাহর কাছে ফিরে এল। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সঙ্গীরা কোথায়? সে বলল, আল্লাহ আমাকে তাদের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এবার তাকে নৌকায় করে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে ডুবিয়ে মারার নির্দেশ দেওয়া হলো। সে একই দোয়া করল, নৌকা উল্টে গেল, সৈন্যরা ডুবে মারা গেল, ছেলেটি ফিরে এল।

তখন ছেলেটি বাদশাহকে বলল, আপনি আমাকে হত্যা করতে পারবেন না, যতক্ষণ আমি যা বলি তা না করেন। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, কী? সে বলল, সবাইকে একটি খোলা মাঠে জমায়েত করুন, আমাকে একটি খেজুর গাছের কাণ্ডে ঝুলিয়ে দিন। আমার তূণীর থেকে একটি তীর নিন, ধনুকে লাগান, তারপর বলুন, 'এই ছেলেটির রব আল্লাহর নামে', তারপর তীর ছুড়ুন। তাহলে আমাকে হত্যা করতে পারবেন। বাদশাহ তা-ই করলেন। তীর ছেলেটির কপালে বিঁধল। সে হাত রেখে বলল, এ আল্লাহর নামে। আর মারা গেল। উপস্থিত সবাই চিৎকার করে বলে উঠল, আমরা এই ছেলের রবের ওপর ঈমান আনলাম।

বাদশাহ ভেবেছিলেন, ছেলেকে মারলে এই ঈমান থেমে যাবে। হলো উল্টোটাই। যে ঈমান ঠেকানোর জন্য ছেলেটিকে হত্যা করা হলো, ছেলেটির মৃত্যুর পরই সবাই সেই ঈমানে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাদশাহ ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে রাস্তার মোড়ে মোড়ে বিশাল গর্ত খুঁড়ে আগুন জ্বালালেন। বললেন, যে ধর্ম ছাড়বে না, তাকে আগুনে নিক্ষেপ করো। সবাই আগুনে ঝাঁপ দিতে লাগল।

একজন নারী তাঁর শিশুকে নিয়ে ইতস্তত করছিলেন। শিশুটি কথা বলে উঠল, মা, ধৈর্য ধরো, তুমি সত্যের ওপর আছ।

এই ঘটনা থেকে বোঝা যায়, হক ও বাতিলের সংঘাত নতুন নয়। যুগে যুগে ঈমানদাররা ঈমানের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন। কুরআন বলছে, 'তারা তাদের কাছ থেকে শুধু এই কারণে প্রতিশোধ নিয়েছিল যে তারা পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছিল।' ঈমানের পরীক্ষায় তাঁরা সফল হয়েছেন।

ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, ইতিহাসে এ ধরনের একাধিক ঘটনা ঘটেছে, যেমন ইয়েমেনের নাজরানে ঈসা আলাইহিস সালামের অনুসারী ঈমানদারদের জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যার ঘটনা। আয়াতের শিক্ষা সবার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

❖ সূরা বুরূজ, আয়াত ১০–১১

إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُواْ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ لَمۡ يَتُوبُواْ فَلَهُمۡ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمۡ عَذَابُ ٱلۡحَرِيقِ ١٠

[১০] যারা মুমিন পুরুষ ও নারীকে নিপীড়ন করেছে, অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্যে আছে জাহান্নামের শাস্তি, আর আছে দহন যন্ত্রণা

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَهُمۡ جَنَّٰتٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُۚ ذَٰلِكَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡكَبِيرُ ١١

[১১] যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তাদের জন্যে আছে জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হয় নির্ঝরিণীসমূহ। এটাই মহাসাফল্য।

আয়াত ১০–১১: জালিমদের পরিণতি ও মুমিনদের সফলতা

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের নির্যাতন করেছে, অতঃপর তাওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি এবং রয়েছে দহনজ্বালার শাস্তি।' এখানে 'ফাতানূ' অর্থ কষ্ট দেওয়া, পরীক্ষায় ফেলা, আগুনে পোড়ানো। লক্ষ করার বিষয়, আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর তাওবা করেনি'। অর্থাৎ নির্যাতনকারীদের জন্যও তাওবার দরজা খোলা ছিল। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ এই আয়াতের ব্যাপারে বলেছেন, আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা দেখো, তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পুড়িয়ে মেরেছে, আর তিনি তাদের তাওবা ও ক্ষমার দিকে ডাকছেন।

একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। এটাই মহাসাফল্য (আল-ফাওযুল কাবীর)।' যাঁরা

আগুনে পুড়ে মারা গেলেন, বাহ্যিকভাবে তাঁরা পরাজিত। কিন্তু আল্লাহর কাছে তাঁরাই সফল। দুনিয়ার জীবন যত বছরই হোক, ষাট, সত্তর, দুইশো বা হাজার, শেষ পর্যন্ত জাহান্নামের ফয়সালা হলে সেটাই প্রকৃত ব্যর্থতা। আর যিনি ঈমানের জন্য তিরস্কার, ধিক্কার, সামাজিক সংকট ও নানা বিপদ সহ্য করেছেন, কিন্তু আখিরাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি পেয়েছেন, তিনিই প্রকৃত সফল।

❖ সূরা বুরূজ, আয়াত ১২–১৬

إِنَّ بَطۡشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿١٢﴾

[১২] নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।

إِنَّهُۥ هُوَ يُبۡدِئُ وَيُعِيدُ ﴿١٣﴾

[১৩] তিনিই প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন।

وَهُوَ ٱلۡغَفُورُ ٱلۡوَدُودُ ﴿١٤﴾

[১৪] তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়

ذُو ٱلۡعَرۡشِ ٱلۡمَجِيدُ ﴿١٥﴾

[১৫] মহান আরশের অধিকারী।

فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ﴿١٦﴾

[১৬] তিনি যা চান, তাই করেন।

আয়াত ১২–১৬: আল্লাহর পাকড়াও ও তাঁর গুণাবলি

দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আপনার রবের পাকড়াও অত্যন্ত কঠিন।' তিনি যখন ধরবেন, কেউ ছাড়াতে পারবে না। ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনরায় সৃষ্টি করবেন।' যারা মনে করে, মরে মাটিতে মিশে গেলে বেঁচে যাবে, তাদের ধারণা ভুল। এরপর আল্লাহ তাঁর কয়েকটি সুন্দর নাম ও গুণ উল্লেখ করেছেন। তিনি 'আল-গাফূর' (পরম ক্ষমাশীল) এবং 'আল-ওয়াদূদ' (অত্যন্ত প্রেমময়)। তিনি তাঁর বান্দাদের গভীরভাবে ভালোবাসেন। তিনি 'যুল আরশিল মাজীদ' (মহিমান্বিত আরশের অধিপতি)। আর তিনি 'ফাআলুল লিমা ইউরীদ', অর্থাৎ যা চান, তা-ই করেন। তাঁর কাজে বাধা দেওয়ার কেউ নেই।

❖ সূরা বুরূজ, আয়াত ১৭–২২

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡجُنُودِ ﴿١٧﴾

[১৭] আপনার কাছে সৈন্যবাহিনীর ইতিবৃত্ত পৌঁছেছে কি

فِرۡعَوۡنَ وَثَمُودَ ﴿١٨﴾

[১৮] ফেরাউনের এবং সামুদের

بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكۡذِيبٖ ﴿١٩﴾

[১৯] বরং যারা কাফের, তারা মিথ্যারোপে রত আছে।

وَٱللَّهُ مِن وَرَآئِهِم مُّحِيطُۢ ﴿٢٠﴾

[২০] আল্লাহ তাদেরকে চতুর্দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রেখেছেন।

بَلۡ هُوَ قُرۡءَانٞ مَّجِيدٞ ﴿٢١﴾

[২১] বরং এটা মহান কোরআন

فِي لَوۡحٖ مَّحۡفُوظِۭ ﴿٢٢﴾

[২২] লওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ।

আয়াত ১৭–২২: ফিরআউন ও সামূদের ঘটনা, কুরআনের সত্যতা

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনার কাছে কি সৈন্যবাহিনীর খবর এসেছে, ফিরআউন ও সামূদের?' ফিরআউন ও সামূদ জাতি তাদের সময়ে মহাশক্তিশালী ছিল। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করেছেন। এই কথা বলা হচ্ছে মক্কার মুশরিকদের উদ্দেশে, যারা বিলাল ও সুহাইবের মতো সাধারণ মুমিনদের নির্যাতন করছিল। তোমাদের শক্তি কি তাদের চেয়ে বেশি? তারা ধ্বংস হয়ে গেছে, তোমাদেরও একই পরিণতি হতে পারে।

উনবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বরং কাফিররা মিথ্যারোপে লিপ্ত।' এত স্পষ্ট ঘটনা শুনেও তারা অস্বীকার করছে। বিংশ আয়াতে, 'আর আল্লাহ তাদের পেছন থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন।' তারা যা বলুক, যত অস্বীকার করুক, আল্লাহ সবকিছু ঘিরে রেখেছেন।

একবিংশ ও দ্বাবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'বরং এটি মহিমান্বিত কুরআন, সংরক্ষিত ফলকে।' এই সব ঘটনা কোনো বানানো কাহিনি নয়। ফিরআউনের ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোথা থেকে জানলেন? তিনি তো মিশরে যাননি, কোনো কিতাব পড়েননি। সামূদ জাতির ধ্বংসাবশেষ হিজরে আজও মক্কার ব্যবসায়ীরা দেখত। এই ঘটনাগুলো ওহী ছাড়া জানার কোনো উপায় ছিল না।

শিক্ষা ও উপদেশ

- ঈমানের কারণে নির্যাতন নতুন নয়। যুগে যুগে মুমিনরা এই পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁদের ঘটনা আমাদের ধৈর্য ও অবিচলতার প্রেরণা দেয়।

- হকের পথে অবিচল থাকা সফলতা, বাহ্যিক পরাজয় নয়। আখিরাতের সাফল্যই আসল সাফল্য।
- জুলুম করে ঈমান দমানো যায় না। ছেলেটির মৃত্যুর পর বরং ঈমান আরও ছড়িয়ে পড়েছিল।
- মজলুমের দোয়া আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌঁছায়। জুলুমকারীর পরিণতি কঠিন।
- আল্লাহর রহমতের নিদর্শন এই যে, জালিমদেরও তিনি তাওবার সুযোগ দেন।
- আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল ও প্রেমময়, আবার তাঁর পাকড়াও কঠিন। ভয় ও আশা, দুটি মনে রাখতে হবে।
- ইতিহাসের শিক্ষা নিয়ে সতর্ক হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। ফিরআউন ও সামূদের মতো শক্তিশালী জাতিও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পায়নি।

অধ্যায় ৯

সূরা তারিক

الطارق

প্রত্যেক প্রাণের ওপর একজন রক্ষক আছে

কুরআনের ৮৬তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১৭টি

সূরা তারিক কুরআনের ৮৬তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৭। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা তাঁর মহাজাগতিক কুদরতের কিছু নিদর্শন, মানুষের সৃষ্টির সূচনা, বৃষ্টি ও জমিনের চক্র এবং কুরআনের চূড়ান্ত ও অকাট্য হওয়ার কথা আলোচনা করেছেন। শেষে কাফিরদের সতর্ক করা হয়েছে।

❖ সূরা তারিক, আয়াত ১–৩

وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارِقِ ﴿١﴾

[১] শপথ আকাশের এবং রাত্রিতে আগমনকারীর।

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلطَّارِقُ ﴿٢﴾

[২] আপনি জানেন, যে রাত্রিতে আসে সেটা কি

ٱلنَّجۡمُ ٱلثَّاقِبُ ﴿٣﴾

[৩] সেটা এক উজ্জ্বল নক্ষত্র।

আয়াত ১–৩: আসমান ও ‘তারিক’-এর শপথ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘শপথ আসমানের এবং তারিকের।’ ‘তারিক’ শব্দের মূল অর্থ কড়া নাড়া বা আঘাত করা। আরবিতে রাতে যে আগন্তুক এসে দরজায় কড়া নাড়ে, তাকেও ‘তারিক’ বলা হয়। তাই রাতে যা আসে বা দেখা দেয়, তা-ই ‘তারিক’।

আল্লাহ তাআলা নিজেই পরের আয়াতে ‘তারিক’-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। দ্বিতীয় আয়াতে প্রশ্ন, ‘আপনি কি জানেন তারিক কী?’ তৃতীয় আয়াতে উত্তর, ‘এটি উজ্জ্বল তারকা (আন-নাজমুস সাকিব)।’ ‘সাকিব’ অর্থ ভেদকারী। সেই তারকা, যার আলো অন্ধকারকে ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ে। কোনো কোনো মুফাসসির এখানে সুরাইয়া (কৃত্তিকা) তারকাপুঞ্জের কথা বলেছেন। আবার অনেকে বলেছেন, রাতের আকাশে যেকোনো উজ্জ্বল তারকাই উদ্দেশ্য। আল্লাহ তাআলা আসমান ও এই উজ্জ্বল তারকার শপথ করে যা বলতে চাইছেন, তা পরের আয়াতে আছে।

❖ সূরা তারিক, আয়াত ৪

إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ﴿٤﴾

[৪] প্রত্যেকের উপর একজন তত্ত্বাবধায়ক রয়েছে।

আয়াত ৪: প্রত্যেক প্রাণের ওপর একজন রক্ষক

চতুর্থ আয়াতে শপথের জবাব, 'প্রত্যেক প্রাণের ওপরই একজন তত্ত্বাবধায়ক (হাফিয) রয়েছে।' এই আয়াতে দুটি কিরাআত আছে। একটিতে 'লাম্মা' (তাশদীদসহ), অন্যটিতে 'লামা' (তাশদীদ ছাড়া)। দুই কিরাআতেই অর্থ একই। আরবি ব্যাকরণে 'ইন' (না) এবং 'ইল্লা' (ছাড়া) একত্র হলে ইতিবাচক অর্থ দাঁড়ায়, যেমন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে অর্থ হয় 'একমাত্র আল্লাহই ইলাহ।' তেমনি এখানেও অর্থ, প্রত্যেক প্রাণের ওপর অবশ্যই একজন রক্ষক নিযুক্ত আছে।

এই 'হাফিয' (রক্ষক) কারা? সূরা ইনফিতারে আমরা পড়েছি, 'তোমাদের ওপর রয়েছে সংরক্ষণকারী, সম্মানিত লিপিকাররা' (৮২:১০–১১)। তাঁরা আমাদের আমল লিপিবদ্ধ করেন। তবে মুফাসসিরগণ বলেন, আল্লাহ মানুষের সঙ্গে শুধু আমল লেখার জন্যই ফেরেশতা নিযুক্ত করেননি। আরও এমন ফেরেশতা আছেন, যাঁরা আল্লাহর নির্দেশে আমাদের আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা করেন। সূরা রা'দে বলা হয়েছে, 'মানুষের জন্য তার সামনে ও পেছনে একের পর এক আগমনকারী প্রহরী রয়েছে, যারা আল্লাহর আদেশে তাকে হেফাজত করে' (১৩:১১)।

আমরা অনেক সময় দেখি, রাস্তায় হাঁটছি, হঠাৎ কয়েক ইঞ্চি পাশ দিয়ে দ্রুত গাড়ি চলে গেল, আরেকটু হলে দুর্ঘটনা ঘটত। আমরা ভাবি, হয়তো এমনিতেই বেঁচে গেছি। আসলে আল্লাহর নির্দেশে ফেরেশতারা আমাদের রক্ষা করেছেন। আবার কখনো আল্লাহ যখন কারও জন্য কোনো বিপদ নির্ধারণ করে দেন, তখন সেই রক্ষক আর বাধা দেন না। প্রত্যেকের জন্য আল্লাহ যা ফয়সালা করেছেন, তা বাস্তবায়নের জন্য ফেরেশতারা নিযুক্ত। আমাদের কাজ হলো সাবধানতা অবলম্বন করা এবং ফলাফলের জন্য আল্লাহর ওপর ভরসা করা।

❖ সূরা তারিক, আয়াত ৫–৮

فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ مِمَّ خُلِقَ ﴿٥﴾

[৫] অতএব, মানুষের দেখা উচিত কি বস্তু থেকে সে সৃজিত হয়েছে।

خُلِقَ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ ﴿٦﴾

[৬] সে সৃজিত হয়েছে সবেগে স্খলিত পানি থেকে।

يَخْرُجُ مِنۢ بَيْنِ ٱلصُّلْبِ وَٱلتَّرَآئِبِ ﴿٧﴾

[৭] এটা নির্গত হয় মেরুদন্ড ও বক্ষপাজরের মধ্য থেকে।

إِنَّهُۥ عَلَىٰ رَجۡعِهِۦ لَقَادِرٞ ٨

[৮] নিশ্চয় তিনি তাকে ফিরিয়ে নিতে সক্ষম।

আয়াত ৫–৮: মানুষের সৃষ্টির সূচনা ও পুনরুত্থানের সক্ষমতা

পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'সুতরাং মানুষ যেন লক্ষ করে, তাকে কী থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে।' এখানে লক্ষ করা মানে শুধু চর্মচক্ষু দিয়ে দেখা নয়, অন্তর দিয়ে ভাবা। ষষ্ঠ আয়াতে উত্তর, 'তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত পানি থেকে।' 'মা'ইন দাফিক' অর্থ প্রবল বেগে নির্গত পানি। সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যা নির্গত হয় মেরুদণ্ড (সুলব) ও বক্ষপঞ্জরের (তারাইব) মধ্য থেকে।'

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের একাধিক মত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ থেকে বর্ণিত, 'সুলব' অর্থ পুরুষের মেরুদণ্ড এবং 'তারাইব' অর্থ নারীর বক্ষের হাড় (বুকের পাঁজর)। কেউ কেউ বলেছেন, এতে মানুষের পুরো শরীরের সারাংশ থেকে বীর্য তৈরি হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও আলোচিত হয় যে প্রজনন অঙ্গের ভ্রূণীয় বিকাশ হয় পিঠের দিকে, কিডনির কাছাকাছি অঞ্চলে। তবে এই ব্যাখ্যাকে আয়াতের নিশ্চিত অর্থ হিসেবে চাপানো ঠিক নয়। আয়াতের মূল শিক্ষা হলো, তুচ্ছ এক ফোঁটা পানি থেকে মানুষের সৃষ্টি, আর সেই পানি যিনি দেহের অভ্যন্তর থেকে বের করেন এবং যা থেকে জীবন সৃষ্টি করেন, তাঁর কুদরত অপরিসীম।

অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তিনি তাকে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম।' যিনি তুচ্ছ এক ফোঁটা পানি থেকে এই বিস্ময়কর মানুষ গড়েছেন, তিনি মৃত্যুর পর মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া সেই মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম। যখন আমরা কিছুই ছিলাম না, তখনই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন। এখন তো আমাদের একটি দৃষ্টান্ত সামনে আছে।

❖ সূরা তারিক, আয়াত ৯–১০

يَوۡمَ تُبۡلَى ٱلسَّرَآئِرُ ٩

[৯] যেদিন গোপন বিষয়াদি পরীক্ষিত হবে

فَمَا لَهُۥ مِن قُوَّةٖ وَلَا نَاصِرٖ ١٠

[১০] সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না।

আয়াত ৯–১০: গোপন রহস্য প্রকাশের দিন

নবম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যেদিন গোপন বিষয়গুলো পরীক্ষা করা হবে।' 'তুবলা' অর্থ যাচাই করা, প্রকাশ করা। 'সারাইর' অর্থ অন্তরের গোপন বিষয়, নিয়ত, ইচ্ছা, গোপনে করা কাজ। আজ

মানুষ যা গোপন রাখে, কেউ জানে না, কিয়ামতের দিন তা সবার সামনে প্রকাশিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি পতাকা গাড়া হবে এবং বলা হবে, এটি অমুকের বিশ্বাসঘাতকতা (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

এখানে আল্লাহর রহমতের একটি দিকও আছে। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন মুমিন বান্দাকে নিজের নিকটবর্তী করে তার গুনাহের কথা স্বীকার করাবেন, তারপর বলবেন, আমি দুনিয়ায় তোমার এই গুনাহ ঢেকে রেখেছিলাম, আজ আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। অর্থাৎ যাকে ক্ষমা করার, তার গুনাহ আল্লাহ অন্যের সামনে প্রকাশ করবেন না। কিন্তু যারা গুনাহে অনুতপ্ত হয়নি, তাদের জন্য সেদিন গোপন কিছুই থাকবে না।

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'তখন তার না থাকবে কোনো শক্তি, না কোনো সাহায্যকারী।' আজ আমরা নিজের অপরাধ প্রকাশ পেয়ে গেলে ক্ষমতা, টাকা বা কৌশল দিয়ে ঢাকতে চেষ্টা করি। কিন্তু সেদিন অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। হাত-পা সাক্ষী দেবে। ফেরেশতারা লিখিত রেকর্ড দেখাবেন। যে জমিনে অপরাধ করা হয়েছে, সেই জমিন সাক্ষ্য দেবে (সূরা যিলযাল ৯৯:৪)। আর আল্লাহ তো নিজেই সবকিছুর সাক্ষী।

আজকের প্রযুক্তির যুগে আমরা দেখি, সিসি ক্যামেরা, স্যাটেলাইট ও নানা যন্ত্র মানুষের কাজ রেকর্ড করছে। এসব থেকে আমরা অন্তত কিছুটা বুঝতে পারি, আমাদের কোনো কাজই হারিয়ে যায় না। রাতের অন্ধকারে কেউ দেখেনি ভেবে যে সিজদা বা যে গুনাহ করেছি, সবই রেকর্ড হচ্ছে। কেউ বাহবা না দিলেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা ছোট ভালো আমলও সেদিন প্রকাশিত হবে। কণা পরিমাণ ভালো কাজও মানুষ দেখতে পাবে, কণা পরিমাণ মন্দ কাজও (সূরা যিলযাল ৯৯:৭–৮)।

❖ সূরা তারিক, আয়াত ১১–১৪

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلرَّجۡعِ ﴿١١﴾

[১১] শপথ চক্রশীল আকাশের

وَٱلۡأَرۡضِ ذَاتِ ٱلصَّدۡعِ ﴿١٢﴾

[১২] এবং বিদারনশীল পৃথিবীর

إِنَّهُۥ لَقَوۡلٞ فَصۡلٞ ﴿١٣﴾

[১৩] নিশ্চয় কোরআন সত্য-মিথ্যার ফয়সালা।

وَمَا هُوَ بِٱلْهَزْلِ ﴿١٤﴾

[১৪] এবং এটা উপহাস নয়।

আয়াত ১১–১৪: বৃষ্টি, জমিন ও কুরআনের চূড়ান্ত বাণী

একাদশ ও দ্বাদশ আয়াতে আল্লাহ আরও দুটি শপথ করেছেন। 'শপথ বারবার বৃষ্টি বর্ষণকারী আসমানের' এবং 'শপথ বিদীর্ণ হওয়া জমিনের।' 'রাজ' অর্থ ফিরে আসা। আসমান বারবার একই চক্রে বৃষ্টি ফিরিয়ে আনে। আর জমিন ফেটে উদ্ভিদ ও ফসলের অঙ্কুর বের করে। এই শপথের উদ্দেশ্য হলো, যিনি এভাবে বারবার মৃত জমিনকে প্রাণ দেন, তিনি মৃত মানুষকেও জীবিত করবেন।

ত্রয়োদশ আয়াতে এই শপথগুলোর জবাব, 'নিশ্চয়ই এ (কুরআন) এক চূড়ান্ত বাণী (কাওলুন ফাসল)।' 'ফাসল' অর্থ যা সত্য-মিথ্যাকে আলাদা করে দেয়, যা চূড়ান্ত ফয়সালা। আমরা যেমন 'ফয়সালা' বলি, সেই একই ধাতু। কুরআনের পরে আর কোনো দ্বিতীয় বিকল্প নেই। চতুর্দশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এটি কোনো ঠাট্টা-কৌতুক নয়।' 'হাযল' অর্থ হালকা, অগম্ভীর কথা। কুরআনের প্রতিটি কথা গুরুত্বপূর্ণ ও অকাট্য। এতে সংযোজন-বিয়োজনের কোনো সুযোগ নেই।

❖ **সূরা তারিক, আয়াত ১৫–১৭**

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿١٥﴾

[১৫] তারা ভীষণ চক্রান্ত করে

وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴿١٦﴾

[১৬] আর আমিও কৌশল করি।

فَمَهِّلِ ٱلْكَٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ﴿١٧﴾

[১৭] অতএব, কাফেরদেরকে অবকাশ দিন, তাদেরকে অবকাশ দিন, কিছু দিনের জন্যে।

আয়াত ১৫–১৭: ষড়যন্ত্রকারীদের জন্য আল্লাহর 'কৌশল'

পঞ্চদশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'নিশ্চয়ই তারা ভীষণ ষড়যন্ত্র করছে।' ষোড়শ আয়াতে, 'আর আমিও কৌশল করছি।' সপ্তদশ আয়াতে, 'সুতরাং কাফিরদের অবকাশ দিন, তাদের কিছুকাল অবকাশ দিন।'

মক্কার মুশরিকরা ইসলাম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে নানা কৌশল করেছিল। তারা দুর্বল মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করত। শি'বে আবু তালিবে তিন বছর সামাজিক ও অর্থনৈতিক বয়কটের মধ্যে তাঁকে ও তাঁর পরিবারকে রেখেছিল। তাঁকে পাগল,

জাদুকর বলে অপবাদ দিত। পরে দারুন নাদওয়ায় পরামর্শ করে সব গোত্র মিলে তাঁকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, যাতে বনু হাশিম একা প্রতিশোধ নিতে না পারে। কিন্তু আল্লাহ তাঁকে নিরাপদে হিজরত করালেন।

আল্লাহর 'কৌশল' অর্থ তাঁর অজেয় পরিকল্পনা, যা জালিমদের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে এবং তাদের নিজেদের ওপরই চাপিয়ে দেয়। এটি আল্লাহর শানের উপযোগী, মানুষের মতো প্রতারণা নয়। তিনি বদরে মাত্র তিনশো তেরো জন মুসলমানকে দিয়ে এক হাজার সৈন্যের বাহিনীকে পরাজিত করেছেন। খন্দকের যুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে। মক্কা বিজয়ের সময় যারা তাঁকে বের করে দিয়েছিল, তারাই তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ বলছেন, 'আপনি তাদের সামান্য অবকাশ দিন।' তাদের জন্য আমি যে ব্যবস্থা করেছি, তার প্রকাশ আপনি অচিরেই দেখতে পাবেন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আল্লাহর নিযুক্ত ফেরেশতা আছেন। তাঁরা আমল লেখেন এবং আকস্মিক বিপদ থেকে রক্ষা করেন।
- মানুষের সৃষ্টি এক ফোঁটা তুচ্ছ পানি থেকে। এই ভাবনা অহংকার দূর করে এবং পুনরুত্থানে বিশ্বাস দৃঢ় করে।
- কিয়ামতের দিন সব গোপন বিষয় প্রকাশ পাবে। ক্ষমতা বা কৌশল দিয়ে সেদিন কিছু ঢাকা যাবে না।
- গোপনে করা ছোট ভালো কাজও আল্লাহর কাছে নষ্ট হয় না। ইখলাসের সঙ্গে করা আমলের প্রতিদান সেদিন প্রকাশ পাবে।
- আল্লাহ তাআলা মুমিনের গুনাহ গোপন রাখেন। আমাদেরও উচিত অন্যের দোষ গোপন রাখা।
- কুরআন চূড়ান্ত ও গুরুত্বপূর্ণ বাণী। এর সঙ্গে ঠাট্টা বা অবহেলা করার সুযোগ নেই।
- জালিমদের ষড়যন্ত্র আল্লাহর পরিকল্পনার সামনে টিকে না। তাদের অবকাশ দেওয়া হয়, কিন্তু ছাড় দেওয়া হয় না।

অধ্যায় ১০

সূরা আ'লা

الأعلى

যে আত্মশুদ্ধি করল, সে-ই সফল

কুরআনের ৮৭তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১৯টি

সূরা আ'লা কুরআনের ৮৭তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৯। এই সূরাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। তিনি বিতর নামাযে প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা পড়তেন (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী)। জুমার নামাযে এবং ঈদের নামাযেও তিনি সূরা আ'লা ও সূরা গাশিয়া তিলাওয়াত করতেন। নুমান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, জুমা ও ঈদ একই দিনে হলে তিনি উভয় নামাযেই এই দুটি সূরা পাঠ করতেন (সহীহ মুসলিম)।

❖ সূরা আ'লা, আয়াত ১

سَبِّحِ ٱسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴿١﴾

[১] আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন

আয়াত ১: 'আপনার মহান রবের নামের পবিত্রতা ঘোষণা করুন'

প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা'। 'সাব্বিহ' ও 'সুবহান' শব্দ একই ধাতু থেকে এসেছে, যার মূল অর্থ সাঁতার কাটা। সাঁতারু যেমন পানির ওপর ভেসে থাকে, তেমনি যে আল্লাহর 'তাসবীহ' করে, সে আল্লাহকে সব ধরনের ত্রুটি, অপূর্ণতা ও কলুষতার উর্ধ্বে মনে করে ঘোষণা দেয়।

কুরআনের যে সূরাগুলো তাসবীহের শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে, যেমন সূরা হাদীদ, হাশর, সাফ, জুমুআ ও তাগাবুন, সেগুলোকে একত্রে 'মুসাব্বিহাত' বলা হয়। তবে অন্য সূরাগুলোতে অতীত বা বর্তমান ক্রিয়া (সাব্বাহা, ইউসাব্বিহু) ব্যবহার হয়েছে, আর এই সূরায় সরাসরি আদেশ এসেছে, 'সাব্বিহ', তুমি পবিত্রতা ঘোষণা করো। উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, 'ফাসাব্বিহ বিসমি রব্বিকাল আযীম' (সূরা ওয়াকিয়া ৫৬:৭৪) নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটি তোমরা রুকুতে পড়ো। আর যখন 'সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা' নাযিল হলো, তিনি বললেন, এটি তোমরা সিজদায় পড়ো (সুনানে আবু দাউদ,

সুনানে ইবনে মাজাহ)। এই কারণেই আমরা রুকুতে 'সুবহানা রব্বিয়াল আযীম' এবং সিজদায় 'সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা' পড়ি।

এখানে বলা হয়েছে আল্লাহর 'নামের' পবিত্রতা ঘোষণা করতে। এটি আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রকাশের এক সুন্দর রীতি। তাঁর নামের তাসবীহের একটি দিক হলো, তাঁর নাম ও গুণ বুঝে সেগুলোকে সর্বোচ্চ মর্যাদার বলে মানা। যেমন আল্লাহ 'সামী' (সর্বশ্রোতা) ও 'বাসীর' (সর্বদ্রষ্টা)। আমরাও শুনি ও দেখি, কিন্তু আমাদের শোনা ও দেখা সীমাবদ্ধ, যন্ত্রনির্ভর ও অক্ষমতাযুক্ত। আল্লাহর শ্রবণ ও দর্শন নিখুঁত, সীমাহীন, তাঁর কোনো অঙ্গ বা যন্ত্র লাগে না। কাজেই কোনো সৃষ্টির সঙ্গে তাঁর তুলনা করা যায় না।

আরেকটি দিক হলো, আল্লাহর নামকে এমন জায়গায় ব্যবহার না করা, যেখানে তিনি অপছন্দ করেন। কেউ 'বিসমিল্লাহ' বলে নেশা করে, কেউ 'পরম করুণাময়ের নামে শুরু করছি' বলে অশ্লীল অনুষ্ঠান বা সিনেমা চালু করে। এতে আল্লাহর নামের সম্মান রক্ষা হয় না। সুদের লেনদেনের ক্ষেত্রেও এই প্রশ্ন আসে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুদখোর, সুদদাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষী সবাইকে অভিশাপ দিয়েছেন (সহীহ মুসলিম)। আল্লাহ সুদ বর্জন না করলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণার কথা বলেছেন (সূরা বাকারা ২:২৭৯)। তাই যে কাজের মূলে সুদি লেনদেন প্রচার, লিপিবদ্ধ করা বা সাক্ষী হওয়া, সেখানে জড়িত থাকা গুরুতর গুনাহ। কেউ বলতে পারেন, আমি তো আট ঘন্টা ডিউটি করে বেতন পাই। কিন্তু যে কাজটিই আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তার বেতনও পবিত্র থাকে না। এমন অবস্থায় হালাল বিকল্প খোঁজা ও নির্ভরযোগ্য আলেমের কাছে পরামর্শ নেওয়া উচিত।

❖ সূরা আ'লা, আয়াত ২–৫

ٱلَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾

[২] যিনি সৃষ্টি করেছেন ও সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَٱلَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾

[৩] এবং যিনি সুপরিমিত করেছেন ও পথ প্রদর্শন করেছেন

وَٱلَّذِيٓ أَخۡرَجَ ٱلۡمَرۡعَىٰ ﴿٤﴾

[৪] এবং যিনি তৃণাদি উৎপন্ন করেছেন

فَجَعَلَهُۥ غُثَآءً أَحۡوَىٰ ﴿٥﴾

[৫] অতঃপর করেছেন তাকে কাল আবর্জনা।

আয়াত ২–৫: সৃষ্টি, পরিমাপ, পথনির্দেশ ও উদ্ভিদের জীবনচক্র

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুবিন্যস্ত করেছেন।' মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট-বড় ও সুসামঞ্জস্য করে তিনি তৈরি করেছেন। তৃতীয় আয়াতে, 'আর যিনি পরিমিত করেছেন, অতঃপর পথ দেখিয়েছেন।' এই পথনির্দেশ শুধু মানুষের জন্য নয়, সব সৃষ্টির জন্য। গরুর বাছুর জন্ম নিয়েই বুঝে যায়, তার খাবার মায়ের ওলানে। মানবশিশু জন্মের পরই দুধ পান করতে শেখে। মুরগির ছানা ডিম থেকে বেরিয়েই খাবার খুঁটতে শুরু করে। এই সহজাত জ্ঞান আল্লাহরই দান। ফিরআউন যখন মূসা আলাইহিস সালামকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমাদের রব কে?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমাদের রব তিনিই, যিনি প্রত্যেক বস্তুকে তার আকৃতি দিয়েছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন' (সূরা ত্বহা ২০:৫০)।

চতুর্থ ও পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর যিনি তৃণ-উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন, অতঃপর তাকে করেছেন কালচে খড়কুটো।' এই আয়াতে পুনরুত্থানের বার্তা আছে। একটি ঘাস ছিল না, আল্লাহ তাকে সবুজ করে গজালেন, সে বড় হলো, একসময় শুকিয়ে কালচে হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে গেল। মানুষের জীবনও তেমন। একসময় আমরা ছিলাম না, আল্লাহ সৃষ্টি করলেন, যৌবনের শক্তি এল, বার্ধক্য এল, তারপর মৃত্যু। যিনি এভাবে অস্তিত্বে আনেন, তিনি আবার জীবিত করতেও সক্ষম।

❖ সূরা আ'লা, আয়াত ৬–৮

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَىٰٓ ﴿٦﴾

[৬] আমি আপনাকে পাঠ করাতে থাকব, ফলে আপনি বিস্মৃত হবেন না

إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾

[৭] আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। নিশ্চয় তিনি জানেন প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾

[৮] আমি আপনার জন্যে সহজ শরীয়ত সহজতর করে দেবো।

আয়াত ৬–৮: কুরআন সংরক্ষণের দায়িত্ব ও সহজ শরীয়ত

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আমি আপনাকে পাঠ করাব, ফলে আপনি ভুলবেন না।' সপ্তম আয়াতে আছে, 'তবে আল্লাহ যা চান, তা ছাড়া।' এর পটভূমি আছে। জিবরীল আলাইহিস সালাম ওহী নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুলে যাওয়ার আশঙ্কায় দ্রুত তিলাওয়াত করতেন, জিহ্বা নাড়াতেন। আল্লাহ সূরা কিয়ামাহতে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন,

তা আপনার অন্তরে সংরক্ষণ এবং পাঠ করানো আমার দায়িত্ব (৭৫:১৬–১৯)। সূরা আ'লাতেও সেই আশ্বাস পুনরায় এসেছে।

'তবে আল্লাহ যা চান' কথার ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের কয়েকটি মত আছে। এক, এটি আল্লাহর পূর্ণ ক্ষমতার প্রকাশ। তিনি চাইলে ভুলিয়ে দিতে পারেন, তবে বাস্তবে তিনি ভোলাননি। দুই, এখানে রহিত (মানসূখ) আয়াতের কথা বলা হয়েছে। কোনো আয়াতের বিধান রহিত করে আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম বা সমপর্যায়ের বিধান দেন। সূরা বাকারায় বলা হয়েছে, আমি কোনো আয়াত রহিত করলে বা ভুলিয়ে দিলে তার চেয়ে উত্তম বা তার সমতুল্য কিছু আনি (২:১০৬)। মদের বিধানের ধারাবাহিক পরিবর্তন এর উদাহরণ। প্রথমে মদ নিয়ে সাধারণ মন্তব্য, তারপর নামাযের সময় নিষেধ, শেষে সম্পূর্ণ হারাম। তিন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাময়িকভাবে কোনো আয়াত ভুলে গেলেও পরে তা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার একজনকে সূরা পাঠ করতে শুনে তিনি বললেন, আল্লাহ তাকে রহম করুন, সে আমাকে অমুক সূরার অমুক আয়াত স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যা আমি ভুলে গিয়েছিলাম (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

সপ্তম আয়াতের শেষে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তিনি জানেন যা প্রকাশ্য এবং যা গোপন।' আর অষ্টম আয়াতে, 'আর আমি আপনাকে সহজতম পথের (ইউসরা) জন্য সহজ করে দেব।' এই 'ইউসরা' বা সহজ পথ হলো শরীয়তের পথ, আবার জান্নাতের পথও। ইসলামের বিধান আসলেই সহজ। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান, কঠিন চান না (সূরা বাকারা ২:১৮৫)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দ্বীন সহজ (সহীহ বুখারী)। দাঁড়িয়ে নামায পড়তে না পারলে বসে পড়ো, বসে না পারলে কাত হয়ে পড়ো (সহীহ বুখারী)। তবে এর অর্থ এ নয় যে নিজের ইচ্ছামতো যেকোনো ছাড় নেওয়া যাবে। কতটুকু অসুস্থতায় বসে নামায পড়া যাবে, কীভাবে পড়া যাবে, সেটি নির্ধারণের জন্য শরীয়তের মানদণ্ড আছে। সর্দি-কাশি হয়েছে বলে বসে পড়ার সুযোগ নেই। সিদ্ধান্তের জন্য নির্ভরযোগ্য আলেম ও অভিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

❖ সূরা আ'লা, আয়াত ৯–১৩

فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾

[৯] উপদেশ ফলপ্রসূ হলে উপদেশ দান করুন

سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ ﴿١٠﴾

[১০] যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْقَى ﴿١١﴾

[১১] আর যে, হতভাগা, সে তা উপেক্ষা করবে

ٱلَّذِي يَصۡلَى ٱلنَّارَ ٱلۡكُبۡرَىٰ ﴿١٢﴾

[১২] সে মহা-অগ্নিতে প্রবেশ করবে।

ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحۡيَىٰ ﴿١٣﴾

[১৩] অতঃপর সেখানে সে মরবেও না, জীবিতও থাকবে না।

আয়াত ৯–১৩: উপদেশ, তার গ্রহণকারী ও প্রত্যাখ্যানকারী

নবম আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং আপনি উপদেশ দিন, যদি উপদেশ উপকারী হয়।' এখানে 'ইন' শব্দটির দুটি অর্থ সম্ভব। যদি শর্তসূচক হয়, তাহলে অর্থ দাঁড়ায়, যতক্ষণ উপদেশ কাজে লাগার সম্ভাবনা আছে, ততক্ষণ উপদেশ দিন। আর যদি নিশ্চয়তা অর্থে আসে, তাহলে অর্থ হবে, আপনি উপদেশ দিন, নিশ্চয়ই উপদেশ উপকারী। উভয় অর্থ ধরার সুযোগ আছে।

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করবে।' আল্লাহকে ভয় করে এবং তাঁর সামনে দাঁড়ানোর কথা মনে রাখে, সে-ই উপদেশে কান দেয়। আর একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর হতভাগা তা এড়িয়ে চলবে।' দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে-ই প্রবেশ করবে মহা আগুনে।' ত্রয়োদশ আয়াতে, 'সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না।' অর্থাৎ সে জীবিতও থাকবে, কিন্তু সেই জীবন হবে যন্ত্রণাময়। মৃত্যু তাকে কোনো মুক্তি দেবে না, কারণ কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে জবাই করে দেওয়া হবে, আর কখনো মৃত্যু আসবে না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

❖ সূরা আ'লা, আয়াত ১৪–১৭

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾

[১৪] নিশ্চয় সাফল্য লাভ করবে সে, যে শুদ্ধ হয়

وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَبِّهِۦ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾

[১৫] এবং তার পালনকর্তার নাম স্মরণ করে, অতঃপর নামায আদায় করে।

بَلۡ تُؤۡثِرُونَ ٱلۡحَيَوٰةَ ٱلدُّنۡيَا ﴿١٦﴾

[১৬] বস্তুতঃ তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দাও

وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيۡرٞ وَأَبۡقَىٰٓ ﴿١٧﴾

[১৭] অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।

আয়াত ১৪–১৭: সফলতার তিন শর্ত

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অবশ্যই সফল হবে সে, যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল এবং তার রবের নাম স্মরণ করল, অতঃপর নামায পড়ল।' এখানে সফলতার তিনটি উপাদান: আত্মশুদ্ধি (তাযকিয়া), আল্লাহর যিকির এবং নামায। 'তাযাক্কা' অর্থ নিজেকে পরিশুদ্ধ করা, শিরক, গুনাহ, মন্দ চরিত্র ও হারাম আচরণ থেকে নিজেকে পবিত্র করা। কোনো কোনো তাফসীরে এ-ও এসেছে, এখানে সদকাতুল ফিতর আদায় (তাযাক্কা), ঈদের তাকবীর (যিকরু ইসমি রব্বিহী) এবং ঈদের নামায (ফাসাল্লা) বোঝানো হয়েছে। সূরাটি ঈদের নামাযে পড়ার তাৎপর্য এখানেও পাওয়া যায়। তবে আয়াতের অর্থ ব্যাপক।

ষোড়শ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দাও।' সপ্তদশ আয়াতে, 'অথচ আখিরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী।' দুনিয়ার সফলতা বাহ্যিকভাবে যত বড়ই হোক, তা ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতের সফলতাই প্রকৃত ও চিরস্থায়ী। আমরা জেনে-বুঝেও দুনিয়াকে বেশি প্রাধান্য দিই, এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি।

❖ সূরা আ'লা, আয়াত ১৮–১৯

إِنَّ هَٰذَا لَفِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿١٨﴾

[১৮] এটা লিখিত রয়েছে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে

صُحُفِ إِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴿١٩﴾

[১৯] ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবসমূহে।

আয়াত ১৮–১৯: পূর্ববর্তী সহীফায়ও এই বার্তা ছিল

শেষ দুই আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'নিশ্চয়ই এটি পূর্ববর্তী সহীফাসমূহে ছিল, ইবরাহীম ও মূসার সহীফায়।' আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা, যিকর, আখিরাতকে প্রাধান্য দেওয়া, এই শিক্ষাগুলো নতুন নয়। সব নবীর কাছে তাওহীদ ও আল্লাহর প্রশংসার একই মূল বার্তা এসেছে।

বিশেষভাবে ইবরাহীম ও মূসা আলাইহিমাস সালামের নাম নেওয়ার কারণ আছে। মক্কার মুশরিকরা ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে সম্মান করত। ইয়াহূদীরা বলত, তিনি ইয়াহূদী ছিলেন। খ্রিস্টানরা বলত, তিনি খ্রিস্টান ছিলেন। আল্লাহ জবাব দিয়েছেন, ইবরাহীম ইয়াহূদীও ছিলেন না, খ্রিস্টানও ছিলেন না, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম (সূরা আলে ইমরান ৩:৬৭)। আর মূসা আলাইহিস সালামকে ইয়াহূদীরা নিজেদের নবী মানত। তাই তাদের উদ্দেশে আল্লাহ বলছেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলছেন, তা তো নতুন কিছু নয়। ইবরাহীম ও মূসাও একই কথা বলেছেন। তাহলে গ্রহণ করতে তোমাদের সমস্যা কোথায়?

শিক্ষা ও উপদেশ

- আল্লাহর নামের পবিত্রতা ঘোষণা মানে তাঁর নাম ও গুণকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় রাখা এবং গুনাহের কাজে তাঁর নামকে ব্যবহার না করা।
- মানুষসহ সব সৃষ্টির জন্য আল্লাহ জীবন ধারণের পথনির্দেশ রেখেছেন। এই সহজাত জ্ঞান তাঁরই দান।
- ঘাসের জীবনচক্র আমাদের জীবনের বাস্তবতা ও পুনরুত্থানের ইঙ্গিত।
- আল্লাহ কুরআনের সংরক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন, তাই এর হেফাজত নিশ্চিত।
- শরীয়ত সহজ, তবে সহজতার নামে ইচ্ছামতো ছাড় নেওয়া যায় না। শরীয়তের মানদণ্ড মেনে নির্ভরযোগ্য আলেমের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- উপদেশ সে-ই গ্রহণ করে, যার অন্তরে আল্লাহর ভয় আছে।
- সফলতার তিন চাবিকাঠি: আত্মশুদ্ধি, আল্লাহর যিকির ও নামায।
- দুনিয়ার সফলতা ক্ষণস্থায়ী, আখিরাতের সফলতাই চিরস্থায়ী। দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া ঠিক নয়।

অধ্যায় ১১

সূরা গাশিয়াহ

الغاشية

উটের দিকে কি তারা তাকায় না?

কুরআনের ৮৮তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ২৬টি

সূরা গাশিয়াহ কুরআনের ৮৮তম সূরা। এটি মক্কা জীবনের প্রথম দিকে অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২৬। মাক্কী সূরার সাধারণ বিষয়বস্তু কিয়ামত, আখিরাত, বিচার ও পুনরুত্থান, আর এর পাশাপাশি এই সূরায় আল্লাহর কুদরতের কিছু বিস্ময়কর নিদর্শনও আলোচিত হয়েছে।

কুরআনের সূরাগুলো বিভিন্ন ভঙ্গিতে শুরু হয়েছে। কোনোটি 'আলহামদুলিল্লাহ' দিয়ে, যেগুলোকে বলা হয় হামদের সূরা। কোনোটি তাসবীহ দিয়ে, যেগুলোকে বলা হয় মুসাব্বিহাত। কোনোটি শপথ দিয়ে, কোনোটি 'আলিফ লাম মীম'-এর মতো হরফে মুকাত্তাআত দিয়ে। আবার কোনোটি প্রশ্ন দিয়ে। প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলে শ্রোতার মনে কৌতূহল জাগে, মনোযোগ তৈরি হয়। এই সূরাও প্রশ্ন দিয়ে শুরু হয়েছে।

সূরা আ'লার সঙ্গে এর একটি ধারাবাহিক সম্পর্ক আছে। সূরা আ'লায় কিয়ামতের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এই কথা নতুন নয়, পূর্ববর্তী নবীদের সহীফাতেও ছিল। এত যুক্তি ও সতর্কবার্তার পরও যারা কিয়ামতকে মানছে না, আল্লাহ তাআলা এই সূরায় আবার তাদের সতর্ক করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমা ও ঈদের নামাযে সূরা আ'লার সঙ্গে এই সূরাও পড়তেন।

❖ সূরা গাশিয়াহ, আয়াত ১–৭

هَلۡ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلۡغَٰشِيَةِ ١

[১] আপনার কাছে আচ্ছন্নকারী কেয়ামতের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে কি

وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٍ خَٰشِعَةٌ ٢

[২] অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে লাঞ্ছিত

عَامِلَةٞ نَّاصِبَةٞ ٣

[৩] ক্লিষ্ট, ক্লান্ত।

تَصۡلَىٰ نَارًا حَامِيَةً ٤

[৪] তারা জ্বলন্ত আগুনে পতিত হবে।

تُسۡقَىٰ مِنۡ عَيۡنٍ ءَانِيَةٖ ٥

[৫] তাদেরকে ফুটন্ত নহর থেকে পান করানো হবে।

لَّيۡسَ لَهُمۡ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٖ ٦

[৬] কন্টকপূর্ণ ঝাড় ব্যতীত তাদের জন্যে কোন খাদ্য নেই।

لَّا يُسۡمِنُ وَلَا يُغۡنِي مِن جُوعٖ ٧

[৭] এটা তাদেরকে পুষ্ট করবে না এবং ক্ষুধায়ও উপকার করবে না।

আয়াত ১–৭: জাহান্নামীদের চেহারা ও খাদ্য

প্রথম আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনার কাছে কি আচ্ছন্নকারী (গাশিয়াহ)-র সংবাদ এসেছে?' 'গাশিয়াহ' অর্থ যা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিয়ামতের ভয়াবহতা সবাইকে ঢেকে ফেলবে, তাই কিয়ামতকে 'গাশিয়াহ' বলা হয়েছে। এই সংবাদ অবশ্যই পৌঁছেছে। প্রশ্নটি করা হয়েছে মনোযোগ আকর্ষণের জন্য।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন কিছু চেহারা হবে অবনত (খাশিআ)।' 'খুশূ' অর্থ ভয় ও বিনয়ে নত হওয়া। আমরা নামাযে 'খুশূ'-এর সঙ্গে দাঁড়ানোর কথা বলি, অর্থাৎ আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি এই অনুভূতিতে ভীত ও বিনীত হয়ে দাঁড়ানো। 'আল্লাহু আকবার' বলে ব্যবসা বা দুনিয়ার ভাবনায় ডুবে থাকা খুশূ নয়। কিয়ামতের দিন কাফিরদের চেহারায় সেই ভয় ও অপমানের ছাপ ফুটে উঠবে।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'কর্মক্লান্ত, পরিশ্রান্ত।' 'আমিলা' অর্থ কর্মে নিয়োজিত, 'নাসিবা' অর্থ ক্লান্ত। মুফাসসিরগণ এর দুটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এক, দুনিয়ায় তারা কঠোর পরিশ্রম করেছে, কিন্তু সেই শ্রম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়নি। কারণ তা সঠিক বিশ্বাস, সঠিক পদ্ধতি ও সঠিক নির্দেশনার ভিত্তিতে ছিল না। দুই, আখিরাতে জাহান্নামে তারা ক্লান্ত হয়ে শিকল টানবে ও পরিশ্রম করবে। উভয় ব্যাখ্যাতেই পরিশ্রম বৃথা।

বর্ণিত আছে, উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার একটি গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। একজন বৃদ্ধ খ্রিস্টান সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি কেঁদে ফেললেন। সঙ্গী কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, লোকটি সারাজীবন ইবাদতের জন্য কত কষ্ট করেছে, অথচ তার এই শ্রম কোনো কাজে আসবে না, কারণ সে সঠিক পথে নেই। এখান থেকে আমাদের জন্য শিক্ষা আছে। আমলের গ্রহণযোগ্যতার জন্য দুটি শর্ত: ইখলাস এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর

অনুসরণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি এমন আমল করে, যে বিষয়ে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত (সহীহ মুসলিম)।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে (হামিয়া)।' পঞ্চম আয়াতে, 'তাদের পান করানো হবে ফুটন্ত ঝরনা থেকে।' 'আইনিন আনিয়া' অর্থ অতিশয় উত্তপ্ত, ফুটন্ত প্রস্রবণ। তৃষ্ণা মেটানোর বদলে সে পানি তাদের আরও কষ্ট দেবে। জাহান্নামের শাস্তির বিবরণে সূরা নিসায় আছে, যখনই তাদের চামড়া পুড়ে যাবে, আমি তা বদলে নতুন চামড়া দেব, যাতে তারা শাস্তি আস্বাদন করতে থাকে (৪:৫৬)। অর্থাৎ আগুন তাদের নিঃশেষ করবে না, বরং কষ্ট অনুভব করানোর জন্য টিকিয়ে রাখবে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতে তাদের খাদ্যের কথা, 'তাদের জন্য কাঁটাযুক্ত শুকনো ঝোপ (যারী') ছাড়া কোনো খাদ্য থাকবে না, যা না পুষ্ট করবে, না ক্ষুধা মেটাবে।' 'দারী'' আরবের মরুভূমিতে জন্মানো কাঁটাযুক্ত তেতো গুল্ম। এ খাদ্য তাদের শরীরেও কোনো উপকার করবে না, ক্ষুধাও দূর করবে না।

❖ সূরা গাশিয়াহ, আয়াত ৮–১৬

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ﴿٨﴾

[৮] অনেক মুখমন্ডল সেদিন হবে, সজীব

لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ﴿٩﴾

[৯] তাদের কর্মের কারণে সন্তুষ্ট।

فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿١٠﴾

[১০] তারা থাকবে, সুউচ্চ জান্নাতে।

لَّا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴿١١﴾

[১১] তথায় শুনবে না কোন অসার কথাবার্তা।

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ﴿١٢﴾

[১২] তথায় থাকবে প্রবাহিত ঝরণা।

فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ﴿١٣﴾

[১৩] তথায় থাকবে উন্নত সুসজ্জিত আসন।

وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ ﴿١٤﴾

[১৪] এবং সংরক্ষিত পানপাত্র

وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴿١٥﴾

[১৫] এবং সারি সারি গালিচা

وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿١٦﴾

[১৬] এবং বিস্তৃত বিছানো কার্পেট।

আয়াত ৮–১৬: জান্নাতীদের চেহারা ও নিয়ামত

অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন কিছু চেহারা হবে আনন্দোজ্জ্বল (নাঈমা)।' নবম আয়াতে, 'তারা নিজেদের কর্মপ্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট।' তাদের দুনিয়ার পরিশ্রম আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে এবং এর জন্য তারা পুরস্কৃত হচ্ছে। দশম আয়াতে, 'তারা থাকবে সুউচ্চ জান্নাতে।' একাদশ আয়াতে, 'সেখানে তারা কোনো অনর্থক কথা শুনবে না।' দুনিয়ার আসরে অনেক ভালো খাবার থাকলেও যদি কেউ বকাঝকা করে, খোঁটা দেয়, তাহলে আনন্দ নষ্ট হয়। জান্নাতে তেমন কিছুই থাকবে না। কেউ বলবে না, তুমি তো অমুক দিন আমার ক্ষতি করেছিলে। সেখানে শুধু 'সালাম', অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের বাণী।

দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝরনা।' ত্রয়োদশ আয়াতে, 'সেখানে থাকবে সমুন্নত সুসজ্জিত আসন।' চতুর্দশ আয়াতে, 'সাজানো পানপাত্র।' পঞ্চদশ আয়াতে, 'সারি সারি বালিশ।' ষোড়শ আয়াতে, 'এবং বিছানো গালিচা।' আমরা যেমন বিশেষ অতিথিকে লাল গালিচা বিছিয়ে অভ্যর্থনা জানাই, জান্নাতবাসীদের জন্য সবকিছু আগেই সাজিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। যা যা প্রয়োজন হতে পারে, সবই থাকবে।

❖ সূরা গাশিয়াহ, আয়াত ১৭–২০

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى ٱلْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾

[১৭] তারা কি উষ্ট্রের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে

وَإِلَى ٱلسَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾

[১৮] এবং আকাশের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, তা কিভাবে উচ্চ করা হয়েছে

وَإِلَى ٱلْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾

[১৯] এবং পাহাড়ের দিকে যে, তা কিভাবে স্থাপন করা হয়েছে

وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾

[২০] এবং পৃথিবীর দিকে যে, তা কিভাবে সমতল বিছানো হয়েছে

আয়াত ১৭–২০: উট, আসমান, পাহাড় ও জমিন

এই আয়াতগুলো থেকে আল্লাহ মক্কার মুশরিকদের তাঁর কুদরতের চারটি নিদর্শনের দিকে মনোযোগ দিতে বলছেন। সপ্তদশ আয়াতে, 'তারা কি উটের দিকে তাকায় না, কীভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে?' উটের কথা কেন বলা হলো? কারণ আরবদের জীবনের সঙ্গে উট ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। তারা এতে চড়ে সফর করত, এর দুধ পান করত, এর মাংস খেত, এর লোম ও চামড়া ব্যবহার করত। উট তাদের চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা এ নিয়ে ভাবত না।

উটের গঠন সত্যিই বিস্ময়কর, বিশেষ করে মরুভূমির জীবনের জন্য। সে একবারে অনেক পানি পান করে নিতে পারে এবং দীর্ঘ সময় পানি ছাড়া চলতে পারে। তার কুঁজে চর্বি জমা থাকে, যা খাদ্য না পেলে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। তার শরীর তাপমাত্রার বড় ওঠানামা সহ্য করতে পারে। চোখে আছে লম্বা পাপড়ি ও অতিরিক্ত পাতা, যা বালুঝড় থেকে চোখ রক্ষা করে। তার নাকের ছিদ্র বন্ধ করা যায়, পা চওড়া ও নরম, যা বালুতে ডুবে যায় না। তার মুখ ও পাকস্থলী এমনভাবে তৈরি যে কাঁটাযুক্ত গুল্মও সে খেয়ে হজম করতে পারে। এভাবে প্রতিটি বৈশিষ্ট্যই মরুভূমির জীবনের জন্য নিখুঁতভাবে মানানসই। এ কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, এ এক মহান পরিকল্পনাকারীর নিদর্শন।

অষ্টাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং আসমানের দিকে, কীভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে?' ঊনবিংশ আয়াতে, 'এবং পাহাড়ের দিকে, কীভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে?' বিংশ আয়াতে, 'এবং জমিনের দিকে, কীভাবে তাকে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে?' এই চারটি বিষয় ছিল আরবদের নিত্যসঙ্গী: সফরে উট, মাথার ওপর আসমান, পাশে পাহাড় এবং পায়ের নিচে জমিন।

আমরা নিজেরাও আল্লাহর কুদরতের জীবন্ত প্রমাণ। দুটো বাঁশ দিয়ে একটি বড় বস্তা ঝুলিয়ে রাখা যায় না, তবে দুটি পায়ের ওপর আমাদের ষাট-সত্তর কেজি শরীর কত ভঙ্গিতে নড়ে, বাঁকে, এক পায়ে দাঁড়ায়, ভারসাম্য রাখে। এ কি সাধারণ বিষয়? নিজের শরীরের এই বিস্ময় নিয়েও আমরা কমই ভাবি।

❖ সূরা গাশিয়াহ, আয়াত ২১–২৬

فَذَكِّرْ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾

[২১] অতএব, আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা

لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

[২২] আপনি তাদের শাসক নন

إِلَّا مَن تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ﴿٢٣﴾

[২৩] কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কাফের হয়ে যায়

فَيُعَذِّبُهُ ٱللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرَ ﴿٢٤﴾

[২৪] আল্লাহ তাকে মহা আযাব দেবেন।

إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ ﴿٢٥﴾

[২৫] নিশ্চয় তাদের প্রত্যাবর্তন আমারই নিকট

ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴿٢٦﴾

[২৬] অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ আমারই দায়িত্ব।

আয়াত ২১–২৬: উপদেশদাতার দায়িত্ব ও আল্লাহর হিসাব

একবিংশ আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, 'অতএব আপনি উপদেশ দিন, আপনি তো কেবল একজন উপদেশদাতা।' আপনি জাহান্নামের কথা বলেছেন, আল্লাহর কুদরতের কথাও বলেছেন, এরপরও যারা আসছে না, তাদের নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। দ্বাবিংশ আয়াতে, 'আপনি তাদের ওপর জবরদস্তিকারী নন।' 'মুসাইতির' অর্থ যে কাউকে নিয়ন্ত্রণ করে বা জোর খাটায়। আপনার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া, কাউকে জোর করে ঈমান আনানো নয়।

ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তবে যে মুখ ফিরিয়ে নেয় ও কুফরি করে, আল্লাহ তাকে মহা শাস্তি দেবেন।' পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ আয়াতে সূরা শেষ হয়েছে, 'নিশ্চয়ই আমারই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন, অতঃপর নিশ্চয়ই আমারই দায়িত্বে তাদের হিসাব নেওয়া।'

আমরা প্রিয়জনের মৃত্যুর সময় বলি, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন', অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহর জন্য এবং তাঁরই কাছে ফিরে যাব। এর মধ্যে আমাদের জন্য একটি বার্তা আছে। আমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সেই ফিরে যাওয়া হবে সুসজ্জিত প্রস্তুতির সঙ্গে, নাকি অপ্রস্তুত অবস্থায়, সেটাই আমাদের ভাবার বিষয়। আল্লাহ যেন আমাদের দিকে সন্তুষ্ট হয়ে তাকান, তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া আমাদের কর্তব্য।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কিয়ামতের ভয়াবহতা সবকিছুকে আচ্ছন্ন করবে, তাই এর জন্য এখনই প্রস্তুতি নেওয়া জরুরি।
- নামাযে খুশূ-খুযূ রাখা উচিত। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়েছি, এই অনুভূতি থাকলে দুনিয়ার চিন্তা সরে যায়।

- শুধু পরিশ্রম যথেষ্ট নয়। আমল কবুলের জন্য ঈমান, ইখলাস ও সুন্নাহর অনুসরণ জরুরি।
- জান্নাতে অনর্থক ও কষ্টদায়ক কথা থাকবে না, সেখানে শুধু শান্তির বাণী।
- আল্লাহর সৃষ্টি, উট, আসমান, পাহাড় ও জমিন নিয়ে ভাবা ঈমান মজবুত করে।
- উপদেশদাতার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া। কাউকে জোর করা বা হিদায়াত দেওয়া তাঁর কাজ নয়।
- সবাইকে আল্লাহর কাছেই ফিরে যেতে হবে এবং হিসাব দিতে হবে। এর জন্য প্রস্তুত থাকা আমাদের দায়িত্ব।

অধ্যায় ১২

সূরা ফাজর

الفجر

হে প্রশান্ত আত্মা, ফিরে এসো

কুরআনের ৮৯তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৩০টি

সূরা ফাজর কুরআনের ৮৯তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ৩০। এই সূরা এমন সময়ে নাযিল হয়েছিল, যখন মক্কার মুশরিকরা সহজ-সরল ও অসহায় মুমিন সাহাবীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালাচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা এখানে পূর্ববর্তী অবাধ্য জাতিগুলোর পরিণতি তুলে ধরে মুমিনদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন। ফিরআউন, আদ ও সামূদের মতো শক্তিশালী জাতিও যখন আল্লাহর অবাধ্য হয়েছে, আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছেন।

❖ সূরা ফাজর, আয়াত ১–৫

وَٱلۡفَجۡرِ ١

[১] শপথ ফজরের

وَلَيَالٍ عَشۡرٖ ٢

[২] শপথ দশ রাত্রির, শপথ তার

وَٱلشَّفۡعِ وَٱلۡوَتۡرِ ٣

[৩] যা জোড় ও যা বিজোড়

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَسۡرِ ٤

[৪] এবং শপথ রাত্রির যখন তা গত হতে থাকে

هَلۡ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٞ لِّذِي حِجۡرٍ ٥

[৫] এর মধ্যে আছে শপথ জ্ঞানী ব্যক্তির জন্যে।

আয়াত ১–৫: পাঁচটি শপথ

সূরার শুরুতে আল্লাহ কয়েকটি শপথ করেছেন। প্রথম আয়াতে ‘ওয়াল ফাজর’, ভোরের শপথ। ‘ফাজর’ বলতে কোন ভোর বোঝানো হয়েছে, তা নিয়ে মুফাসসিরদের একাধিক মত আছে। কেউ বলেছেন কুরবানির ঈদের দিনের ভোর, কেউ বলেছেন ফজরের নামায। তবে সবচেয়ে

গ্রহণযোগ্য মত হলো, প্রতিদিনের ভোর। আল্লাহ যেমন আসরের শপথ করেছেন, তেমনি ফজরেরও শপথ করেছেন। আল্লাহ সাধারণত যেসব সৃষ্টির শপথ করেন, তা হয় বিশেষ অলৌকিক কোনো সৃষ্টি, নয়তো বিশেষ নিয়ামত। ভোরের আলো আমাদের জন্য মহা নিয়ামত। সূরা কাসাসে আল্লাহ বলেছেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, আল্লাহ যদি কিয়ামত পর্যন্ত রাতকে স্থায়ী করে দিতেন, তাহলে আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ তোমাদের আলো এনে দিতে পারত? (২৮:৭১–৭২)। প্রতিদিন ভোর আসে বলে আমরা এর মূল্য বুঝি না।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া লায়ালিন আশর', দশ রাতের শপথ। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি যিলহজ মাসের প্রথম দশ রাত (দিন)। কারও কারও মতে রমযানের শেষ দশ রাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এই দিনগুলোর (যিলহজের প্রথম দশ দিন) নেক আমল আল্লাহর কাছে অন্য যেকোনো দিনের আমলের চেয়ে অধিক প্রিয়। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়? তিনি বললেন, জিহাদও নয়, তবে সেই ব্যক্তির কথা আলাদা, যে নিজের জান ও মাল নিয়ে বের হয়েছে এবং কিছুই নিয়ে ফেরেনি (সহীহ বুখারী)। এই দশ দিনে নামায, রোযা, যিকর, সদকা, কুরবানি ও আরাফার দিনের গুরুত্ব বিশেষভাবে মনে রাখা উচিত।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়াশ-শাফয়ি ওয়াল-ওয়াতর', জোড় ও বিজোড়ের শপথ। এর ব্যাখ্যায় বহু মত আছে। এক মত, জোড় হলো কুরবানির দিন (যিলহজের ১০ তারিখ) আর বিজোড় হলো আরাফার দিন (৯ তারিখ)। আরেকটি মত, জোড় অর্থ আল্লাহর সব সৃষ্টি, যা জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্ট, আর বিজোড় অর্থ আল্লাহ নিজে, যিনি একক ও অদ্বিতীয়। চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াসর', রাতের শপথ, যখন তা বিদায় নেয়।

পঞ্চম আয়াতে এই শপথগুলোর পর প্রশ্ন, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য রয়েছে শপথ।' 'হিজর' অর্থ আটকে রাখা, সীমারেখা। যার বিবেক আছে, সে নিজেকে অন্যায় ও ক্ষতিকর কাজ থেকে আটকে রাখে, তাই আরবিতে 'হিজর' বা 'আকল' বিবেকের অর্থে ব্যবহৃত হয়। আল্লাহ বলছেন, এতগুলো শপথ কি বিবেকবান মানুষের জন্য যথেষ্ট নয়?

❖ সূরা ফাজর, আয়াত ৬–৮

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾

[৬] আপনি কি লক্ষ্য করেননি, আপনার পালনকর্তা আদ বংশের ইরাম গোত্রের সাথে কি আচরণ করেছিলেন

إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴿٧﴾

[৭] যাদের দৈহিক গঠন স্তম্ভ ও খুঁটির ন্যায় দীর্ঘ ছিল এবং

ٱلَّتِي لَمۡ يُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِي ٱلۡبِلَٰدِ ﴿٨﴾

[৮] যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয়নি

আয়াত ৬–৮: আদ জাতি

ষষ্ঠ আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি কি দেখেননি, আপনার রব আদ জাতির সঙ্গে কী আচরণ করেছেন?' এর সঙ্গে সূরা ফীলের প্রথম আয়াতের মিল আছে, যেখানে হস্তিবাহিনীর পরিণতি দেখার কথা বলা হয়েছে। সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইরাম, স্তম্ভবিশিষ্ট (যাতিল ইমাদ)।' ইরাম আদ জাতির একটি নগরী বা তাদের বংশধারার একটি শাখা। তারা বিশাল বিশাল অট্টালিকা ও স্তম্ভ নির্মাণ করত। অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যার মতো আর কোনো শহর পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়নি।' তারা এত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল।

আল্লাহ তাআলা তাদের ধ্বংস করেছেন সামান্য বাতাস দিয়ে। সূরা হাক্কায় বলা হয়েছে, তাদের ওপর টানা সাত রাত ও আট দিন প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস প্রবাহিত হয়েছিল। তাদের দেখা যেত খেজুর গাছের ফাঁপা কাণ্ডের মতো মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছে (৬৯:৬–৭)। এত শক্তিশালী ও বিশালদেহী জাতি আল্লাহর একটি সাধারণ সৃষ্টি, বাতাসের সামনেই অসহায় হয়ে গেল।

❖ সূরা ফাজর, আয়াত ৯–১৪

وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ ﴿٩﴾

[৯] এবং সামুদ গোত্রের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর কেটে গৃহ নির্মাণ করেছিল।

وَفِرۡعَوۡنَ ذِي ٱلۡأَوۡتَادِ ﴿١٠﴾

[১০] এবং বহু কীলকের অধিপতি ফেরাউনের সাথে

ٱلَّذِينَ طَغَوۡاْ فِي ٱلۡبِلَٰدِ ﴿١١﴾

[১১] যারা দেশে সীমালঙ্ঘন করেছিল।

فَأَكۡثَرُواْ فِيهَا ٱلۡفَسَادَ ﴿١٢﴾

[১২] অতঃপর সেখানে বিস্তর অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

فَصَبَّ عَلَيۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾

[১৩] অতঃপর আপনার পালনকর্তা তাদেরকে শাস্তির কশাঘাত করলেন।

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ﴿١٤﴾

[১৪] নিশ্চয় আপনার পালকর্তা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

আয়াত ৯–১৪: সামূদ, ফিরআউন ও আযাবের চাবুক

নবম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং সামূদ জাতি, যারা উপত্যকায় পাথর খোদাই করত।’ সামূদ জাতি পাহাড় কেটে কেটে ঘরবাড়ি বানাত। পাহাড় তো আগে থেকেই দাঁড়িয়ে আছে, তারা শুধু খোদাই করে ভেতরে জায়গা বের করত, জানালা-দরজা বসাত। এত দক্ষ ও শক্তিশালী ছিল তারা। আল্লাহ জিবরীলের একটি বিকট আওয়াজ দিয়ে তাদের ধ্বংস করেছেন (সূরা হূদ ১১:৬৭)। তাদের বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ আজও আরব উপদ্বীপের উত্তরে দেখা যায়। তাবুক অভিযানের সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় মাথা ঢেকে দ্রুত অতিক্রম করেছিলেন এবং সাহাবীদের বলেছিলেন, যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছে, তাদের বাসস্থানে কাঁদতে কাঁদতে ছাড়া প্রবেশ করো না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং পেরেকওয়ালা ফিরআউন।’ এর ব্যাখ্যা আমরা সূরা নাবায় দেখেছি। একটি মতে সে বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে চলত, তাঁবু টাঙাতে অসংখ্য পেরেক লাগত। অন্য মতে সে বিরোধীদের হাত-পায়ে পেরেক ঠুকে শাস্তি দিত।

একাদশ ও দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যারা শহরে শহরে সীমালঙ্ঘন করেছিল এবং সেখানে অনেক ফাসাদ করেছিল।’ তারা অন্যায়, অবিচার ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করেছিল। ত্রয়োদশ আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘তখন আপনার রব তাদের ওপর আযাবের চাবুক হানলেন।’ চতুর্দশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘নিশ্চয়ই আপনার রব ঘাঁটিতে (মিরসাদ) আছেন।’ ‘মিরসাদ’ অর্থ পর্যবেক্ষণের স্থান। আল্লাহ সবকিছু দেখছেন। জালিমরা যা করছে, তিনি তা জানেন না, এমন ভাবা ভুল। সময় এলে তিনি অবশ্যই তাদের পাকড়াও করবেন।

❖ সূরা ফাজর, আয়াত ১৫–১৭

فَأَمَّا ٱلۡإِنسَٰنُ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ رَبُّهُۥ فَأَكۡرَمَهُۥ وَنَعَّمَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكۡرَمَنِ ١٥

[১৫] মানুষ এরূপ যে, যখন তার পালনকর্তা তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর সম্মান ও অনুগ্রহ দান করেন, তখন বলে, আমার পালনকর্তা আমাকে সম্মান দান করেছেন।

وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبۡتَلَىٰهُ فَقَدَرَ عَلَيۡهِ رِزۡقَهُۥ فَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَٰنَنِ ١٦

[১৬] এবং যখন তাকে পরীক্ষা করেন, অতঃপর রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন বলেঃ আমার পালনকর্তা আমাকে হেয় করেছেন।

كَلَّاۖ بَل لَّا تُكۡرِمُونَ ٱلۡيَتِيمَ ١٧

[১৭] এটা অমূলক, বরং তোমরা এতীমকে সম্মান কর না।

আয়াত ১৫–১৭: সম্পদ কি সম্মানের মাপকাঠি?

পঞ্চদশ আয়াতে মানুষের একটি স্বভাব তুলে ধরা হয়েছে, 'মানুষকে যখন তার রব পরীক্ষা করেন, তাকে সম্মান দেন ও নিয়ামত দান করেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে সম্মানিত করেছেন।' ষোড়শ আয়াতে, 'আর যখন তিনি তাকে পরীক্ষা করেন এবং তার রিযিক সংকুচিত করে দেন, তখন সে বলে, আমার রব আমাকে অপমানিত করেছেন।'

এটি আমাদেরও সাধারণ চিন্তা। বিপদে পড়লে আমরা ভাবি, আল্লাহ বুঝি আমাকে পছন্দ করেন না। কারও ব্যবসা ডুবলে, অসুখে ভুগলে, সন্তান কথা না শুনলে আমরা ধারণা করি, লোকটা বুঝি খারাপ, আল্লাহ তাকে শাস্তি দিচ্ছেন। আবার নিজে নামায পড়েও সম্পদ না পেলে মনে হয়, আল্লাহ বুঝি আমাকে ভালোবাসেন না। অন্যদিকে সম্পদশালী মানুষকে আমরা সম্মান করি, অনেক সময় সে অন্যায়ভাবে ধনী হলেও। আর জ্ঞানী, সৎ মানুষ যদি সম্পদহীন হন, তাঁকে আমরা ছোট চোখে দেখি।

সপ্তদশ আয়াতে আল্লাহ এই ধারণাকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন, 'কাল্লা', কখনোই নয়! সম্পদ বা দারিদ্র্য কোনোটিই আল্লাহর কাছে সম্মান বা অপমানের মাপকাঠি নয়। এগুলো পরীক্ষা। আল্লাহ কাউকে সম্পদ দিয়ে শোকরের পরীক্ষা নেন, কাউকে অভাব দিয়ে সবরের পরীক্ষা নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মুমিনের বিষয়টি আশ্চর্যজনক। তার সবকিছুই কল্যাণকর। সুখ এলে সে শোকর করে, তা তার জন্য কল্যাণ। দুঃখ এলে সে সবর করে, তাও তার জন্য কল্যাণ (সহীহ মুসলিম)।

সম্পদই যদি সম্মানের মাপকাঠি হতো, তাহলে আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন এমন অনাড়ম্বর হতো না। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, তাঁদের ঘরে মাসের পর মাস চুলায় আগুন জ্বলত না, শুধু খেজুর ও পানি দিয়ে চলত (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আবার সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ বিশাল রাজত্ব দিয়েছিলেন এবং তিনি তা শুকরিয়ার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। কাজেই সম্পদ থাকা বা না থাকা সম্মানের চিহ্ন নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া যদি আল্লাহর কাছে মশার ডানার সমানও মূল্য রাখত, তাহলে তিনি কোনো কাফিরকে এক ঢোক পানিও পান করাতেন না (জামে তিরমিযী)। সূরা যুখরুফে আল্লাহ বলেছেন, সব মানুষ এক জাতি (কাফির) হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকলে যারা দয়াময়কে অস্বীকার করে, তাদের ঘরের ছাদ ও সিঁড়ি আমি রুপার করে দিতাম (৪৩:৩৩–৩৫)। কারণ তখন মুমিনরা ভাবত, বোধহয় আমরাই ভুল পথে আছি, আর কাফিররাই সঠিক। এজন্য আল্লাহ দুনিয়ার সম্পদকে অবিশ্বাসীদের সামনে থেকে একেবারে সরিয়ে ফেলেননি, আবার একেবারে দেনওনি।

তাহলে কীভাবে বুঝব, আমার সম্পদ নিয়ামত নাকি পরীক্ষা? যে সম্পদ আপনাকে আল্লাহর দিকে ধাবিত করে, বিনয়ী করে, অসহায়ের পাশে দাঁড়াতে শেখায়, অপচয় ও গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং কৃতজ্ঞতা বাড়ায়, সেটি আল্লাহর নিয়ামত। আর যে সম্পদ আপনাকে আল্লাহ থেকে দূরে সরায়, বেপরোয়া ও অহংকারী করে, মানুষের ওপর জুলুম করতে উৎসাহ দেয়, সেটি আপনার জন্য ফিতনা ও পরীক্ষা। আবার অভাবে যিনি আল্লাহর ওপর অসন্তুষ্ট না হয়ে বলেন, আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই আলহামদুলিল্লাহ, তাঁর জন্য সেই দারিদ্র্যই কল্যাণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা তোমাদের চেয়ে নিম্ন অবস্থার মানুষের দিকে তাকাও, উঁচু অবস্থার মানুষের দিকে নয়। এতে আল্লাহর নিয়ামতকে তুচ্ছ মনে করার প্রবণতা থেকে বাঁচা যায় (সহীহ মুসলিম)।

শোকর দুই প্রকার: মৌখিক ও কর্মগত। খাবারের পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বলা মৌখিক শোকর। কিন্তু প্রকৃত শোকর হলো, সেই খাবার থেকে পাওয়া শক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করা। ঠিক আযানের জবাবের মতো। আযানের জবাব মুখে দেওয়া যেমন সুন্নাত, তেমনি আসল জবাব হলো মসজিদে চলে আসা।

সপ্তদশ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে, 'বরং তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান করো না।' এখানে ইয়াতীমকে 'সম্মান' করার কথা বলা হয়েছে, শুধু সাহায্য করার কথা নয়। আমরা সাধারণত কাউকে সাহায্য করলে তাকে ছোট চোখে দেখি, ভাবি সে আমার দয়ায় বাঁচছে। আল্লাহ বলছেন, ইয়াতীমকে সাহায্য করতে হবে সম্মানের সঙ্গে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি ও ইয়াতীমের প্রতিপালনকারী জান্নাতে এভাবে থাকব, এই বলে তিনি শাহাদাত ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে দেখালেন (সহীহ বুখারী)। সম্পদ পেয়েও যদি আমরা ইয়াতীম ও অসহায়ের হক আদায় না করি, তাহলে সেই সম্পদ আমাদের সম্মান নয়, জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- ভোর আল্লাহর বড় নিয়ামত। এর শপথ আমাদের সেই নিয়ামতের মূল্য বুঝতে শেখায়।
- যিলহজের প্রথম দশ দিনের আমল আল্লাহর কাছে অত্যন্ত প্রিয়। এই দিনগুলো কাজে লাগানো উচিত।
- আদ, সামূদ ও ফিরআউনের মতো শক্তিশালী জাতিও আল্লাহর অবাধ্যতার ফলে ধ্বংস হয়েছে। শক্তি ও সম্পদ নিয়ে অহংকার করা বোকামি।
- আল্লাহ সবকিছু দেখছেন। জালিমদের তিনি সময়মতো পাকড়াও করবেন।
- সম্পদ সম্মানের প্রমাণ নয়, আর দারিদ্র্য অপমানের প্রমাণ নয়। দুটোই পরীক্ষা, একটিতে শোকর, অন্যটিতে সবর।

- নিয়ামত পেয়ে যে আল্লাহর দিকে ফেরে, তার সম্পদ নিয়ামত। যে আল্লাহ থেকে দূরে যায়, তার জন্য সম্পদ ফিতনা।
- শোকর শুধু মুখে নয়, কাজেও আদায় করতে হয়। পাওয়া নিয়ামত আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করাই প্রকৃত শোকর।
- ইয়াতীম ও অসহায়কে সাহায্য করতে হবে সম্মানের সঙ্গে, তাচ্ছিল্য ও খোঁটা ছাড়া।

উৎস-আলোচনায় সূরা ফাজরের ১৭ আয়াত পর্যন্ত আলোচনা এসেছে। গ্রন্থের পূর্ণতার জন্য এখানে বাকি অংশ, ১৮ থেকে ৩০ আয়াত, যুক্ত করা হলো। এই অংশে সম্পদের প্রতি মোহ, কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য এবং প্রশান্ত আত্মার প্রতি আল্লাহর আহ্বান বর্ণিত হয়েছে। সূরার সমাপ্তি এখানেই সবচেয়ে হৃদয়স্পর্শী।

❖ সূরা ফাজর, আয়াত ১৮–২০

وَلَا تَحَٰٓضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلۡمِسۡكِينِ ١٨

[১৮] এবং মিসকীনকে অন্নদানে পরস্পরকে উৎসাহিত কর না।

وَتَأۡكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكۡلٗا لَّمّٗا ١٩

[১৯] এবং তোমরা মৃতের ত্যাজ্য সম্পত্তি সম্পূর্ণরূপে কুক্ষিগত করে ফেল

وَتُحِبُّونَ ٱلۡمَالَ حُبّٗا جَمّٗا ٢٠

[২০] এবং তোমরা ধন-সম্পদকে প্রাণভরে ভালবাস।

আয়াত ১৮–২০: অভাবীকে খাওয়ানোর উৎসাহ না দেওয়া ও সম্পদের মোহ

অষ্টাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং তোমরা মিসকিনকে খাদ্যদানে পরস্পরকে উৎসাহিত করো না।’ আগের আয়াতে ইয়াতীমকে সম্মান না করার অভিযোগ ছিল। এখানে বলা হচ্ছে, শুধু নিজে খাওয়ানো নয়, অন্যদেরও এ কাজে উৎসাহ দেওয়ার কোনো তাগিদ তাদের মধ্যে নেই। মুমিনের দায়িত্ব শুধু নিজে ভালো কাজ করা নয়, সমাজে কল্যাণের পরিবেশ তৈরি করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কল্যাণের পথ দেখায়, সে ওই কল্যাণ সম্পাদনকারীর মতোই সওয়াব পায় (সহীহ মুসলিম)।

ঊনবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং তোমরা উত্তরাধিকার সম্পদ গোগ্রাসে খাও।’ ‘তুরাস’ অর্থ মীরাস বা উত্তরাধিকার। ‘লাম্মা’ অর্থ হালাল-হারাম মিশিয়ে সবকিছু একসঙ্গে খেয়ে ফেলা। জাহিলী যুগে তারা নারী ও শিশুদের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করত এবং সবটুকু নিজেরা গ্রাস করত। আজও আমাদের সমাজে অনেক সময় বোনদের অংশ না দিয়ে, ইয়াতীম ভাতিজা-

ভাতিজির সম্পদ দখল করে, কিংবা ওয়ারিশদের মধ্যে ইনসাফ না করে সম্পত্তি আত্মসাৎ করা হয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন, যারা অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের সম্পদ খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভরে (সূরা নিসা ৪:১০)।

বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘এবং তোমরা সম্পদকে ভালোবাসো অতিশয় ভালোবাসা।’ ‘জাম্মা’ অর্থ প্রচুর, উপচে পড়া। সম্পদ জমানো মানুষের স্বভাবজাত প্রবণতা, কিন্তু তা যখন মোহে পরিণত হয়, তখন সে সম্পদের জন্য হালাল-হারাম ভুলে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ছাগলের পালে দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে ছেড়ে দিলে যতটা ক্ষতি করে, সম্পদ ও সম্মানের লোভ মানুষের দ্বীনের তার চেয়ে বেশি ক্ষতি করে (জামে তিরমিযী)।

❖ সূরা ফাজর, আয়াত ২১–২৬

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا ﴿٢١﴾

[২১] এটা অনুচিত। যখন পৃথিবী চুর্ণ-বিচুর্ণ হবে

وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ﴿٢٢﴾

[২২] এবং আপনার পালনকর্তা ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে উপস্থিত হবেন

وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۭ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذِۭ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ ﴿٢٣﴾

[২৩] এবং সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে, সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু এই স্মরণ তার কি কাজে আসবে

يَقُولُ يَٰلَيۡتَنِي قَدَّمۡتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾

[২৪] সে বলবেঃ হায়, এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রে প্রেরণ করতাম

فَيَوۡمَئِذٖ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٞ ﴿٢٥﴾

[২৫] সেদিন তার শাস্তির মত শাস্তি কেউ দিবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٞ ﴿٢٦﴾

[২৬] এবং তার বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না।

আয়াত ২১–২৬: কিয়ামতের দৃশ্য

একবিংশ আয়াতে 'কাল্লা' (কখনোই নয়) বলে তাদের এই ভুল ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। এরপর বলা হয়েছে, 'যখন পৃথিবীকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।' 'দাক্কা' অর্থ ভেঙে গুঁড়ো করা। পাহাড়, দালানকোঠা, বিশাল স্থাপনা, সবকিছু ধুলোয় মিশে যাবে।

দ্বাবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এবং আপনার রব আসবেন, আর ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে।' কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর শান অনুযায়ী আগমন করবেন, কীভাবে, তা আমাদের জানা নেই। আমরা এ বিষয়ে কোনো উপমা বা ব্যাখ্যায় না গিয়ে যেমন এসেছে তেমনই বিশ্বাস করি। ফেরেশতারা সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকবেন।

ত্রয়োবিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে। সেদিন মানুষ স্মরণ করবে, কিন্তু সেই স্মরণে তার কী লাভ?' হাদীসে এসেছে, সেদিন জাহান্নামকে আনা হবে সত্তর হাজার লাগাম নিয়ে, প্রত্যেক লাগামে সত্তর হাজার ফেরেশতা থাকবেন, যাঁরা তা টেনে আনবেন (সহীহ মুসলিম)। তখন মানুষ নিজের জীবনের সব ভুল, সব অবহেলার কথা মনে করবে। কিন্তু তখন স্মরণের সুযোগ শেষ। উপদেশ গ্রহণের সময় ছিল দুনিয়া।

চতুর্বিংশ আয়াতে সে বলবে, 'হায়, আমি যদি আমার এই জীবনের জন্য কিছু আগে পাঠাতাম!' পঞ্চবিংশ ও ষড়বিংশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন তাঁর শাস্তির মতো শাস্তি কেউ দিতে পারবে না, আর তাঁর বাঁধনের মতো বাঁধনও কেউ বাঁধতে পারবে না।' আল্লাহর শাস্তি ও বাঁধনের ভয়াবহতা কল্পনাতীত।

❖ সূরা ফাজর, আয়াত ২৭–৩০

يَٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾

[২৭] হে প্রশান্ত মন

ٱرْجِعِيٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾

[২৮] তুমি তোমার পালনকর্তার নিকট ফিরে যাও সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।

فَٱدْخُلِي فِي عِبَٰدِي ﴿٢٩﴾

[২৯] অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও।

وَٱدْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

[৩০] এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।

আয়াত ২৭–৩০: ‘হে প্রশান্ত আত্মা!’

সূরার শেষ চারটি আয়াত কুরআনের সবচেয়ে মধুর আহ্বানগুলোর অন্যতম। আল্লাহ বলছেন, ‘হে প্রশান্ত আত্মা (নাফসে মুতমাইন্না), তুমি তোমার রবের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। অতঃপর আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।’

কুরআনে মানুষের নফসের তিনটি অবস্থার উল্লেখ আছে। প্রথম, ‘নাফসে আম্মারা’, যা মন্দ কাজের আদেশ দেয় (সূরা ইউসুফ ১২:৫৩)। দ্বিতীয়, ‘নাফসে লাওয়ামা’, যা গুনাহ করলে নিজেকে তিরস্কার করে (সূরা কিয়ামাহ ৭৫:২)। তৃতীয়, ‘নাফসে মুতমাইন্না’, যে আল্লাহর স্মরণ, তাঁর বিধান ও তাঁর ফয়সালায় প্রশান্ত। আল্লাহর যিকিরেই অন্তর প্রশান্তি পায় (সূরা রা'দ ১৩:২৮)।

এই আহ্বান কখন আসবে, তা নিয়ে মুফাসসিরদের মত আছে। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখ বলেছেন, মৃত্যুর সময়ে ফেরেশতারা মুমিনের রূহকে এই কথা বলবেন। আবার কিয়ামতের দিন পুনরুত্থানের সময়ও এই আহ্বান হতে পারে। দুটিই সম্ভব।

লক্ষ করার বিষয়, এখানে ‘রাযিয়াতান’ (সন্তুষ্ট) ও ‘মারযিয়্যাহ’ (সন্তোষভাজন) দুটি শব্দ আছে। বান্দা আল্লাহর ওপর সন্তুষ্ট, আল্লাহও বান্দার ওপর সন্তুষ্ট। এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য আর কী হতে পারে? ‘আমার বান্দাদের মধ্যে প্রবেশ করো’ কথার অর্থ নেককার ও আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হওয়া, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীলদের সঙ্গ লাভ করা। আর সবশেষে, ‘আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।’ জান্নাতকে আল্লাহ নিজের দিকে সম্বোধন করেছেন, যা এর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করে।

সূরা ফাজর আমাদের শেখায়, দুনিয়ার ক্ষমতা, সম্পদ ও শক্তি স্থায়ী নয়। যারা এসবে অহংকারী হয়েছে, আদ, সামূদ ও ফিরআউনের মতো, তাদের পরিণতি আমাদের সামনে। আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত নাফসে মুতমাইন্না অর্জন করা, যে আল্লাহর ফয়সালায় সন্তুষ্ট, আর যার জন্য শেষ বিচারের দিনে এই মধুর আহ্বান অপেক্ষা করছে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- মিসকিনকে খাওয়ানো ও অন্যকে এ কাজে উৎসাহ দেওয়া মুমিনের সামাজিক দায়িত্ব।
- উত্তরাধিকার সম্পদে ইনসাফ করা জরুরি। বোন, ইয়াতীম ও দুর্বল ওয়ারিশদের হক আত্মসাৎ করা কঠিন গুনাহ।
- সম্পদের অতিরিক্ত মোহ মানুষকে হালাল-হারাম ভুলিয়ে দেয় এবং দ্বীনকে ধ্বংস করে।
- কিয়ামতের দিন শুধু আফসোস থাকবে। কাজের সুযোগ দুনিয়াতেই।
- নফসের তিনটি স্তর আছে। আমাদের উচিত নাফসে আম্মারা থেকে নাফসে মুতমাইন্নার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা।

- আল্লাহর যিকির, ফয়সালায় সন্তুষ্টি ও সৎকর্ম দ্বারা অন্তর প্রশান্ত হয়।

অধ্যায় ১৩

সূরা বালাদ

البلد

কঠিন গিরিপথ, যা মানুষ এড়িয়ে যায়

কুরআনের ৯০তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ২০টি

সূরা বালাদ কুরআনের ৯০তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২০। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা মানুষের প্রতি তাঁর কিছু অনুগ্রহ, মানুষের জীবনের স্বভাবজাত সংগ্রাম এবং সমাজ গঠনে মানুষের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়গুলো আলোচনা করেছেন।

❖ সূরা বালাদ, আয়াত ১–৩

لَآ أُقۡسِمُ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ١

[১] আমি এই নগরীর শপথ করি

وَأَنتَ حِلُّۢ بِهَٰذَا ٱلۡبَلَدِ ٢

[২] এবং এই নগরীতে আপনার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই।

وَوَالِدٖ وَمَا وَلَدَ ٣

[৩] শপথ জনকের ও যা জন্ম দেয়।

আয়াত ১–৩: নগরী, পিতা ও সন্তানের শপথ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘লা উকসিমু বিহাযাল বালাদ’। শাব্দিক অর্থ ‘আমি এই নগরীর শপথ করছি না’, কিন্তু আরবি ব্যাকরণের নিয়মে এই ‘লা’ অতিরিক্ত, যা শপথের গুরুত্ব বাড়ায়। অর্থাৎ ‘আমি এই নগরীর শপথ করছি।’ ‘বালাদ’ অর্থ শহর। এখানে মক্কা নগরীই উদ্দেশ্য। সূরা তীনে আল্লাহ আরও বলেছেন, ‘এই নিরাপদ নগরীর শপথ’ (৯৫:৩)।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আর আপনি এই নগরীতে হিল্ল (বৈধ/অবস্থানকারী)।’ ‘হিল্ল’ শব্দের তিনটি ব্যাখ্যা আছে।

এক, ‘হালাল’ বা বৈধ। মক্কা হারাম শরীফের এলাকা, সেখানে গাছ কাটা, ঘাস ছেঁড়া, শিকার করা এবং যুদ্ধবিগ্রহ নিষিদ্ধ। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন যে একদিন এই শহর আপনার জন্য সাময়িকভাবে বৈধ করা হবে। মক্কা বিজয়ের দিন তা-ই হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মক্কা আমার জন্য দিনের

মাত্র এক ঘন্টা বৈধ করা হয়েছিল, তারপর তার সম্মান আবার আগের মতোই হারাম হয়ে গেছে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এই আয়াত মক্কী জীবনে নাযিল হয়েছিল, তখন এটি ছিল একটি ভবিষ্যদ্বাণী।

দুই, 'হিল্ল' শব্দের আরেক অর্থ অবস্থানকারী। অর্থাৎ আপনি এই নগরীর বাসিন্দা, তাই এর সম্মান ও অধিকার আপনার প্রাপ্য।

তিন, কাফিররা আপনাকে এই শহরে হালাল মনে করছে। মক্কার মুশরিকরা এই নগরীর সম্মান রক্ষা করত, এখানে গাছ কাটা বা শিকার করাকেও হারাম মনে করত। অথচ তারাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে হত্যা করা বৈধ মনে করেছিল। তারা দারুন নাদওয়ায় পরামর্শ করেছিল, সব গোত্র মিলে একসঙ্গে তাঁকে হত্যা করবে, যাতে বনু হাশিম প্রতিশোধ নিতে না পারে। যে শহরের সম্মান নিয়ে তাদের এত গর্ব, সেখানেই তারা আল্লাহর নবীর রক্ত হালাল মনে করেছিল।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর পিতার ও সন্তানের শপথ।' অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে 'পিতা' বলতে আদম আলাইহিস সালাম এবং 'সন্তান' বলতে সমগ্র মানবজাতি, অর্থাৎ আদমের বংশধর। এই শপথের জবাব পরের আয়াতে আছে।

❖ সূরা বালাদ, আয়াত ৪–৭

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِى كَبَدٍ ﴿٤﴾

[৪] নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।

أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ﴿٥﴾

[৫] সে কি মনে করে যে, তার উপর কেউ ক্ষমতাবান হবে না

يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ﴿٦﴾

[৬] সে বলেঃ আমি প্রচুর ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি।

أَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٧﴾

[৭] সে কি মনে করে যে, তাকে কেউ দেখেনি

আয়াত ৪–৭: মানুষ কষ্টের মধ্যে সৃষ্ট, তবু সে অহংকারী

চতুর্থ আয়াতে শপথের জবাব, 'নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্ট-ক্লেশের মধ্যে (ফী কাবাদ)।' 'কাবাদ' অর্থ কষ্ট, পরিশ্রম, ক্লেশ। দুনিয়ার জীবনই এমন, যেখানে কষ্ট ছাড়া কারও জীবন নেই। রাষ্ট্রপতি, রাজা, মন্ত্রী, ধনী বা গরিব, প্রত্যেকের জীবনেই কোনো না কোনো কষ্ট আছে। শুধু কষ্টের ধরন ও মাত্রা ভিন্ন। ধনীর কষ্ট দুশ্চিন্তা ও দায়িত্বের, গরিবের কষ্ট জীবিকার

সংগ্রামের। জন্মের আগে থেকেই এই কষ্ট শুরু। মায়ের গর্ভে নানা ধাপ পেরোতে হয়, জন্মের কষ্ট আছে। শিশু ক্ষুধা পেলেও বলতে পারে না, কাঁদে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য, প্রতিটি ধাপে একেক রকম পরিশ্রম ও পরীক্ষা। এটি আল্লাহর সৃষ্টিগত বিধান।

আমরা কেউ যদি ভাবি, দুনিয়ায় সব কষ্ট থেকে মুক্ত থাকা যাবে, সেটা ভুল ধারণা। কষ্টহীন জীবন শুধু জান্নাতে, আর সুখহীন শুধু জাহান্নামে। দুনিয়া এই দুইয়ের মাঝামাঝি, এখানে কিছু কষ্ট, কিছু সুখ, কিছু আরাম, কিছু কঠিনতা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুনিয়া মুমিনের জন্য কারাগার আর কাফিরের জন্য জান্নাত (সহীহ মুসলিম)।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে কি মনে করে যে তার ওপর কেউ ক্ষমতা রাখে না?' এখানে মক্কার কাফির নেতা, যেমন আবু জাহল, ওয়ালীদ ও উতবাকে লক্ষ্য করা হয়েছে, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ও সাধারণ মুসলমানদের কষ্ট দিত। তারা ভাবত, আমাদের কে আটকাবে? ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে বলে, আমি প্রচুর সম্পদ উড়িয়ে দিয়েছি (লুবাদা)।' তারা ইসলামের বিরোধিতায় সম্পদ খরচ করে গর্ব করত, বলত, আমি এতো সম্পদ ব্যয় করেছি। সপ্তম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'সে কি মনে করে যে কেউ তাকে দেখেনি?' সে যা বলছে, যে সম্পদ ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যয় করছে, আল্লাহ সবই দেখছেন। তার জবাবদিহি অবশ্যই হবে।

❖ সূরা বালাদ, আয়াত ৮–১০

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُۥ عَيْنَيْنِ ﴿٨﴾

[৮] আমি কি তাকে দেইনি চক্ষুদ্বয়

وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿٩﴾

[৯] জিহবা ও ওষ্ঠদ্বয়

وَهَدَيْنَٰهُ ٱلنَّجْدَيْنِ ﴿١٠﴾

[১০] বস্তুতঃ আমি তাকে দু'টি পথ প্রদর্শন করেছি।

আয়াত ৮–১০: আল্লাহর নিয়ামত: চোখ, জিহ্বা, ঠোঁট ও দুই পথ

অষ্টম আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আমি কি তার জন্য দুটি চোখ সৃষ্টি করিনি?' নবম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট?' এগুলো আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি। আমরা এগুলোর মূল্য বুঝি না, যতক্ষণ না তা হারাই।

চোখের কথাই ভাবুন। সামান্য ধুলোকণা এলেই চোখের পাতা আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে যায়, যেন একটি স্বয়ংক্রিয় ঢাকনা। যদি কিছু চোখে ঢুকেও পড়ে, তা বের করে দেওয়ার জন্য চোখে পানি আসে। এই সূক্ষ্ম সুরক্ষাব্যবস্থা কে তৈরি করেছেন? আমরা মোবাইলের ক্যামেরার

মেগাপিক্সেল দেখে মুগ্ধ হই, অথচ আমাদের চোখ যে কত স্পষ্টভাবে দেখতে সাহায্য করে, তা কি কখনো ভেবে দেখি? কখনো কি আল্লাহর শোকর করেছি যে এই চোখ দিয়ে সন্তানদের মুখ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি?

জিহ্বা আরেক বিস্ময়। মনের ভেতরে একটি কথা আসে, মস্তিষ্ক ঠিক করে কোন ভাষা ও কোন শব্দে তা প্রকাশ করবে, আর জিহ্বা ও ঠোঁট মুহূর্তের মধ্যে তা উচ্চারণ করে ফেলে। জিহ্বা ছাড়া স্পষ্ট কথা বলা যায় না, কথা জড়িয়ে যায়। মিষ্টি, টক, ঝাল, তেতো, সব স্বাদ অনুভব করার ক্ষমতাও এই ছোট্ট মাংসপিণ্ডে। অথচ এত বড় নিয়ামতকে আমরা নিয়ামত মনে করি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে তার দুই চোয়ালের মাঝের বস্তু (জিহ্বা) এবং দুই পায়ের মাঝের বস্তু (লজ্জাস্থান) সম্পর্কে নিশ্চয়তা দেবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দেব (সহীহ বুখারী)। আমাদের পায়ের তলার কথাও ভাবুন। ত্রিশ, পঞ্চাশ বছর হেঁটেও পায়ের তলা বদলাতে হয়নি। জুতার সোল বারবার ক্ষয় হয়, কিন্তু পা ঠিকই আছে।

দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি তাকে দুটি পথ (নাজদাইন) দেখিয়েছি।' 'নাজদ' অর্থ উঁচু পথ। এখানে ভালো ও মন্দের দুটি পথ বোঝানো হয়েছে। আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে ভালো-মন্দের অনুভূতি দিয়েছেন। তিনি কাউকে অন্যায়ভাবে জাহান্নামে দেবেন না। সঠিক পথ বোঝানোর জন্য তিনি কিতাব নাযিল করেছেন, নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, যাঁরা বাস্তবে করে দেখিয়েছেন কীভাবে চলতে হয়।

❖ সূরা বালাদ, আয়াত ১১–১৬

فَلَا ٱقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ ﴿١١﴾

[১১] অতঃপর সে ধর্মের ঘাঁটিতে প্রবেশ করেনি।

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْعَقَبَةُ ﴿١٢﴾

[১২] আপনি জানেন, সে ঘাঁটি কি

فَكُّ رَقَبَةٍ ﴿١٣﴾

[১৩] তা হচ্ছে দাসমুক্তি

أَوْ إِطْعَٰمٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ ﴿١٤﴾

[১৪] অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে অন্নদান।

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴿١٥﴾

[১৫] এতীম আত্মীয়কে

أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ﴿١٦﴾

[১৬] অথবা ধুলি-ধুসরিত মিসকীনকে

আয়াত ১১–১৬: কঠিন গিরিপথ কী?

একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কিন্তু সে গিরিপথে (আকাবা) প্রবেশ করেনি।' 'আকাবা' পাহাড়ের খাড়া চড়াই বা গিরিপথ। এ পথে ওঠা কঠিন, কষ্টকর। কিন্তু যে এই পথ ধরে ওঠে, সে শত্রুর নাগাল থেকে নিরাপদ থাকে। আল্লাহ এখানে একটি রূপক ব্যবহার করে বলছেন, মানুষ ভালো-মন্দ দুটি পথ জানার পরও আখিরাতের নিরাপদ আশ্রয়ের কঠিন পথে ওঠেনি। দ্বাদশ আয়াতে জিজ্ঞেস করা হয়েছে, 'আপনি কি জানেন, গিরিপথ কী?' পরের আয়াতগুলোতে এর উত্তর।

ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'দাসমুক্তি (ফাক্কু রাকাবা)।' গিরিপথে ওঠা যেমন কষ্টসাধ্য, নিজের সম্পদ দিয়ে দাসকে মুক্ত করাও কষ্টকর, কারণ এতে নিজের সম্পদ খরচ করতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি একজন মুসলিম দাসকে মুক্ত করবে, আল্লাহ তার প্রত্যেক অঙ্গের বিনিময়ে মুক্ত দাসের অঙ্গ জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আজ দাসপ্রথা নেই, তবে আলেমগণ এই বিধানের মর্মের সঙ্গে ঋণের দায়ে বন্দি, জুলুমের শিকার বা বিপদগ্রস্ত মানুষকে মুক্ত করার বিষয়টিকেও সম্পর্কিত বলে উল্লেখ করেছেন।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অথবা দুর্ভিক্ষের দিনে খাদ্যদান, নিকটবর্তী ইয়াতীমকে।' 'যী মাসগাবা' অর্থ ক্ষুধার দিন। ক্ষুধার কষ্টের সময় অন্যকে খাওয়ানো সহজ নয়। আর সেখানে নিকটাত্মীয় ইয়াতীমকে খাওয়ানোর কথা আলাদাভাবে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মিসকিনকে সদকা দিলে একটি সওয়াব, আর আত্মীয়কে সদকা দিলে দুটি সওয়াব, সদকার ও আত্মীয়তা রক্ষার (জামে তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী)।

ষোড়শ আয়াতে বলা হয়েছে, 'অথবা ধুলোমলিন মিসকিনকে।' 'যা মাতরাবা' অর্থ ধুলোয় লুটানো, এমন গরিব, যে দারিদ্র্যের কারণে মাটির সঙ্গে মিশে আছে। এই সবই গিরিপথ। সুতরাং গিরিপথ হলো কঠিন কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ের পথ, যার মধ্যে আছে দাসমুক্তি, দুর্ভিক্ষে খাদ্যদান, ইয়াতীম ও অসহায়ের পাশে দাঁড়ানো।

❖ সূরা বালাদ, আয়াত ১৭–২০

ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡمَرۡحَمَةِ ﴿١٧﴾

[১৭] অতঃপর তাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া, যারা ঈমান আনে এবং পরস্পরকে উপদেশ দেয় সবরের ও উপদেশ দেয় দয়ার।

أُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَيۡمَنَةِ ﴿١٨﴾

[১৮] তারাই সৌভাগ্যশালী।

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِـَٔايَٰتِنَا هُمۡ أَصۡحَٰبُ ٱلۡمَشۡـَٔمَةِ ﴿١٩﴾

[১৯] আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করে তারাই হতভাগা।

عَلَيۡهِمۡ نَارٞ مُّؤۡصَدَةُۢ ﴿٢٠﴾

[২০] তারা অগ্নিপরিবেষ্টিত অবস্থায় বন্দী থাকবে।

আয়াত ১৭–২০: ঈমান, পরস্পরের প্রতি উপদেশ ও দুই দলের পরিণতি

সপ্তদশ আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যোগ করা হয়েছে, 'অতঃপর সে অন্তর্ভুক্ত হবে ঈমানদারদের, যারা পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয় এবং দয়ার উপদেশ দেয়।' অর্থাৎ এই সব ভালো কাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ঈমান। ঈমান ছাড়া কোনো আমলই আখিরাতে পুরস্কারের উপযুক্ত নয়। একজন ছাত্র স্কুলে ভর্তি না হয়ে যত পড়াশোনাই করুক, তার পরীক্ষা নেওয়া হবে না। তেমনি ঈমান আল্লাহর কাছে নিবন্ধিত হলে তারপর আমল জমা হয়।

ঈমানের সঙ্গে আরও দুটি গুণ থাকা দরকার। 'তাওয়াসাও বিস সাবর', অর্থাৎ একে অপরকে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেওয়া। আর 'তাওয়াসাও বিল মারহামা', অর্থাৎ একে অপরকে মানুষের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহের উপদেশ দেওয়া। শুধু নিজের ঈমান বাঁচিয়ে রাখা যথেষ্ট নয়। সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ করা, বিপদে একে অপরকে ধৈর্যের কথা বলা, অন্যের প্রতি দয়া করার জন্য উৎসাহিত করা, এই সামাজিক দায়িত্বও মুমিনের।

অষ্টাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'এরাই ডানপন্থী (আসহাবুল মাইমানা)।' এঁদের আমলনামা কিয়ামতের দিন ডান হাতে দেওয়া হবে। ঊনবিংশ আয়াতে, 'আর যারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করেছে, তারা বামপন্থী (আসহাবুল মাশআমা)।' বিংশ আয়াতে, 'তাদের ওপর থাকবে পরিবেষ্টনকারী আগুন (নারুম মু'সাদা)।' চারদিক থেকে আগুন তাদের ঘিরে রাখবে, বের হওয়ার কোনো পথ থাকবে না।

শিক্ষা ও উপদেশ

- দুনিয়ার জীবন কষ্ট ও পরিশ্রমের জীবন। কষ্টহীন জীবনের আশা করা ভুল, আর প্রকৃত বিশ্রাম জান্নাতে।
- আল্লাহর নিয়ামত যেমন চোখ, জিহ্বা, পা, এগুলোর মূল্য আমরা সাধারণত বুঝি না। এই নিয়ামতের শোকর করা ও সঠিক ব্যবহার করা জরুরি।
- আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে ভালো-মন্দের অনুভূতি, কিতাব ও নবী দিয়ে পথ দেখিয়েছেন। কেউ ভুল পথে গেলে তার দায় তার নিজের।
- 'আকাবা' বা কঠিন গিরিপথ হলো কষ্টসাধ্য সৎকাজ: দাসমুক্তি বা বিপদগ্রস্তকে মুক্ত করা, দুর্ভিক্ষে খাদ্যদান, আত্মীয় ইয়াতীম ও দরিদ্র মিসকিনের পাশে দাঁড়ানো।
- সকল সৎকাজ আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ঈমান।
- ঈমানদারদের কর্তব্য, একে অপরকে ধৈর্য ও দয়ার উপদেশ দেওয়া।
- যাদের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে, তারাই সফল। বাম হাতে যারা পাবে, তাদের পরিণতি জাহান্নাম।

অধ্যায় ১৪

সূরা শামস

الشمس

আত্মশুদ্ধিতেই সফলতা

কুরআনের ৯১তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১৫টি

সূরা শামস কুরআনের ৯১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৫। এই সূরার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে। কুরআনের আর কোনো জায়গায় একসঙ্গে এতগুলো শপথ করা হয়নি। আরবি ব্যাকরণের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এখানে এগারোটি বা সাতটি শপথ আছে। যে বিষয়ের গুরুত্ব যত বেশি, বক্তা সেটি তত জোর দিয়ে বলেন। যদিও আল্লাহ তাআলার কথা জোরালো করার জন্য শপথের প্রয়োজন নেই, তবু এতগুলো শপথ প্রমাণ করে, পরবর্তী কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

❖ সূরা শামস, আয়াত ১–৪

وَٱلشَّمۡسِ وَضُحَىٰهَا ﴿١﴾

[১] শপথ সূর্যের ও তার কিরণের

وَٱلۡقَمَرِ إِذَا تَلَىٰهَا ﴿٢﴾

[২] শপথ চন্দ্রের যখন তা সূর্যের পশ্চাতে আসে

وَٱلنَّهَارِ إِذَا جَلَّىٰهَا ﴿٣﴾

[৩] শপথ দিবসের যখন সে সূর্যকে প্রখরভাবে প্রকাশ করে

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰهَا ﴿٤﴾

[৪] শপথ রাত্রির যখন সে সূর্যকে আচ্ছাদিত করে

আয়াত ১–৪: সূর্য, চন্দ্র, দিন ও রাতের শপথ

প্রথম আয়াতে ‘ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা’, সূর্যের ও তার আলোর শপথ। ‘দুহা’ অর্থ সূর্যের উজ্জ্বল আলো। সকালের যে নামাযকে আমরা ‘সালাতুদ দুহা’ বলি, তার নামও এখান থেকে এসেছে। দ্বিতীয় আয়াতে ‘ওয়াল কামারি ইযা তালাহা’, চাঁদের শপথ, যখন তা সূর্যের পেছনে পেছনে আসে। সূর্য অস্ত যায়, চাঁদ উদিত হয়, এক সৃষ্টি যেন আরেক সৃষ্টির অনুসরণ করে।

তৃতীয় আয়াতে 'ওয়ান-নাহারি ইযা জাল্লাহা', দিনের শপথ, যখন তা সূর্যকে প্রকাশ ও উজ্জ্বল করে। চতুর্থ আয়াতে 'ওয়াল-লাইলি ইযা ইয়াগশাহা', রাতের শপথ, যখন তা সূর্যকে ঢেকে দেয়, অর্থাৎ সবকিছু অন্ধকারে ছেয়ে যায়।

❖ সূরা শামস, আয়াত ৫–৭

وَٱلسَّمَآءِ وَمَا بَنَىٰهَا ﴿٥﴾

[৫] শপথ আকাশের এবং যিনি তা নির্মাণ করেছেন, তাঁর।

وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا طَحَىٰهَا ﴿٦﴾

[৬] শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর

وَنَفۡسٖ وَمَا سَوَّىٰهَا ﴿٧﴾

[৭] শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর

আয়াত ৫–৭: আসমান, জমিন ও নফসের শপথ

পঞ্চম আয়াতে 'ওয়াস-সামায়ি ওয়া মা বানাহা'। এখানে 'মা' শব্দের দুটি ব্যাখ্যা আছে। যদি 'মা' মাসদারিয়া (ক্রিয়াবাচক) হয়, তাহলে অর্থ 'আসমানের শপথ এবং তাকে নির্মাণের শপথ'। আর যদি 'মা' মাওসূলা (যিনি) হয়, তাহলে অর্থ 'আসমানের শপথ এবং যিনি তাকে নির্মাণ করেছেন, তাঁর শপথ'। এভাবে এই আয়াতগুলোর শপথের সংখ্যা সাত বা এগারো হয়।

ষষ্ঠ আয়াতে 'ওয়াল-আরদি ওয়া মা তাহাহা', জমিনের শপথ এবং যিনি তাকে বিস্তৃত করেছেন, তাঁর শপথ। সপ্তম আয়াতে 'ওয়া নাফসিন ওয়া মা সাওওয়াহা', প্রাণের (মানুষের আত্মার) শপথ এবং যিনি তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর শপথ। এই শপথগুলোর পরে যে কথাটি বলার জন্য এত আয়োজন, তা আসছে পরের আয়াতে।

❖ সূরা শামস, আয়াত ৮–১০

فَأَلۡهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقۡوَىٰهَا ﴿٨﴾

[৮] অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا ﴿٩﴾

[৯] যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয়।

وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّىٰهَا ﴿١٠﴾

[১০] এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।

আয়াত ৮–১০: আত্মশুদ্ধি, সাফল্যের মূলমন্ত্র

অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'অতঃপর তাকে তার পাপাচার ও তাকওয়ার জ্ঞান (ইলহাম) দিয়েছেন।' 'ইলহাম' অর্থ অন্তরে কিছু ঢেলে দেওয়া। আমরা অনেক সময় অনুভব করি, কোনো প্রিয়জন আসছেন, বা কারও কিছু হয়েছে, কোনো কারণ ছাড়াই মনে ধারণা জাগে। এ-ও আল্লাহর পক্ষ থেকে অন্তরে ঢেলে দেওয়া এক ধরনের বার্তা। মূসা আলাইহিস সালামের মায়ের অন্তরেও আল্লাহ এভাবে বার্তা দিয়েছিলেন (সূরা কাসাস ২৮:৭)। তেমনিভাবে প্রত্যেক মানুষের অন্তরে আল্লাহ ভালো-মন্দের পার্থক্যের একটি সহজাত অনুভূতি দিয়েছেন। মিথ্যা বললে বিবেক খোঁচা দেয়, জুলুম করলে মন অস্বস্তিতে ভোগে।

নবম আয়াতে আসল ঘোষণা, 'যে নিজেকে পরিশুদ্ধ করল, সে-ই সফল।' আর দশম আয়াতে, 'যে নিজেকে কলুষিত করল (দাসসাহা), সে-ই ব্যর্থ।' 'তাযকিয়া' অর্থ পরিশুদ্ধ করা, বিকশিত করা। 'দাসসা' শব্দের অর্থ মাটিতে পুঁতে ফেলা, লুকিয়ে ফেলা। যে ব্যক্তি নিজের অন্তরের হিদায়াতকে গুনাহের নিচে চাপা দিয়ে ফেলে, সে ক্ষতিগ্রস্ত।

আমাদের জীবনে ডাক্তারের একটি সাধারণ পরামর্শও আমরা গুরুত্বের সঙ্গে নিই। তিনি বললে আমরা এটা খাই, ওটা খাই না, কারণ আমাদের স্বাস্থ্য নিয়ে ভাবি। আল্লাহ যখন এতগুলো শপথ করে বলছেন, আত্মশুদ্ধি অর্জনকারী সফল, তখন তা কতটা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া উচিত!

আত্মশুদ্ধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের অন্যতম দায়িত্ব ছিল। কাবা নির্মাণের পর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দোয়া করেছিলেন, হে আমাদের রব, তাদের মধ্যে এমন একজন রাসূল পাঠান, যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াত তিলাওয়াত করবেন, কিতাব ও হিকমত শেখাবেন এবং তাদের পরিশুদ্ধ করবেন (সূরা বাকারা ২:১২৯)। সূরা জুমুআতেও রাসূলের এই চার দায়িত্বের কথা আছে (৬২:২)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে এই দোয়া করতেন, **আল্লাহুম্মা আতি নাফসী তাকওয়াহা ওয়া যাক্কিহা আনতা খাইরু মান যাক্কাহা, আনতা ওয়ালিইয়ুহা ওয়া মাওলাহা**, হে আল্লাহ, আমার নফসকে তাকওয়া দান করুন এবং তাকে পরিশুদ্ধ করুন, আপনিই তার সর্বোত্তম পরিশুদ্ধকারী, আপনিই তার অভিভাবক ও মনিব (সহীহ মুসলিম)।

আত্মশুদ্ধির উপায়

আত্মশুদ্ধির প্রথম উপায় তাকওয়া অবলম্বন করা, অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম মানা ও নিষেধ থেকে বিরত থাকা। আল্লাহ বলেন, যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে, তারাই আল্লাহর বন্ধু (সূরা ইউনুস ১০:৬২–৬৩)। সঙ্গে আরও আছে নিয়মিত যিকির, তাওবা, নিজের আমলের হিসাব নেওয়া (মুহাসাবা) এবং অহংকার, হিংসা, লোভ, রিয়ার মতো অন্তরের রোগ চিহ্নিত করে সেগুলো থেকে বাঁচার চেষ্টা করা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সৎসঙ্গ। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকো (সূরা তাওবা ৯:১১৯)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ তার বন্ধুর দ্বীনের ওপর থাকে, তাই প্রত্যেকের দেখা উচিত সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)। তিনি আরও বলেছেন, ভালো সঙ্গী মিশকবিক্রেতার মতো। হয় সে তোমাকে মিশক দেবে, নয়তো তুমি তার কাছ থেকে কিনবে, অন্তত সুগন্ধ পাবে। আর খারাপ সঙ্গী কামারের হাপরের মতো। হয় সে তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, নয়তো তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

আমাদের আশপাশের পরিবেশ, বন্ধুমহল ও সমাজ আমাদের ঈমান ও আমলের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। যে সমাজে পাঁচ ওয়াক্ত আযান শোনা যায়, মানুষ মসজিদে আসে, নামাযের উৎসাহ দেয়, সেখানে নেক আমল করা সহজ। যেখানে সপ্তাহ চলে যায় আযানের ধ্বনি শোনা যায় না, সেখানে ঈমান ধরে রাখা কঠিন। এজন্য যাঁরা পরিবার নিয়ে নতুন কোথাও স্থায়ী হওয়ার কথা ভাবছেন, তাঁদের উচিত শুধু আরাম-আয়েশ বা আর্থিক সুবিধা নয়, নিজের ঈমান ও সন্তানদের দ্বীনি পরিবেশ রক্ষার বিষয়টিকেও গুরুত্ব দেওয়া। এক প্রজন্ম হয়তো সচেতন থাকে, কিন্তু পরবর্তী প্রজন্ম আশপাশের সংস্কৃতির প্রভাবে ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যেতে পারে। দুনিয়ার জীবন তো অল্প কয়দিনের, কিন্তু আখিরাতের সাফল্য চিরস্থায়ী।

একইভাবে দ্বীনদার ও আল্লাহওয়ালা আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা, তাঁদের কাছে শরীয়তের বিষয়ে পরামর্শ নেওয়া, আত্মশুদ্ধির জন্য উপকারী। আর যারা নামায পড়ে না, দ্বীনচর্চাকে তিরস্কার করে, গুনাহের কাজে জড়িত, তাদের সঙ্গে ওঠাবসা করলে নিজেও সেদিকে ঝুঁকে পড়ার আশঙ্কা থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ যাকে ভালোবাসে, কিয়ামতের দিন তারই সঙ্গে থাকবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

❖ সূরা শামস, আয়াত ১১–১৫

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَىٰهَآ ﴿١١﴾

[১১] সামুদ সম্প্রদায় অবাধ্যতা বশতঃ মিথ্যারোপ করেছিল।

إِذِ ٱنۢبَعَثَ أَشْقَىٰهَا ﴿١٢﴾

[১২] যখন তাদের সর্বাধিক হতভাগ্য ব্যক্তি তৎপর হয়ে উঠেছিল।

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا ﴿١٣﴾

[১৩] অতঃপর আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিলেনঃ আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করানোর ব্যাপারে সতর্ক থাক।

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنۢبِهِمْ فَسَوَّىٰهَا ﴿١٤﴾

[১৪] অতঃপর ওরা তার প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল এবং উষ্ট্রীর পা কর্তন করেছিল। তাদের পাপের কারণে তাদের পালনকর্তা তাদের উপর ধ্বংস নাযিল করে একাকার করে দিলেন।

وَلَا يَخَافُ عُقْبَٰهَا ﴿١٥﴾

[১৫] আল্লাহ তা'আলা এই ধ্বংসের কোন বিরূপ পরিণতির আশংকা করেন না।

আয়াত ১১–১৫: সামূদ জাতি ও উটনির ঘটনা

আত্মকে কলুষিত করার একটি দৃষ্টান্ত আল্লাহ তুলে ধরেছেন সামূদ জাতির মাধ্যমে। একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সামূদ জাতি তাদের সীমালঙ্ঘনের কারণে (সত্যকে) মিথ্যা বলেছিল।' তারা সালেহ আলাইহিস সালামের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিল। তারা আরবের উত্তরাঞ্চলে হিজর (বর্তমান মাদাইনে সালেহ) এলাকায় বাস করত। তারা চ্যালেঞ্জ দিল, আপনি যদি সত্যিই নবী হন, তাহলে এই পাথর থেকে একটি উটনি বের করে দেখান।

এখানে মুজিযা ও জাদুর পার্থক্য বোঝা দরকার। জাদুকর নিজের ইচ্ছামতো জাদু দেখায়। কিন্তু নবী নিজের ইচ্ছায় কোনো মুজিযা দেখাতে পারেন না, কেবল আল্লাহ যখন চান, তখনই তা প্রকাশিত হয়। সালেহ আলাইহিস সালাম আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ রাজি হলেন, তবে শর্ত দিলেন, এরপর ঈমান আনতে হবে। তারপর আল্লাহর কুদরতে পাথর ফেটে একটি বিশাল গর্ভবতী উটনি বেরিয়ে এল। ঈমান আনার বদলে তারা বলল, আপনি বড় জাদুকর। তারা ঈমান আনল না।

উটনি অনেক পানি পান করত। সূরা শুআরায় বলা হয়েছে, আল্লাহ পানির পালা ঠিক করে দিয়েছিলেন, একদিন তার জন্য, আরেকদিন তোমাদের জন্য (২৬:১৫৫)। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাদের মনঃপূত হলো না। তারা উটনিকে হত্যার সিদ্ধান্ত নিল।

দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন তাদের সবচেয়ে হতভাগা ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল।' সে ছিল কুদার ইবনে সালিফ বলে মুফাসসিরগণ উল্লেখ করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন, সে ছিল আবু যামআর মতো শক্তিশালী, সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভাবশালী ও দুর্ধর্ষ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর রাসূল (সালেহ) তাদের বলেছিলেন, আল্লাহর উটনি এবং তার পানি পান করার পালার ব্যাপারে সতর্ক থাকো।' উটনি তাদের চাহিদাতেই এসেছিল, তাই তার নিরাপত্তা রক্ষা তাদের দায়িত্ব ছিল।

চতুর্দশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যা বলল এবং উটনিটির পা কেটে দিল।' আল্লাহ তখন তাদের গুনাহের কারণে তাদের ওপর আযাব নাযিল করে তাদের সমূলে ধ্বংস

করে দিলেন (দামদামা), আর সবাইকে সমান করে দিলেন। এত বিশাল শক্তিশালী জাতিকে ধ্বংস করা আল্লাহর কাছে কোনো বিষয়ই নয়।

পঞ্চদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তিনি এর পরিণতির ভয় করেন না।' অর্থাৎ আল্লাহর ওপর কারও জবাবদিহি নেই। এত বড় জাতিকে ধ্বংস করে তাঁকে এর পরিণতি নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। এটি আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও মহিমার প্রকাশ। আল্লাহ যা করেন, সে সম্পর্কে তাঁকে কেউ প্রশ্ন করতে পারে না।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আল্লাহ প্রত্যেক মানুষের অন্তরে ভালো-মন্দের অনুভূতি দিয়েছেন। এই অনুভূতি অনুযায়ী চলাই বুদ্ধিমত্তা।
- আত্মশুদ্ধিতেই সফলতা, আর আত্মাকে কলুষিত করার মধ্যেই ক্ষতি।
- আত্মশুদ্ধির উপায়: তাকওয়া, যিকির, তাওবা, আত্মসমালোচনা এবং সৎসঙ্গ।
- আমাদের সঙ্গী ও পরিবেশ আমাদের ঈমানের ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। বন্ধু ও পরিবেশ বাছাইয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।
- লোভ, হিংসা, অহংকার, রিয়া, এসব অন্তরের ব্যাধি থেকে নিজেকে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে।
- মুজিযা আল্লাহর ইচ্ছাধীন, নবীর ইচ্ছাধীন নয়। এটি জাদু থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।
- আল্লাহর নিদর্শনকে অস্বীকার ও অবজ্ঞা করার পরিণাম ধ্বংস। সামূদ জাতি তার দৃষ্টান্ত।

অধ্যায় ১৫

সূরা লাইল

الليل

দানশীল ও কৃপণের দুই পরিণতি

কুরআনের ৯২তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ২১টি

সূরা লাইল কুরআনের ৯২তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ২১। সূরার শেষ কয়েকটি আয়াত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কেন্দ্র করে নাযিল হয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এই সূরাকে ‘সূরা আবু বকর’ বললেও অসংগত হতো না।

❖ সূরা লাইল, আয়াত ১–৪

وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ ﴿١﴾

[১] শপথ রাত্রির, যখন সে আচ্ছন্ন করে

وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴿٢﴾

[২] শপথ দিনের, যখন সে আলোকিত হয়

وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلۡأُنثَىٰٓ ﴿٣﴾

[৩] এবং তাঁর, যিনি নর ও নারী সৃষ্টি করেছেন

إِنَّ سَعۡيَكُمۡ لَشَتَّىٰ ﴿٤﴾

[৪] নিশ্চয় তোমাদের কর্ম প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের।

আয়াত ১–৪: রাত, দিন, নারী-পুরুষের শপথ এবং মানুষের বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা

প্রথম আয়াতে আল্লাহ শপথ করেছেন, ‘ওয়াল লাইলি ইযা ইয়াগশা’, রাতের শপথ, যখন তা সবকিছুকে ঢেকে ফেলে। দ্বিতীয় আয়াতে, ‘ওয়ান নাহারি ইযা তাজাল্লা’, দিনের শপথ, যখন তা উদ্ভাসিত হয়। আল্লাহ তাআলা যেখানে কোনো বিষয়ের কথা বলেন, সেখানে তার বিপরীতটিও বলেন। রাতের পাশে তাই দিন।

রাত ও দিনের এই আবর্তন প্রতিদিন চোখের সামনে ঘটে বলে আমরা এর বিস্ময় অনুভব করি না। একটি সূর্য সবকিছুকে আলোকিত করে, আবার অস্ত গিয়ে বিশাল পৃথিবীকে অন্ধকারে ঢেকে দেয়। এই ব্যবস্থাপনা যদি আমাদের ওপর ছেড়ে দেওয়া হতো, তাহলে কেউ পারত না। গভীর

অন্ধকারও মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আমরা ঘুমানোর সময় হালকা আলো জ্বালিয়ে রাখি, যাতে প্রয়োজনে পথ দেখা যায়। আল্লাহ রাতে চাঁদ ও তারকার ব্যবস্থা রেখেছেন। সমুদ্রযাত্রায় নাবিকরা এই আকাশের চিহ্ন দেখেই পথ চেনেন।

তৃতীয় আয়াতে, 'ওয়া মা খালাকায যাকারা ওয়াল উনসা', শপথ তাঁর, যিনি নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করেছেন (বা শপথ নারী ও পুরুষের সৃষ্টির)। এটিও আল্লাহর বিস্ময়কর সৃষ্টি। নারী ও পুরুষের গঠন, শক্তি, দায়িত্ব ভিন্ন, আর এই ভিন্নতার মধ্য দিয়েই আল্লাহ জগৎ পরিচালনা করছেন।

এই তিন শপথের পর চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের প্রচেষ্টা বিভিন্ন ধরনের (লা শাত্তা)।' আমরা প্রত্যেকেই দিনভর কোনো না কোনো কাজে ব্যস্ত। কেউ অফিসে, কেউ ব্যবসায়, কেউ বাজারে। কিন্তু সবার উদ্দেশ্য ও ফলাফল এক নয়। কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ব্যবসা করেন, পরিবারের ভরণপোষণ করেন, আর কেউ কেবল দুনিয়ার পেছনে ছোটেন। বাইরে থেকে দুজনের পরিশ্রম একই মনে হলেও আল্লাহর কাছে তাদের ফল ভিন্ন।

এখানে নিয়তের গুরুত্ব বোঝা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। দুজন মানুষ ভাত খাচ্ছে। একজন ভাবছে, পেট ভরবে, শক্তি পাব। আরেকজন ভাবছে, আল্লাহ আমাকে খেতে বলেছেন, এই শক্তি দিয়ে আমি তাঁর ইবাদত করব, মানুষের সেবা করব। প্রথমজনের খাওয়া শুধু খাওয়াই থাকে, দ্বিতীয়জনের খাওয়া ইবাদত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছিলেন, তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য যা কিছু খরচ করো, তার প্রতিদান পাবে, এমনকি যে লোকমা তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও, তারও (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। যিনি রিযিক অন্বেষণের নিয়তে, পরিবারের হক আদায়ের জন্য ব্যবসা বা কাজ করেন, তাঁর সেই কাজও ইবাদত। আর যে নামায-রোযার মতো ভালো কাজও লোকদেখানো বা সুনামের জন্য করে, তার আমল আখিরাতে কাজে আসে না।

❖ সূরা লাইল, আয়াত ৫–৭

فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ ﴿٥﴾

[৫] অতএব, যে দান করে এবং খোদাভীরু হয়

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

[৬] এবং উত্তম বিষয়কে সত্য মনে করে

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

[৭] আমি তাকে সুখের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।

আয়াত ৫–৭: দানশীল, মুত্তাকীর জন্য সহজ পথ

পঞ্চম থেকে সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘সুতরাং যে দান করে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে, আর উত্তম বিষয়কে (হুসনা) সত্য বলে মেনে নেয়, আমি তার জন্য সহজ পথকে (ইউসরা) সহজ করে দেব।’

এখানে তিনটি গুণ: দান করা, আল্লাহকে ভয় করা এবং ‘হুসনা’কে সত্য মানা। ‘হুসনা’ অর্থ উত্তম। কেউ কেউ বলেছেন, এটি কালেমা বা ইসলাম, কেউ বলেছেন জান্নাত বা আল্লাহর প্রতিশ্রুত প্রতিদান। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীয়ত ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতিকে সত্য বলে মানে এবং সেই পথে চলে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। ‘ইউসরা’ অর্থ সহজতম পথ, অর্থাৎ নেক আমল করা তার জন্য সহজ হয়ে যায়, অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ বাড়ে, আর এর পরিণতি জান্নাত।

❖ সূরা লাইল, আয়াত ৮–১১

وَأَمَّا مَنۢ بَخِلَ وَٱسۡتَغۡنَىٰ ﴿٨﴾

[৮] আর যে কৃপণতা করে ও বেপরওয়া হয়

وَكَذَّبَ بِٱلۡحُسۡنَىٰ ﴿٩﴾

[৯] এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা মনে করে

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلۡعُسۡرَىٰ ﴿١٠﴾

[১০] আমি তাকে কষ্টের বিষয়ের জন্যে সহজ পথ দান করব।

وَمَا يُغۡنِي عَنۡهُ مَالُهُۥٓ إِذَا تَرَدَّىٰٓ ﴿١١﴾

[১১] যখন সে অধঃপতিত হবে, তখন তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না।

আয়াত ৮–১১: কৃপণ ও আত্মগর্বীর কঠিন পথ

অষ্টম থেকে দশম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আর যে কৃপণতা করে, নিজেকে অমুখাপেক্ষী মনে করে এবং উত্তম বিষয়কে মিথ্যা বলে, আমি তার জন্য কঠিন পথকে (উসরা) সহজ করে দেব।’ ‘ইস্তাগনা’ অর্থ নিজেকে আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষী মনে করা, ‘আমার তো সব আছে, আমি কেন নামাযে যাব?’ এভাবে আল্লাহর বিধানকে তুচ্ছ করা, ‘নামায পড়ে কী হবে?’ ‘বাপ-দাদার সূত্রে মুসলমান হয়েছি, এতে এমন কী?’ ‘আমি ইউরোপে জন্মালে অন্য ধর্মের হতাম’ জাতীয় কথা বলে হালকা করে দেখা। যারা এমন মনোভাব রাখে, তাদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের পথ সহজ করে দেবেন।

একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আর যখন সে ধ্বংসের গর্তে পতিত হবে, তার সম্পদ তার কোনো কাজে আসবে না।’ ‘তারাদ্দা’ অর্থ উঁচু থেকে গর্তে পড়ে যাওয়া। মৃত্যুর পর কাফন-

দাফনে সামান্য খরচ হয়, বাকি সব সম্পদ রেখে যেতে হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মৃতের পেছনে তিনটি জিনিস যায়: পরিবার, সম্পদ ও আমল। দুটি ফিরে আসে, একটি থেকে যায়। পরিবার ও সম্পদ ফিরে আসে, শুধু আমল তার সঙ্গে থাকে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। কিয়ামতের দিন সম্পদ দিয়ে মুক্তিপণ দেওয়ার কোনো সুযোগ থাকবে না।

‘সবই তো লেখা আছে’: তাকদীর ও আমল

এই আয়াতগুলো তাকদীর সম্পর্কে একটি প্রসিদ্ধ হাদীসের সঙ্গে জড়িত। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাকী গোরস্তানে একটি জানাযায় বসে ছিলেন, হাতের কাঠি দিয়ে মাটিতে দাগ কাটছিলেন। তিনি বললেন, তোমাদের প্রত্যেকের স্থান জান্নাতে বা জাহান্নামে লিখে দেওয়া হয়েছে। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, তাহলে কি আমরা এর ওপরই নির্ভর করব, আমল ছেড়ে দেব? তিনি বললেন, আমল করো, কারণ প্রত্যেককে সহজ করে দেওয়া হয়, যে কাজের জন্য সে সৃষ্ট। তারপর তিনি এই সূরার ৫–১০ আয়াত তিলাওয়াত করলেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বোঝা দরকার। আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি আপন জ্ঞান অনুযায়ী সবকিছু লিখে রেখেছেন। কিন্তু সেই লেখা আমাদের জন্য ছাড়া নয়। আমরা জানি না, আমাদের নাম কোন তালিকায় আছে। আমাদের সামনে ভালো-মন্দ দুটি পথই খোলা। যে নামাযে যেতে শক্তি পায়, সে মদের আসরে যেতেও শক্তি পায়। তাহলে কেন সে মসজিদের পথ বেছে নেবে না? ‘সবই তো লেখা আছে’ বলে গুনাহের জন্য আল্লাহকে দোষ দেওয়া চরম নির্বুদ্ধিতা। ফেল করা ছাত্র যেমন শিক্ষককে দোষ দিতে পারে না যে আপনি আমার ফেল করার কথা ভেবেছিলেন বলেই ফেল করেছি, তেমনই এই যুক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর জ্ঞান আমাদের ইচ্ছা ও কর্মকে বাধ্য করে না।

আরেকটি দিক হলো ভয় ও আশার ভারসাম্য। শুধু আশা, ‘আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, সব মাফ করে দেবেন’, এই ভেবে গুনাহ চালিয়ে যাওয়া আত্মপ্রতারণা। আল্লাহ বলেছেন, ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর কৌশল থেকে নিশ্চিন্ত হয় না (সূরা আ'রাফ ৭:৯৯)। আবার শুধু ভয়, ‘আমি তো জাহান্নামীই, আমার মাফ নেই’, এটাও ভুল। আল্লাহ বলেছেন, কাফির সম্প্রদায় ছাড়া কেউ আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না (সূরা ইউসুফ ১২:৮৭)। তিনি আরও বলেছেন, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সব গুনাহ ক্ষমা করেন (সূরা যুমার ৩৯:৫৩)। আমরা যেদিকে যাচ্ছি, সেই দিকেই পৌঁছাব। চট্টগ্রামের বাসে উঠে পঞ্চগড় পৌঁছানোর আশা করা বোকামি। জান্নাতের আশা করলে জান্নাতের পথে চলার চেষ্টাও করতে হবে। চেষ্টায় ভুল হলে আল্লাহ ক্ষমা করবেন, কিন্তু চেষ্টাই না করে রহমতের ভরসা করা আত্মপ্রবঞ্চনা।

আমরা যে জন্মগতভাবে মুসলিম পরিবারে, মুসলিম সমাজে জন্মেছি, দ্বীন পালনের সুযোগ আছে, মসজিদে আসার তাওফীক পেয়েছি, এটাও আল্লাহর অনুগ্রহ। এই নিয়ামতের শোকর হলো, সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে জান্নাতের পথে চলা।

❖ সূরা লাইল, আয়াত ১২–১৬

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ ﴿١٢﴾

[১২] আমার দায়িত্ব পথ প্রদর্শন করা।

وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ﴿١٣﴾

[১৩] আর আমি মালিক ইহকালের ও পরকালের।

فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿١٤﴾

[১৪] অতএব, আমি তোমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছি।

لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٥﴾

[১৫] এতে নিতান্ত হতভাগ্য ব্যক্তিই প্রবেশ করবে

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿١٦﴾

[১৬] যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আয়াত ১২–১৬: হিদায়াত আল্লাহর দায়িত্ব ও আগুনের সতর্কবার্তা

দ্বাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই পথ দেখানোর দায়িত্ব আমার।' আল্লাহ নবী-রাসূল ও কিতাব পাঠিয়ে সঠিক পথ স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ত্রয়োদশ আয়াতে, 'আর আখিরাত ও দুনিয়া, সবই আমার।' কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে, সেই সিদ্ধান্ত তাঁরই।

চতুর্দশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং আমি তোমাদের সতর্ক করেছি প্রজ্বলিত আগুন থেকে।' পঞ্চদশ ও ষোড়শ আয়াতে, 'তাতে প্রবেশ করবে না কেউ, সবচেয়ে হতভাগা ছাড়া, যে মিথ্যা বলেছে ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে।' এখানে 'আশকা' (সবচেয়ে হতভাগা) বলতে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামে প্রবেশকারী কাফিরদের বোঝানো হয়েছে। কুরআনে আরও বলা হয়েছে, জাহান্নাম কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে (সূরা বাকারা ২:২৪)।

হতভাগা কে? দুনিয়ায় অভাবে কাটানো মানুষ নয়, সমাজে সম্মান না পাওয়া মানুষও নয়। যার জন্য জান্নাত নির্ধারিত, সে-ই সফল, দুনিয়ায় সে যত অবহেলিতই হোক। আর যে দুনিয়ায় খ্যাতি, ক্ষমতা, সম্পদে ডুবে আছে, মানুষ যার অটোগ্রাফ ও ছবির জন্য সারি দিয়ে দাঁড়ায়, মৃত্যুর পর

ঈমান ছাড়া সে যদি জাহান্নামে যায়, তাহলে তার চেয়ে দুর্ভাগা আর কেউ নেই। বিখ্যাত বা সাধারণ, প্রত্যেককেই একদিন মাটির নিচে যেতে হবে।

❖ সূরা লাইল, আয়াত ১৭–২১

وَسَيُجَنَّبُهَا ٱلْأَتْقَى ﴿١٧﴾

[১৭] এ থেকে দূরে রাখা হবে খোদাভীরু ব্যক্তিকে

ٱلَّذِي يُؤْتِي مَالَهُۥ يَتَزَكَّىٰ ﴿١٨﴾

[১৮] যে আত্মশুদ্ধির জন্যে তার ধন-সম্পদ দান করে।

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُۥ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ﴿١٩﴾

[১৯] এবং তার উপর কারও কোন প্রতিদানযোগ্য অনুগ্রহ থাকে না।

إِلَّا ٱبْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿٢٠﴾

[২০] তার মহান পালনকর্তার সন্তুষ্টি অন্বেষণ ব্যতীত।

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ﴿٢١﴾

[২১] সে সত্বরই সন্তুষ্টি লাভ করবে।

আয়াত ১৭–২১: সবচেয়ে মুত্তাকী ও আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু

সপ্তদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তা থেকে দূরে রাখা হবে সবচেয়ে মুত্তাকীকে (আল-আতকা)।' অষ্টাদশ আয়াতে, 'যে নিজের সম্পদ দান করে আত্মশুদ্ধির জন্য।' ঊনবিংশ আয়াতে, 'আর তার প্রতি কারও এমন কোনো অনুগ্রহ নেই, যার প্রতিদান দিতে হবে।' বিংশ আয়াতে, 'বরং শুধু তার মহান রবের সন্তুষ্টি অন্বেষণের জন্য।' একবিংশ আয়াতে, 'আর অচিরেই সে সন্তুষ্ট হবে।' মুফাসসিরদের সর্বসম্মত মত অনুযায়ী এই আয়াতগুলো আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে নাযিল হয়েছে। তিনি মক্কায় একজন ব্যবসায়ী ছিলেন, আল্লাহ তাঁকে সম্পদ দিয়েছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে যেসব দুর্বল মুসলমান ক্রীতদাসকে নির্যাতন করা হচ্ছিল, তিনি চড়া দামে তাঁদের কিনে মুক্ত করে দিতেন। ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন বিলাল ইবনে রাবাহ, আমির ইবনে ফুহাইরা, যিন্নীরা, নাহদিয়া ও তাঁর কন্যা, উম্মে উবাইসসহ আরও কয়েকজন। বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর মনিব উমাইয়া ইবনে খালাফ মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে শুইয়ে বুকে ভারী পাথর চাপা দিত, আবু বকর তাঁকে কিনে মুক্ত করেন।

বর্ণিত আছে, আবু বকরের পিতা আবু কুহাফা তাঁকে বলেছিলেন, বাবা, তুমি দুর্বলদের কিনে মুক্ত করছ, তার চেয়ে শক্তিশালী যুবকদের কিনে মুক্ত করো, তারা তোমার পক্ষে দাঁড়াবে, তোমাকে রক্ষা করবে। আবু বকর বললেন, আমি যা করছি, তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এই আয়াতগুলো তাঁর এই নিয়তেরই সাক্ষ্য। তিনি কোনো দুনিয়াবী বিনিময়ের আশা করেননি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকরের মর্যাদা সম্পর্কে বলেছেন, আবু বকরের সম্পদ আমার যতটা উপকারে এসেছে, আর কারও সম্পদ ততটা আসেনি (মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ)। তিনি আরও বলেছেন, আমার ওপর যে কারও অনুগ্রহ ছিল, আমি তার বিনিময় দিয়েছি, কেবল আবু বকর ছাড়া। তাঁর প্রতিদান আল্লাহই কিয়ামতের দিন দেবেন (জামে তিরমিযী)।

সহীহ বুখারীর একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ভাষণে বললেন, আল্লাহ এক বান্দাকে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে একটি বেছে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, সে আখিরাত বেছে নিয়েছে। এ কথা শুনে আবু বকর কেঁদে ফেললেন। অন্য সাহাবীরা অবাক হলেন, কেন কাঁদছেন! পরে বোঝা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের ওফাতের ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন, আর আবু বকরই তা সবার আগে বুঝেছিলেন।

আরেক হাদীসে আছে, জান্নাতের বিভিন্ন দরজা আছে। নামাযীকে নামাযের দরজা, রোযাদারকে রাইয়ান নামক দরজা, দানশীলকে সদকার দরজা দিয়ে ডাকা হবে। আবু বকর জিজ্ঞেস করলেন, কেউ কি সব দরজা দিয়ে ডাকা হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, আর আমি আশা করি, তুমি তাঁদের একজন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

আবু বকরের জীবনের শিক্ষা এই সূরার সঙ্গে মিলে যায়। দান করা, আল্লাহকে ভয় করা, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা, এই তিনটি গুণ যাঁর মধ্যে ছিল, তিনি আল্লাহর কাছে সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত হয়েছেন। আমাদের প্রতিদিনের কাজও যদি আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করা হয়, তাহলে তা ইবাদত হয়ে যায়। ঝালমুড়ি বিক্রেতা যদি স্ত্রী-সন্তানের হালাল রিযিকের নিয়তে আওয়াজ দেন, তাঁর সেই কাজও আল্লাহর কাছে ইবাদত হিসেবে গণ্য হতে পারে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- মানুষের প্রচেষ্টা বিভিন্ন, ফলও ভিন্ন। আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়তে করা সাধারণ কাজও ইবাদতে পরিণত হয়।
- যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে ও আল্লাহর বিধানকে সত্য মানে, আল্লাহ তার জন্য নেক আমল সহজ করে দেন।
- কৃপণতা, নিজেকে আল্লাহর প্রতি অমুখাপেক্ষী মনে করা এবং আল্লাহর বিধান অস্বীকার করা কঠিন পথ ডেকে আনে।

- ‘সব তো লেখা আছে’ বলে আমল ছেড়ে দেওয়া ভুল। আমাদের সামনে ভালো-মন্দ দুটি পথই খোলা, আমাদের দায়িত্ব ভালো পথ বেছে নেওয়া।
- ভয় ও আশার ভারসাম্য ঈমানের অংশ। শুধু আশা বা শুধু ভয় ঠিক নয়।
- মৃত্যুর পর সম্পদ কাজে আসে না, সঙ্গে থাকে শুধু আমল।
- আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুর্বল মুসলমানদের মুক্ত করেছেন। আমাদের জন্য তাঁর জীবন অনুসরণীয় আদর্শ।

অধ্যায় ১৬

সূরা দুহা

الضحى

তোমার রব তোমাকে ছেড়ে যাননি

কুরআনের ৯৩তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১১টি

সূরা দুহা কুরআনের ৯৩তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১১। নাযিলের ক্রমের দিক থেকে এটি আনুমানিক এগারোতম সূরা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে একাধিকবার ওহী আসতে দেরি হয়েছিল। প্রথম ওহীর পর কিছুকাল ওহী বন্ধ ছিল, যাকে ‘ফাতরাতুল ওহী’ বলা হয়। ওহী নাযিল হওয়া সহজ ছিল না। আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আপনার ওপর এক ভারী বাণী নাযিল করব (সূরা মুয্যাম্মিল ৭৩:৫)। হাদীসে এসেছে, উটের পিঠে থাকা অবস্থায় ওহী নাযিল হলে উট ভারে বসে পড়ত, আর প্রচণ্ড শীতেও তাঁর শরীর ঘামে ভিজে যেত।

শানে নুযূল

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে জুন্দুব ইবনে সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থতার কারণে এক বা দুই রাত তাহাজ্জুদের জন্য উঠতে পারেননি। তখন এক নারী এসে বলল, মুহাম্মাদ, আমার মনে হয় তোমার শয়তান তোমাকে ছেড়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে সূরা দুহা নাযিল হয়। কোনো কোনো বর্ণনায় এই নারীকে আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল বলা হয়েছে। সে জিবরীল আলাইহিস সালামকে ‘শয়তান’ বলে বিদ্রূপ করেছিল। অসুস্থতা, ওহীর বিরতি আর মুশরিকদের বিদ্রূপ, সব মিলিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মন তখন ভারাক্রান্ত ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সরাসরি সান্ত্বনা দিলেন।

❖ সূরা দুহা, আয়াত ১–৩

وَٱلضُّحَىٰ ﴿١﴾

[১] শপথ পূর্বাহ্নের

وَٱلَّيۡلِ إِذَا سَجَىٰ ﴿٢﴾

[২] শপথ রাত্রির যখন তা গভীর হয়

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ﴿٣﴾

[৩] আপনার পালনকর্তা আপনাকে ত্যাগ করেনি এবং আপনার প্রতি বিরূপও হননি।

আয়াত ১–৩: দুই শপথ ও এক আশ্বাস

প্রথম আয়াতে 'ওয়াদ দুহা', উজ্জ্বল সকালের শপথ। দ্বিতীয় আয়াতে 'ওয়াল লাইলি ইযা সাজা', নিঝুম নিস্তব্ধ রাতের শপথ। 'সাজা' অর্থ স্থির ও শান্ত হয়ে যাওয়া। আল্লাহ দিনের আলো ও রাতের নীরবতার শপথ করে যে কথা বলতে চান, তা তৃতীয় আয়াতে আছে, 'আপনার রব আপনাকে ত্যাগ করেননি এবং আপনার প্রতি অসন্তুষ্টও হননি।'

আপনি হয়তো ভাবছেন, ওহী কেন আসছে না, আমি কি কোনো ভুল করেছি, আল্লাহ কি আমার ওপর অসন্তুষ্ট? আল্লাহ বলছেন, এমন কিছুই নয়। আমি আপনাকে ছাড়িনি এবং আপনার কোনো আচরণে বিরক্তও হইনি। এখানে লক্ষ করুন, আল্লাহ বলেছেন 'আপনার রব'। এই সম্বোধনে গভীর মমতা আছে।

আল্লাহ যেমন তাঁর প্রিয় নবীকে আশ্বস্ত করেছেন, তেমনি যে মুমিন বিপদ-আপদ, দুঃখ, অসুস্থতা বা অভাবের মধ্যে আছেন, তাঁর জন্যও এটি সান্ত্বনার বাণী। বিপদ মানেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নয়। অনেক সময় এটি পরীক্ষা, গুনাহের কাফফারা বা মর্যাদা বৃদ্ধির কারণ।

❖ সূরা দুহা, আয়াত ৪–৫

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ﴿٤﴾

[৪] আপনার জন্যে পরকাল ইহকাল অপেক্ষা শ্রেয়।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ﴿٥﴾

[৫] আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হবেন।

আয়াত ৪–৫: ভবিষ্যতের সুসংবাদ

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর অবশ্যই আপনার জন্য পরবর্তী সময় প্রথম সময়ের চেয়ে উত্তম।' 'আখিরাহ' ও 'উলা' শব্দ দুটির দুটি অর্থ। এক, আখিরাত আপনার জন্য দুনিয়ার চেয়ে অনেক উত্তম। এখানে যে কষ্ট, নিন্দা ও নির্যাতন আপনি ভোগ করছেন, তার প্রতিদান আখিরাতে অনেক বড়। দুই, জীবনের পরবর্তী অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের চেয়ে ভালো হবে। মক্কী জীবনের কষ্টের পর বিজয় ও সাফল্য আসবে। ইতিহাস সাক্ষী, তা-ই ঘটেছিল।

পঞ্চম আয়াতে আরও নিশ্চয়তা, 'আর অচিরেই আপনার রব আপনাকে এমন দান করবেন যে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন।' এই সন্তুষ্টির ব্যাখ্যায় সাহাবী ও মুফাসসিরগণ বিভিন্ন নিয়ামতের কথা বলেছেন, যেমন ইসলামের বিজয়, হাওযে কাওসার, শাফাআত। সহীহ মুসলিমের একটি

হাদীসে আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়া এবং ঈসা আলাইহিস সালামের দোয়া তিলাওয়াত করে হাত তুলে কেঁদে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমার উম্মত, আমার উম্মত!' আল্লাহ জিবরীলকে বললেন, মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং জিজ্ঞেস করো, কেন কাঁদছেন, যদিও তোমার রব ভালোই জানেন। জিবরীল এসে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি যা বলেছিলেন তা জানালেন। আল্লাহ বললেন, জিবরীল, মুহাম্মাদের কাছে যাও এবং বলো, আমি আপনার উম্মতের ব্যাপারে আপনাকে সন্তুষ্ট করব, আপনাকে দুঃখ দেব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি তাঁর উম্মতের নাজাতের মধ্যেই।

আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতিটি বড় কষ্টের পর কিছু না কিছু আনন্দ দান করেছেন। মক্কার নির্যাতন যখন চরমে, তিনি দোয়া করেছিলেন, হে আল্লাহ, উমর ইবনুল খাত্তাব বা আবু জাহল, এই দুজনের একজনের মাধ্যমে ইসলামকে শক্তিশালী করুন (জামে তিরমিযী)। আল্লাহ উমরকে ইসলামে এনে দিলেন। যে উমর তাঁকে হত্যা করতে বেরিয়েছিলেন, তিনি মুসলমান হয়ে ফিরে এলেন। তায়েফে দাওয়াত দিতে গিয়ে তাঁকে পাথর মেরে রক্তাক্ত করা হয়েছিল (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। সেই বেদনার সময় ফেরার পথে নাখলা উপত্যকায় ফজরের নামাযে তাঁর তিলাওয়াত শুনে জিনদের একটি দল ঈমান আনল, যা সূরা জিনে উল্লিখিত (৭২:১–২)। মানুষ ঈমান না আনলেও জিনরা ঈমান আনল। আবার স্ত্রী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা ও চাচা আবু তালিবের মৃত্যুতে যখন তিনি গভীর শোকগ্রস্ত, তখন আল্লাহ তাঁকে ইসরা ও মিরাজের মতো অতুলনীয় সফরের সম্মান দিলেন। এভাবে প্রতিটি কষ্টের পরই কিছু না কিছু সুখ আল্লাহ দান করেছেন।

❖ সূরা দুহা, আয়াত ৬–৮

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَـَٔاوَىٰ ﴿٦﴾

[৬] তিনি কি আপনাকে এতীমরূপে পাননি? অতঃপর তিনি আশ্রয় দিয়েছেন।

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدَىٰ ﴿٧﴾

[৭] তিনি আপনাকে পেয়েছেন পথহারা, অতঃপর পথপ্রদর্শন করেছেন।

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ﴿٨﴾

[৮] তিনি আপনাকে পেয়েছেন নিঃস্ব, অতঃপর অভাবমুক্ত করেছেন।

আয়াত ৬–৮: অতীতের তিন নিয়ামত

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম আয়াতে আল্লাহ তাঁর নবীকে অতীতের তিনটি নিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

প্রথম, 'তিনি কি আপনাকে ইয়াতীম অবস্থায় পাননি, অতঃপর আশ্রয় দেননি?' রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের আগেই পিতা আবদুল্লাহকে হারিয়েছেন। ছয় বছর বয়সে মা আমিনা, আট বছর বয়সে দাদা আবদুল মুত্তালিবের ইন্তেকাল হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি দাদার অন্তরে গভীর স্নেহ ঢেলে দিয়েছিলেন, পরে চাচা আবু তালিবের অন্তরেও। এভাবে সবসময় তাঁর আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছেন।

দ্বিতীয়, 'তিনি কি আপনাকে 'দাল্লান' পাননি, অতঃপর পথ দেখাননি?' 'দাল্লান' শব্দের আভিধানিক অর্থ পথহারা বা অনবহিত। এখানে এর অনুবাদে সতর্ক থাকতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো শিরক বা কুফরে লিপ্ত হননি। এখানে অর্থ হলো, নবুওয়াতের আগে তিনি ওহীর জ্ঞান, কিতাব ও ঈমানের বিস্তারিত বিষয় সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। সূরা শূরায় আল্লাহ বলেছেন, আপনি জানতেন না কিতাব কী এবং ঈমান কী (৪২:৫২)। তারপর আল্লাহ তাঁকে হিদায়াত ও ওহী দান করেছেন।

তৃতীয়, 'তিনি কি আপনাকে নিঃস্ব পাননি, অতঃপর অভাবমুক্ত করেননি?' 'আইল' অর্থ দরিদ্র। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার সঙ্গে বিয়ের পর এবং ব্যবসার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে সচ্ছলতা দিয়েছেন, আর অন্তরের প্রশান্তিও দিয়েছেন।

❖ সূরা দুহা, আয়াত ৯–১১

فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

[৯] সুতরাং আপনি এতীমের প্রতি কঠোর হবেন না

وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾

[১০] সওয়ালকারীকে ধমক দেবেন না।

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

[১১] এবং আপনার পালনকর্তার নেয়ামতের কথা প্রকাশ করুন।

আয়াত ৯–১১: তিন নিয়ামতের বিপরীতে তিন নির্দেশ

আল্লাহ যে তিন নিয়ামত দিয়েছেন, তার প্রতিদানে তিনটি নির্দেশ দিচ্ছেন।

নবম আয়াতে, 'সুতরাং আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না।' আপনি নিজে ইয়াতীম ছিলেন, তাই ইয়াতীমের কষ্ট বোঝেন। 'তাকহার' অর্থ অপমান করা, জবরদস্তি করা। ইয়াতীমের দেখাশোনা করা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতীমের তত্ত্বাবধায়ক জান্নাতে এভাবে থাকব, এই বলে তিনি তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল মিলিয়ে দেখালেন (সহীহ বুখারী)। আমাদের সমাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ইয়াতীমদের

লালন-পালন করে, তাদের খোঁজ নেওয়া উচিত। তবে কিছু ভুয়া প্রতিষ্ঠানও থাকে, তাই যাচাই করে নেওয়া ভালো। কোনো নির্ভরযোগ্য ইয়াতীমখানায় দুজন শিশুর খরচের দায়িত্ব নেওয়াও ইয়াতীমের প্রতি সদাচরণের একটি উত্তম উপায়।

দশম আয়াতে, 'আর প্রার্থীকে ধমক দেবেন না।' 'সাইল' শব্দের দুটি অর্থ। যে সম্পদ চায়, সেই ভিক্ষুক। আর যে জ্ঞান চায়, অর্থাৎ কিছু জানতে চায়। কেউ প্রশ্ন করলে 'এটা জিজ্ঞেস করছ কেন' বলে তাকে ধমক দেওয়া উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে কেউ কিছু চাইলে তিনি দিতেন, না থাকলে নরম ভাষায় বলতেন, পরে এসো। আল্লাহও বলেছেন, যদি তাদের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেই হয়, তবুও তাদের সঙ্গে নম্র ভাষায় কথা বলো (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:২৮)।

আমাদের সমাজে ভিক্ষাকে পেশা বানিয়ে ফেলা মানুষ আছে, এটা বাস্তবতা। ইসলামে প্রয়োজন ছাড়া ভিক্ষা করা নিন্দনীয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সম্পদ বাড়ানোর জন্য মানুষের কাছে চায়, সে মূলত জাহান্নামের অঙ্গার চায় (সহীহ মুসলিম)। তাই সামর্থ্য থাকলে যথাসম্ভব যাচাই করে সত্যিকারের অভাবীদের সাহায্য করা উচিত। তবে একটি সুন্দর দৃষ্টিভঙ্গি আছে। আমরা নিজেরাও আল্লাহর কাছে চাই, অথচ কি আমরা চাওয়ার যোগ্য? যে হাত দিয়ে গুনাহ করি, সেই হাত তাঁর দিকে বাড়াই। কাউকে অনুপযুক্ত মনে হলেও যদি আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু দিই, মনে মনে বলি, হে আল্লাহ, আমিও অনুপযুক্ত, আমাকেও দিয়ে দিন, এই আশা করা যায়। আর না দিলেও কঠোর ব্যবহার না করে নম্রভাবে ফিরিয়ে দেওয়া দরকার।

একাদশ আয়াতে, 'আর আপনার রবের নিয়ামতের কথা বর্ণনা করুন।' 'তাহদীস' অর্থ প্রকাশ করা, আলোচনা করা। আল্লাহ যা দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য তা আলোচনা করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর নিয়ামতের চিহ্ন দেখতে পছন্দ করেন (জামে তিরমিযী)। আমাদের সমস্যা হলো, আমরা বেশি বলি, 'আমার এটা নেই, ওটা নেই'। অথচ মাথা থেকে পা পর্যন্ত, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আল্লাহ যত নিয়ামত দিয়েছেন, তা গুনে শেষ করা যাবে না।

তবে নিয়ামত বর্ণনা যেন অহংকারের সুরে না হয়। উদ্দেশ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, গর্ব নয়। বিনয়ের সঙ্গে বলা, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ আমাকে এটি দিয়েছেন।' আর অহংকারের সুরে 'আমি তো বিশাল সম্পদের মালিক' বলাটা নিয়ামতের স্বীকৃতি নয়, নিজের কৃতিত্ব দাবি করা। কারুন বলেছিল, এ তো আমি আমার জ্ঞানের জোরে পেয়েছি (সূরা কাসাস ২৮:৭৮), আর তার পরিণতি আমাদের জানা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞতা আদায় করে না (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)।

শিক্ষা ও উপদেশ

- বিপদ বা কষ্ট মানেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নয়। আল্লাহ তাঁর বান্দাকে ছেড়ে যান না।
- ধৈর্য ধরলে কষ্টের পর আল্লাহ সুখ দান করেন, যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনে বারবার হয়েছে।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টি তাঁর উম্মতের নাজাতের মধ্যে।
- আল্লাহর অতীত নিয়ামত স্মরণ করা বর্তমান কষ্ট সহ্য করতে সাহায্য করে।
- ইয়াতীমের সঙ্গে সদয় আচরণ করা আমাদের দায়িত্ব।
- যে কিছু চায়, তাকে কঠোরভাবে ফিরিয়ে দিতে নেই, নম্রভাবে সাহায্য করা বা ক্ষমা চাওয়া উচিত।
- আল্লাহর নিয়ামত বিনয় ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা ও প্রকাশ করা উচিত, গর্বের সঙ্গে নয়।

অধ্যায় ১৭

সূরা ইনশিরাহ

الشرح

নিশ্চয়ই কষ্টের সাথেই স্বস্তি আছে

কুরআনের ৯৪তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৮টি

সূরা ইনশিরাহ কুরআনের ৯৪তম সূরা। কোনো কোনো মাসহাফে একে 'আলাম নাশরাহ' বা 'সূরা শারহ' নামেও লেখা হয়েছে। সবগুলোর মূল ধাতু একই (শারহ, অর্থ খুলে দেওয়া বা প্রশস্ত করা)। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা আট। সূরাটি সূরা দুহার পরেই নাযিল হয়েছে এবং এর বিষয়বস্তু সূরা দুহার সঙ্গে অত্যন্ত সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোনো কোনো মুফাসসির বলেছেন, এ দুটি সূরা একসঙ্গে বা কাছাকাছি সময়ে নাযিল হয়েছে। সূরা দুহায় আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তাঁর কিছু নিয়ামতের কথা বলেছিলেন, এই সূরায় আরও কিছু নিয়ামতের কথা বলছেন।

এই সূরা বিশেষভাবে সেই মানুষদের জন্য সান্ত্বনা, যারা দুশ্চিন্তা, মানসিক চাপ ও পেরেশানিতে ভুগছেন। এর অর্থ নিয়ে একটু ভাবলে মনে অনেক সাহস ও আশা ফিরে আসে।

❖ সূরা ইনশিরাহ, আয়াত ১

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴿١﴾

[১] আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দেইনি

আয়াত ১: 'আমি কি আপনার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিইনি?'

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আলাম নাশরাহ লাকা সাদরাক'। 'শারহুস সদর' অর্থ বক্ষ উন্মুক্ত করা। মুফাসসিরগণ এর একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন।

এক, এটি ফেরেশতাদের দ্বারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্ষবিদারণের ঘটনা, যাকে 'শাক্কুস সদর' বলা হয়। সহীহ হাদীস অনুযায়ী এই ঘটনা দুবার ঘটেছিল। প্রথমবার শৈশবে, যখন তিনি হালীমা সা'দিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহার কাছে লালিত হচ্ছিলেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে তাঁর বুক চিরে অন্তর বের করলেন, তা থেকে একটি অংশ বের করে বললেন, এটি তোমার থেকে শয়তানের অংশ। তারপর সেটি সোনার পাত্রে যমযমের পানিতে ধুয়ে যথাস্থানে রেখে দিলেন (সহীহ মুসলিম)। দ্বিতীয়বার ঘটেছিল মিরাজের রাতে (সহীহ বুখারী ও সহীহ

মুসলিম)। এটি আল্লাহর কুদরতের প্রকাশ, যেখানে কোনো সার্জারির যন্ত্র বা রক্তক্ষরণের প্রয়োজন হয়নি।

দুই, এর রূপক অর্থ, আল্লাহ তাঁর অন্তরকে প্রশস্ত ও প্রশান্ত করেছেন। বাংলাতেও আমরা বলি 'দিল খোলা মানুষ' বা 'বড় মনের মানুষ'। যার অন্তর প্রশস্ত, সে কষ্ট ও দুঃখ সহজে বহন করতে পারে। আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন প্রশস্ত অন্তর দান করেছেন, যার ফলে কাফির-মুশরিকদের নির্যাতন ও বিদ্রূপ তিনি ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করেছেন। মূসা আলাইহিস সালামও ফিরআউনের কাছে যাওয়ার আগে দোয়া করেছিলেন, হে আমার রব, আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দিন (সূরা ত্বহা ২০:২৫)। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দিতে চান, তার অন্তর ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন (সূরা আনআম ৬:১২৫)।

❖ সূরা ইনশিরাহ, আয়াত ২–৩

وَوَضَعۡنَا عَنكَ وِزۡرَكَ ٢

[২] আমি লাঘব করেছি আপনার বোঝা

ٱلَّذِيٓ أَنقَضَ ظَهۡرَكَ ٣

[৩] যা ছিল আপনার জন্যে অতিশয় দুঃসহ।

আয়াত ২–৩: 'আর আপনার থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি'

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আমি আপনার থেকে আপনার বোঝা নামিয়ে দিয়েছি, যা আপনার পিঠ ভেঙে দিচ্ছিল।' 'ওয়িযর' অর্থ ভারী বোঝা, 'আনকাযা' অর্থ কোমর ভেঙে দেওয়া। এই বোঝা কী? এখানেও মুফাসসিরদের কয়েকটি ব্যাখ্যা আছে।

এক, দাওয়াতের দায়িত্বের বোঝা। মানুষ ঈমান আনছে না, এই দুশ্চিন্তায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এতটাই ব্যথিত থাকতেন যে আল্লাহ বলেছেন, তারা ঈমান আনছে না বলে আপনি কি নিজেকে শেষ করে ফেলবেন? (সূরা শুআরা ২৬:৩)। আল্লাহ জানিয়ে দিলেন, আপনার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া, হিদায়াতের দায়িত্ব আপনার নয়।

দুই, কুরআন সংরক্ষণের বোঝা। ওহী নাযিল হওয়ার সময় তিনি ভুলে যাওয়ার ভয়ে বারবার আওড়াতেন। আল্লাহ বললেন, এটি সংরক্ষণ ও পাঠ করানো আমার দায়িত্ব (সূরা কিয়ামাহ ৭৫:১৭)।

তিন, আল্লাহর আদেশের গুরুত্ব ও ভয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি চিনতেন, তাই আল্লাহর নির্দেশের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি অনুভব করতেন। সূরা হূদে নির্দেশ এসেছে, আপনাকে যেভাবে আদেশ করা হয়েছে, সেভাবে অবিচল থাকুন (১১:১১২)। এই আয়াতের ভার এত বেশি ছিল যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বলেছেন, হূদ ও তার অনুরূপ সূরাগুলো আমাকে বৃদ্ধ করে দিয়েছে (জামে তিরমিযী)। যিনি আল্লাহকে যত বেশি চেনেন, তাঁর অন্তরে আল্লাহর মহিমার ভয় তত বেশি। আর আমরা আল্লাহর আদেশ অমান্য করেও অনেক সময় অনুতাপ অনুভব করি না, কারণ আমরা তাঁকে যথাযথ চিনি না।

কেউ কেউ বলেছেন, এখানে বোঝা অর্থ কিছু মানবীয় সিদ্ধান্তগত বিচ্যুতি, যা পাপ নয়, কিন্তু উত্তম বিকল্প ছেড়ে অন্য বিকল্প নেওয়ার ধরনের (যেমন সূরা আবাসার ঘটনা)। নবীগণ গুনাহ থেকে মুক্ত, তবু তাঁরা নিজেদের এই সামান্য ত্রুটিকেও অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন। আল্লাহ বলছেন, সেই বোঝা আমি নামিয়ে দিয়েছি।

❖ সূরা ইনশিরাহ, আয়াত ৪

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ﴿٤﴾

[৪] আমি আপনার আলোচনাকে সমুচ্চ করেছি।

আয়াত ৪: ‘আর আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি’

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়া রাফা'না লাকা যিকরাক’। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, আমি যেখানে উল্লিখিত হই, সেখানে আপনিও উল্লিখিত হন। তখন কোনো সামাজিক মাধ্যম ছিল না যে মানুষ ‘ফলোয়ার’ বাড়াবে। কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর নাম এমনভাবে উচ্চ করেছেন যে আজও সারা বিশ্বে প্রতি মুহূর্তে তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে।

ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে এক এলাকার সঙ্গে আরেক এলাকার নামাযের সময়ের কিছু ব্যবধান হয়। একটি মসজিদের আযান শেষ হওয়ার একটু পরেই আরেক মসজিদে আযান শুরু হয়। এভাবে একটি দেশ থেকে আরেকটি দেশে, ধারাবাহিকভাবে সারা পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তে কোথাও না কোথাও ‘আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ’ ধ্বনিত হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নামাযে তাশাহহুদের মধ্যে তাঁর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করি। কালিমা শাহাদাতে আল্লাহর নামের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত। এটি আল্লাহর বিশেষ সম্মান।

❖ সূরা ইনশিরাহ, আয়াত ৫–৬

فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

[৫] নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

إِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

[৬] নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।

আয়াত ৫–৬: ‘নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি আছে’

পঞ্চম ও ষষ্ঠ আয়াত এই সূরার মূল বার্তা। আল্লাহ দুবার বলেছেন, ‘ফা ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা, ইন্না মা'আল উসরি ইউসরা’, নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি রয়েছে, নিশ্চয়ই কষ্টের সঙ্গে স্বস্তি রয়েছে।

আরবি ভাষার দুটি নিয়ম এখানে অর্থকে আরও গভীর করেছে। প্রথম নিয়ম, ‘উসর’ (কষ্ট) শব্দটি ‘আল-’ যুক্ত হয়ে নির্দিষ্ট (মারিফা) এসেছে, আর ‘ইউসর’ (স্বস্তি) শব্দটি ‘আল-’ ছাড়া অনির্দিষ্ট (নাকিরা)। সাধারণত নির্দিষ্ট শব্দের চেয়ে অনির্দিষ্ট শব্দের অর্থ ব্যাপক হয়। অর্থাৎ কষ্ট সুনির্দিষ্ট ও সীমিত, আর স্বস্তি ব্যাপক ও বিস্তৃত।

দ্বিতীয় নিয়ম, একই নির্দিষ্ট শব্দ দুবার এলে দুবারই একই জিনিসকে বোঝায়। আর একই অনির্দিষ্ট শব্দ দুবার এলে সাধারণত দুটি আলাদা জিনিস বোঝায়। এখানে ‘আল-উসর’ দুবারই এসেছে, তাই এটি একটিই কষ্ট। ‘ইউসর’ দুবার এসেছে অনির্দিষ্টভাবে, তাই এটি দুটি স্বস্তি। অর্থাৎ একটি কষ্টের সঙ্গে দুটি স্বস্তি। এই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে বর্ণিত আছে যে ইবনে আব্বাস ও অন্য কয়েকজন বলেছেন, একটি কষ্ট কখনো দুটি স্বস্তির ওপর বিজয়ী হতে পারে না। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন, কষ্ট যদি কোনো গর্তে ঢুকে যায়, স্বস্তি সেই গর্তেও ঢুকে তাকে বের করে আনবে।

‘মা'আ’ শব্দের অর্থ সাথে। এটি ‘পরে’ (বা'দা) নয়। অর্থাৎ কষ্টের সঙ্গেই, কষ্টের ভেতরেই স্বস্তি রয়েছে। বিপদ যখন আসে, তখনই তার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ কিছু স্বস্তিও দিয়ে দেন, যেমন ধৈর্যের তাওফীক, গুনাহের কাফফারা, আল্লাহর নৈকট্য, বিপদ কাটানোর পথ। সূরা তালাকে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ কষ্টের পর স্বস্তি এনে দেবেন (৬৫:৭)।

এখান থেকে একটি ব্যবহারিক শিক্ষাও নেওয়া যায়। কষ্ট এলে আমরা দিশেহারা হয়ে যাই। কিন্তু সেই সংকটের মধ্যেই সমাধানের সূত্র থাকে। একটি দড়িতে জট লেগে গেলে যেখানে পেঁচ আটকেছে, সেখানে হাত দিলেই পুরো জট খোলে। জীবনের সংকটেও ঠিক তেমনি। কেন সমস্যা হলো, কোথায় ভুল হয়েছে, সেখানে মনোযোগ দিলে সমাধানের পথ বের হয়ে আসে। আর যে আল্লাহর দিকে ফেরে, তার জন্য সমাধান সহজ হয়।

❖ সূরা ইনশিরাহ, আয়াত ৭–৮

فَإِذَا فَرَغْتَ فَٱنصَبْ ﴿٧﴾

[৭] অতএব, যখন অবসর পান পরিশ্রম করুন।

وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَٱرْغَب ﴿٨﴾

[৮] এবং আপনার পালনকর্তার প্রতি মনোনিবেশ করুন।

আয়াত ৭–৮: 'অবসর পেলে ইবাদতে নিবিষ্ট হোন'

সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং যখন আপনি অবসর পাবেন, তখন পরিশ্রম করুন।' অষ্টম আয়াতে, 'আর আপনার রবের প্রতিই আগ্রহী হোন।' 'ফারাগতা' অর্থ কোনো কাজ থেকে অবসর পাওয়া। 'ফানসাব' অর্থ পরিশ্রম করা, নিজেকে নিবিষ্ট করা। মুফাসসিরগণ বলেছেন, যখন দাওয়াত, জীবিকা বা ফরয আমল থেকে অবসর পাবেন, তখন নফল ইবাদত, দোয়া ও আল্লাহর যিকিরে নিজেকে নিয়োজিত করুন। আল্লাহর কাছেই আপনার সব আগ্রহ ও আশা নিবদ্ধ করুন। আমাদের অবস্থা হলো, দায়িত্ব থেকে অবসর পেলে আমরা অফিস থেকে ফিরে টিভি খুলে বসি বা মোবাইলের স্ক্রিন স্ক্রল করতে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুটি নিয়ামতের বিষয়ে অনেক মানুষ প্রতারিত, সুস্থতা ও অবসর (সহীহ বুখারী)। অবসর একটি নিয়ামত, আর তা আল্লাহর ইবাদতে ব্যয় করা বুদ্ধিমানের কাজ।

বিপদ এলে আমাদের উচিত নামাযের আশ্রয় নেওয়া। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো (সূরা বাকারা ২:১৫৩)। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কোনো বিষয় চিন্তিত করলে তিনি নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন (সুনানে আবু দাউদ)। অথচ আমাদের অবস্থা উল্টো। বিপদে পড়লে আমরা মসজিদ থেকে আরও দূরে সরে যাই।

এই সূরা মানসিক চাপ ও উদ্বেগে আক্রান্ত মানুষের জন্য আশার বার্তা। তবে এখানে একটি কথা স্পষ্ট করে বলা ভালো। দীর্ঘস্থায়ী গভীর বিষণ্নতা বা উদ্বেগ থাকলে আল্লাহর ওপর ভরসার পাশাপাশি যোগ্য চিকিৎসক বা মনোরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি। চিকিৎসা গ্রহণ তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়, বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চিকিৎসা নিতে উৎসাহিত করেছেন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আল্লাহ তাঁর বান্দার অন্তর প্রশস্ত করে দিতে পারেন, যাতে সে দুঃখ-কষ্ট সহজে বহন করে।
- দাওয়াতদাতার দায়িত্ব পৌঁছে দেওয়া। কাউকে হিদায়াত দেওয়া আল্লাহর কাজ। এই বোঝা আল্লাহ নামিয়ে দিয়েছেন।
- আল্লাহর আদেশ যত বেশি জানা যায়, তার গুরুত্ব তত বেশি অনুভব করা যায়।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম আল্লাহর নামের সঙ্গে সারা বিশ্বে প্রতিনিয়ত উচ্চারিত হচ্ছে।
- কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে। একটি কষ্টের বিপরীতে একাধিক স্বস্তি আল্লাহ রেখেছেন। বিপদে হতাশ হওয়ার কোনো কারণ নেই।

- সংকটের মধ্যে সমাধানের সূত্র আছে। সংকটে মনোযোগ ও ধৈর্য দরকার।
- দায়িত্ব থেকে অবসর পেলে সেই সময় ইবাদত, দোয়া ও যিকিরে কাজে লাগানো উচিত।
- বিপদে নামাযের আশ্রয় নেওয়া সুন্নাত। এর সঙ্গে প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়াও জরুরি।

অধ্যায় ১৮

সূরা তীন

التين

মানুষকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করা হয়েছে

কুরআনের ৯৫তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৮টি

সূরা তীন কুরআনের ৯৫তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, নাযিলের ক্রমে আনুমানিক ২৮তম। আয়াত সংখ্যা আট। বারা ইবনে আযিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, তিনি একবার সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইশার নামাযে সূরা তীন তিলাওয়াত করতে শুনেছেন, আর তাঁর চেয়ে সুন্দর কণ্ঠ বা তিলাওয়াত আর কারও শোনেননি (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

❖ সূরা তীন, আয়াত ১–৩

وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ ﴿١﴾

[১] শপথ আঞ্জীর (ডুমুর) ও যয়তুনের

وَطُورِ سِينِينَ ﴿٢﴾

[২] এবং সিনাই প্রান্তরস্থ তূর পর্বতের

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ﴿٣﴾

[৩] এবং এই নিরাপদ নগরীর।

আয়াত ১–৩: চার শপথ

সূরার শুরুতে চারটি শপথ আছে: ‘ওয়াত-তীনি’ (ডুমুরের শপথ), ‘ওয়ায-যাইতূনি’ (জলপাইয়ের শপথ), ‘ওয়া তূরি সীনীন’ (সিনাই পর্বতের শপথ) এবং ‘ওয়া হাযাল বালাদিল আমীন’ (এই নিরাপদ নগরীর শপথ)।

প্রথম দুটি দুটি ফলের নাম। আরবিতে ‘তীন’ অর্থ ডুমুর বা আঞ্জির, ‘যাইতূন’ অর্থ জলপাই। দুটিই অত্যন্ত উপকারী ও পুষ্টিকর ফল। আল্লাহ এগুলোর মধ্যে মানুষের জন্য অনেক কল্যাণ রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জলপাইয়ের তেল সম্পর্কে বলেছেন, তোমরা জয়তুনের তেল খাও এবং গায়ে মাখো, কারণ তা বরকতময় গাছ থেকে আসে (জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ)।

কোনো কোনো মুফাসসির আরেকটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, এই চারটি শপথ মূলত বড় বড় নবীদের সঙ্গে সম্পর্কিত স্থানের শপথ। ডুমুর ও জলপাই উৎপন্ন হয় যে এলাকায়, সেই শাম ও ফিলিস্তিন অঞ্চল, যা ঈসা আলাইহিস সালাম ও অন্যান্য নবীর স্থান। সিনাই পর্বত মূসা আলাইহিস সালামের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেখানে তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। আর নিরাপদ নগরী মক্কা, যেখানে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লালন-পালন ও ওহী নাযিলের সূচনা হয়েছে। ইবরাহীম আলাইহিস সালামও শাম থেকে মক্কায় হিজরত করেছিলেন। এভাবে বহু নবীর স্মৃতিবিজড়িত স্থান ও নিয়ামতের শপথ করা হয়েছে। দুটি ব্যাখ্যা পরস্পরবিরোধী নয়, কুরআনের একই আয়াত থেকে একাধিক অর্থ নেওয়া যায়।

❖ সূরা তীন, আয়াত ৪–৫

لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

[৪] আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতর অবয়বে।

ثُمَّ رَدَدْنَٰهُ أَسْفَلَ سَٰفِلِينَ ﴿٥﴾

[৫] অতঃপর তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নীচ থেকে নীচে।

আয়াত ৪–৫: সর্বোত্তম গঠন এবং নিচুদের নিচে নেমে যাওয়া

এই চার শপথের পর আল্লাহ বলছেন, ‘নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে (আহসানি তাকওয়ীম)।’ আমাদের প্রত্যেকের দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বুদ্ধি, সবকিছুই এক অনুপম গঠন। অধিকাংশ প্রাণীর মাথা নিচু অবস্থায় থাকে, কিন্তু মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়ায়, মাথা উঁচু রাখে, আর সেই মাথা কেবল আল্লাহর সামনে সিজদায় নত করে।

আমাদের দেহের গঠন নিয়ে ভাবলে অবাক হতে হয়। চোখ দিয়ে আমরা অগণিত রং দেখি, নাক দিয়ে বিচিত্র ঘ্রাণ অনুভব করি, জিহ্বা দিয়ে নানা স্বাদ নিই, কথা বলি। নাক প্রতি মুহূর্তে বাতাস ছেঁকে ভেতরে পাঠায়, জীবাণু আটকায়। শরীর নিজেই ক্ষতিকর পদার্থ বের করে দেয়। এসব আমরা এত সহজে পেয়ে যাই যে এর মূল্য বুঝি না। যদি শোনা যেত, কারও কাছে এমন একটি জিহ্বা আছে, যা দিয়ে সব স্বাদ চেনা যায় এবং তা কোটি টাকায় বিক্রি হচ্ছে, তাহলে আমরা এর গুরুত্ব বুঝতাম। অথচ আল্লাহ তা আমাদের সবাইকে দিয়ে রেখেছেন।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘অতঃপর আমি তাকে ফিরিয়ে দিয়েছি নিচুদের নিচে (আসফালা সাফিলীন)।’ এর দুটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথম, যারা এই সুন্দর গঠন ও বুদ্ধি-বিবেক পেয়েও আল্লাহর অবাধ্য হয়, ঈমান আনে না, আমলে সালেহ করে না, তাদের আল্লাহ জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে পৌঁছে দেবেন। মুজাহিদ ও হাসান বসরী রাহিমাহুমাল্লাহ থেকে এই ব্যাখ্যা বর্ণিত আছে। দ্বিতীয়, মানুষ সুঠাম, শক্তিশালী ও সুন্দর শরীর নিয়ে জন্মে, কিন্তু ধীরে ধীরে বার্ধক্যে দুর্বল, অক্ষম ও

পরনির্ভর হয়ে পড়ে। ইকরিমা রাহিমাহুল্লাহ এ কথা বলেছেন। এই ব্যাখ্যায় আল্লাহ তাঁর কুদরতের প্রতি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছেন। যে শক্তির গর্বে মানুষ অবাধ্য হয়, সেই শক্তি একসময় থাকবে না। আমরা প্রতিদিন এর নমুনা দেখি। কত সুস্থ মানুষ বিছানায় পড়ছে, কত শক্তিশালী মানুষ দুর্বল হচ্ছে, কত জীবিত মানুষ মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। এই পরিবর্তন আমাদের জন্য সতর্কবার্তা।

❖ সূরা তীন, আয়াত ৬

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَلَهُمۡ أَجۡرٌ غَيۡرُ مَمۡنُونِۭ ٦

[৬] কিন্তু যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্যে রয়েছে অশেষ পুরস্কার।

আয়াত ৬: ব্যতিক্রম, ঈমান ও আমলে সালেহ

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'তবে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান (আজরুন গাইরু মামনূন)।' 'গাইরু মামনূন'-এর দুটি অর্থ। এক, যা কখনো শেষ হবে না, নিরবচ্ছিন্ন। দুই, যার সঙ্গে কোনো খোঁটা দেওয়া হবে না। আল্লাহ কখনো বলবেন না, আমি তোমাকে এটা দিয়েছি। সম্মানের সঙ্গে তাদের প্রতিদান দেওয়া হবে।

এখানে ঈমানের সঙ্গে আমলে সালেহর শর্ত আছে। আমলে সালেহ কী? আলেমগণ বলেছেন, কোনো আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়। এক, তা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হতে হবে (ইখলাস)। দুই, তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী হতে হবে (সুন্নাহর অনুসরণ)। আল্লাহ বলেছেন, যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে (সূরা কাহফ ১৮:১১০)। নামায পড়ছি, কিন্তু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নয়, লোক-দেখানোর জন্য, এটা রিয়া বা ছোট শিরক। আবার আল্লাহর জন্যই পড়ছি, কিন্তু পদ্ধতিতে সুন্নাহর বাইরে গিয়ে, যেমন চার রাকাতের জায়গায় ছয় রাকাত, এটাও আমলে সালেহ নয়।

অনেকে বলেন, আমার ঈমান আছে, আমল না করলেও আল্লাহ ক্ষমাশীল, তিনি মাফ করে দেবেন। এটি ঈমানের দুর্বলতার লক্ষণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত নামায কাযা করেননি। অসুস্থ অবস্থায় সাহাবীদের কাঁধে ভর করে মসজিদে এসেছেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল তিনি কি জানতেন না? অবশ্যই জানতেন। আল্লাহ বান্দার চেষ্টা দেখবেন। যা পারেনি, সেখানে ক্ষমা করবেন। কিন্তু সাধ্যমতো আল্লাহর আদেশ পালনে নিজেকে নিয়োজিত করতে হবে।

❖ সূরা তীন, আয়াত ৭–৮

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِٱلدِّينِ ﴿٧﴾

[৭] অতঃপর কেন তুমি অবিশ্বাস করছ কেয়ামতকে

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَحْكَمِ ٱلْحَٰكِمِينَ ﴿٨﴾

[৮] আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্টতম বিচারক নন

আয়াত ৭–৮: বিচার দিবস অস্বীকারের কারণ নেই

সপ্তম আয়াতে প্রশ্ন, 'অতঃপর কীসে তোমাকে এর পরও বিচার দিবসকে অস্বীকার করতে প্ররোচিত করে?' মুফাসসিরগণ এর দুটি অর্থ করেছেন। এক, আয়াতে মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। এত নিদর্শন দেখে, নিজের সুন্দর গঠন ও ধাপে ধাপে বার্ধক্য ও মৃত্যুর দিকে এগোনো দেখে, কীসে তোমাকে বিচার দিবসকে অস্বীকার করতে উৎসাহিত করে? দুই, এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আপনার আনীত দ্বীন ও বিচারব্যবস্থাকে এখনো কে অস্বীকার করতে পারে? 'দ্বীন' শব্দের অর্থ বিচার, প্রতিদান বা ধর্ম।

অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন (আহকামুল হাকিমীন)?' এর দুটি অর্থ। 'হাকিম' অর্থ বিচারক, আবার প্রজ্ঞাবান। সুতরাং আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞার অধিকারী। কুরআনের সৌন্দর্য এই যে একই আয়াত থেকে একাধিক অর্থ নেওয়া যায়।

আবু দাউদ ও তিরমিযীতে একটি বর্ণনায় এসেছে, কেউ এই আয়াত পাঠ করলে যেন বলে, 'বালা ওয়া আনা আলা যালিকা মিনাশ শাহিদীন', হ্যাঁ, আমি এ বিষয়ে সাক্ষীদের একজন। তবে এই বর্ণনার সনদে দুর্বলতা আছে। তাই নামাযের মধ্যে এটিকে সুন্নাত মনে করার প্রয়োজন নেই, নামাযের বাইরে বললে কোনো সমস্যা নেই।

জন্মগত প্রতিবন্ধিতার প্রশ্ন

কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, আল্লাহ যদি সবাইকে সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেন, তাহলে কেউ কেন জন্মান্ধ বা প্রতিবন্ধী হয়? এর উত্তর হলো, আল্লাহ সবাইকে নিয়ামত দেন, তবে কাউকে কাউকে বিশেষ পরীক্ষায় ফেলেন। যাঁরা এই পরীক্ষায় ধৈর্য ধরেন, তাঁদের জন্য আখিরাতে বিশেষ প্রতিদান আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ বলেন, আমি যদি আমার বান্দাকে তার প্রিয় দুটি জিনিস (দুই চোখ) দিয়ে পরীক্ষা করি, আর সে ধৈর্য ধরে, তাহলে এর বিনিময়ে আমি তাকে জান্নাত দেব (সহীহ বুখারী)। একবার এক নারী এসে বললেন, আমার মূর্ছা রোগ হয়, আর তখন আমার শরীর খুলে যায়, আমার জন্য দোয়া করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি চাইলে ধৈর্য ধরো, তোমার জন্য জান্নাত। আর চাইলে আমি দোয়া করি, আল্লাহ তোমাকে সুস্থ করবেন। তিনি ধৈর্য ধরাই বেছে নিলেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ

মুসলিম)। কাজেই কারও শারীরিক সীমাবদ্ধতা তাঁর মর্যাদা কমায় না, আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা আমলের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

আমাদের সুস্থ দেহ ও সুন্দর গঠন আল্লাহর অনুগ্রহ। এই নিয়ামতের শোকর হলো, এই সুস্থতা ও শক্তি দিয়ে আল্লাহর আনুগত্য করা এবং জান্নাতের পথে চলা।

শিক্ষা ও উপদেশ

- মানুষকে আল্লাহ সর্বোত্তম গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর দেওয়া প্রতিটি অঙ্গ ও যোগ্যতা অমূল্য নিয়ামত।
- যে সুন্দর গঠন ও বুদ্ধি পেয়েও আল্লাহর অবাধ্য হয়, সে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরের উপযুক্ত।
- শক্তি, সুস্থতা ও যৌবন চিরস্থায়ী নয়। বার্ধক্য ও মৃত্যুর দিকে আমরা প্রতিদিন এগোচ্ছি।
- আমলে সালেহর দুটি শর্ত: ইখলাস এবং সুন্নাহর অনুসরণ।
- ঈমান থাকলেই আমল ছেড়ে দেওয়া যায় না। আল্লাহর ক্ষমার আশা রাখার পাশাপাশি সাধ্যমতো আমল করতে হবে।
- আল্লাহ শ্রেষ্ঠ বিচারক ও সর্বোত্তম প্রজ্ঞাবান। কিয়ামতের বিচারে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।
- প্রতিবন্ধিতা বা অক্ষমতা আল্লাহর পরীক্ষা। ধৈর্যধারণকারীদের জন্য আখিরাতে বিশেষ প্রতিদান আছে।

অধ্যায় ১৯

সূরা আলাক

العلق

কুরআনের প্রথম নাযিলকৃত আয়াত ও অহংকারীর পরিণতি

কুরআনের ৯৬তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১৯টি

সূরা আলাক কুরআনের ৯৬তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১৯। এর প্রথম পাঁচ আয়াত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিলকৃত সর্বপ্রথম আয়াত। আর পূর্ণাঙ্গ সূরা হিসেবে সবার আগে নাযিল হয়েছে সূরা ফাতিহা, এটিই প্রসিদ্ধ মত। এই সূরার বাকি অংশ, অর্থাৎ ৬ থেকে ১৯ আয়াত, অনেক পরে নাযিল হয়েছে।

নবুওয়াতের সূচনা: হেরা গুহার ঘটনা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চল্লিশ বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন। এর আগে তিনি ছিলেন পুরো সমাজে ‘আল-আমীন’ (বিশ্বস্ত) হিসেবে পরিচিত। নবুওয়াতের আগেও তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি, মদ পান করেননি, জুয়া বা অন্যান্য জাহিলী কাজে জড়াননি। আল্লাহ তাঁকে এসব থেকে হেফাজত করেছেন। তিনি দেখতেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নির্মিত ঘরকে কেন্দ্র করে মানুষ তিন শো ষাটটি মূর্তির পূজা করছে। এটি তাঁকে গভীরভাবে ভাবাত। এক পর্যায়ে তাঁর মনে নির্জনতার আগ্রহ জন্মাল। তিনি মক্কার কাছে হেরা গুহায় গিয়ে দিনের পর দিন একাকী ইবাদত ও চিন্তায় কাটাতে শুরু করলেন। খাবার ফুরিয়ে গেলে ঘরে ফিরে আসতেন, আবার খাবার নিয়ে যেতেন। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা কখনো তাঁকে বাধা দেননি, তিনি বুঝতেন যে তাঁর স্বামী কোনো সাধারণ মানুষ নন।

সহীহ বুখারীর তৃতীয় হাদীসে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, ওহীর সূচনা হয়েছিল ‘সত্য স্বপ্ন’ দিয়ে। তিনি যে স্বপ্ন দেখতেন, সকালের আলোর মতো তা বাস্তবে ঘটত। এভাবে ছয় মাস কাটল। এ কারণেই বলা হয়, সত্য স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ (সহীহ বুখারী)। কারণ নবুওয়াতের মোট সময় ছিল তেইশ বছর, আর ছয় মাস তার ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

একদিন হেরা গুহায় তাঁর কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম এলেন এবং বললেন, ‘ইকরা’, পড়ো। তিনি বললেন, ‘আমি তো পড়তে জানি না।’ জিবরীল তাঁকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন এমনভাবে যে তাঁর কষ্ট হলো, তারপর ছেড়ে দিয়ে আবার বললেন, পড়ো। একই উত্তর। এভাবে

তিনবার। তৃতীয়বারের পর জিবরীল পড়লেন, 'ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক' থেকে 'মা লাম ইয়ালাম' পর্যন্ত পাঁচটি আয়াত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কম্পিত বুকে ঘরে ফিরলেন এবং খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, আমাকে চাদরে ঢেকে দাও, আমাকে চাদরে ঢেকে দাও। ভয় কেটে গেলে তিনি ঘটনা খুলে বললেন এবং আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, আমি আমার জীবনের ব্যাপারে ভয় পাচ্ছি। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহা অত্যন্ত প্রজ্ঞার সঙ্গে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, কখনোই নয়, আল্লাহর শপথ, আল্লাহ আপনাকে কখনো লাঞ্ছিত করবেন না। কারণ আপনি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, অন্যের বোঝা বহন করেন, নিঃস্বদের উপার্জনে সাহায্য করেন, অতিথির সেবা করেন, আর সত্যের বিপদ-আপদে সহায়তা করেন। এমন গুণের মানুষ আল্লাহর কাছে অপমানিত হয় না।

এরপর খাদীজা তাঁকে নিয়ে তাঁর চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবনে নওফেলের কাছে গেলেন। তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, হিব্রু ভাষায় ইনজীল লিখতেন, বৃদ্ধ ও অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। সব শুনে ওয়ারাকা বললেন, এ সেই 'নামূস', যে ফেরেশতা মূসা আলাইহিস সালামের কাছে এসেছিলেন। হায়, আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম, যেদিন আপনার কওম আপনাকে বের করে দেবে! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবাক হয়ে বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দেবে? যে মানুষকে সবাই ভালোবাসত, বিশ্বাস করে আমানত রাখত, তাঁকে বের করে দেওয়ার কথা তিনি ভাবতেই পারছিলেন না। ওয়ারাকা বললেন, হ্যাঁ, আপনি যা নিয়ে এসেছেন, তা নিয়ে যিনিই এসেছেন, তাঁর সঙ্গেই শত্রুতা করা হয়েছে। এর কিছুদিন পরই ওয়ারাকা ইন্তেকাল করেন। কিছু সময়ের জন্য ওহী বন্ধ থাকে। তারপর সূরা মুদ্দাসসিরের প্রথম আয়াতগুলো নাযিল হয় (সহীহ বুখারী)।

❖ সূরা আলাক, আয়াত ১–৫

ٱقۡرَأۡ بِٱسۡمِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ١

[১] পাঠ করুন আপনার পালনকর্তার নামে যিনি সৃষ্টি করেছেন

خَلَقَ ٱلۡإِنسَٰنَ مِنۡ عَلَقٍ ٢

[২] সৃষ্টি করেছেন মানুষকে জমাট রক্ত থেকে।

ٱقۡرَأۡ وَرَبُّكَ ٱلۡأَكۡرَمُ ٣

[৩] পাঠ করুন, আপনার পালনকর্তা মহা দয়ালু

ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱلْقَلَمِ ﴿٤﴾

[৪] যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন

عَلَّمَ ٱلْإِنسَٰنَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

[৫] শিক্ষা দিয়েছেন মানুষকে যা সে জানত না।

আয়াত ১–৫: 'পড়ুন আপনার রবের নামে'

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'ইকরা বিসমি রব্বিকাল্লাযী খালাক', পড়ুন আপনার সেই রবের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। ইসলামের প্রথম নির্দেশ 'পড়ো'। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, শুধু 'ইকরা' বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'বিসমি রব্বিক', তোমার রবের নামে। যেকোনো জায়গা থেকে, যেকোনো কিছু পড়ার কথা নয়। এমন জ্ঞান অর্জন করতে হবে, যার মাধ্যমে আল্লাহকে চেনা যায়, সত্য-মিথ্যা আলাদা করা যায়। 'রব' শব্দের মধ্যে লালন-পালনের অর্থ আছে। যিনি আমাদের লালন করেন, তাঁর নামে শুরু করেই আমাদের জ্ঞান অর্জন শুরু হবে।

আমাদের দুর্ভাগ্য, আমরা এই প্রথম নির্দেশকেই অনেকাংশে অবহেলা করি। সন্তানদের জন্য আমরা সবচেয়ে ভালো স্কুলের খোঁজ করি, ইংরেজি শেখাতে প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা শিক্ষককে দিতে প্রস্তুত থাকি, কিন্তু কুরআন শেখানোর জন্য এক হাজার টাকার শিক্ষক খুঁজি, সম্ভব হলে বিনা পারিশ্রমিকে। যে জ্ঞানের মাধ্যমে আখিরাতে সফল হওয়া যায়, তার প্রতি আমাদের বিনিয়োগ কত কম! আবার নিজের জন্যও আমরা ভাবি না। সন্তানকে কুরআন শেখাতে চাই, কিন্তু নিজে পড়তে পারি কি না, স্ত্রী পারেন কি না, মা-বাবা শুদ্ধ করে পড়তে পারেন কি না, সে খোঁজ রাখি না। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা নিজেদের ও পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও (সূরা তাহরীম ৬৬:৬)। শুরুটা নিজের থেকে।

আরও একটি বিষয়। কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্য আসেনি। যদি তা-ই হতো, মক্কার মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরোধিতা করত না। তিনি নীরবে সাহাবীদের নিয়ে তিলাওয়াত করতেন, কেউ আপত্তি করত না। কিন্তু যখন তিনি কুরআনের বাণী, একত্ববাদ ও মূর্তিপূজার অসারতা মানুষের কাছে পৌঁছাতে শুরু করলেন, তখনই বিরোধিতা শুরু হলো। তাই কুরআনের তিলাওয়াত যেমন জরুরি, বোঝা ও আমল করাও তেমনি জরুরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যে কুরআন শেখে এবং অন্যকে শেখায় (সহীহ বুখারী)। তিনি আরও বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরয (সুনানে ইবনে মাজাহ)। নিরক্ষরতা দূর করা এবং শেখার সংস্কৃতি তৈরি করা মুসলিম সমাজের দায়িত্ব। অনেকে সারাদিন শুধু ভিডিও ও বক্তব্য শোনে, নিজে বই পড়ে না। শোনাও উপকারী, কিন্তু পড়া ও লিখে রাখার একটি আলাদা গভীরতা আছে। আমাদের

ঘরে ছোট একটি ইসলামী পাঠাগার থাকা উচিত, যেখানে তাফসীর, হাদীস, সীরাত ও দ্বীনি বিষয়ের নির্ভরযোগ্য বই থাকবে এবং নিয়মিত পাঠ হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'খালাকাল ইনসানা মিন আলাক', তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন 'আলাক' থেকে। 'আলাক' শব্দের অর্থ জমাট রক্ত, যা ঝুলে বা লেগে থাকে। সূরা মুমিনূনে মানুষ সৃষ্টির ধাপগুলো বর্ণিত হয়েছে: মাটির নির্যাস, বীর্য, আলাক, মাংসপিণ্ড, অস্থি, অস্থিতে মাংসের আবরণ (২৩:১২–১৪)। এখানে একটি ধাপ উল্লেখ করা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে। আর মাটি থেকে উৎপন্ন খাদ্য থেকেই আমাদের শরীরে বীর্য ও পরবর্তী ধাপগুলো তৈরি হয়। কত তুচ্ছ বস্তু থেকে আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, অথচ সেই মানুষ নিজেকে বড় মনে করে অহংকার করে।

তৃতীয় আয়াতে আবার বলা হয়েছে, 'ইকরা ওয়া রব্বুকাল আকরাম', পড়ুন, আর আপনার রব মহামহিম। 'আকরাম' অর্থ সর্বাধিক দানশীল ও সম্মানিত। তিনি চাওয়ার আগেই দেন, প্রয়োজনের চেয়ে বেশি দেন।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাযী আল্লামা বিল কালাম', যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। কলম জ্ঞান সংরক্ষণ ও প্রচারের প্রধান মাধ্যম। হাদীসে আছে, আল্লাহ সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে লিখতে বললেন (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)। সেই কলমে তিনি সবকিছুর তাকদীর লিখে রেখেছেন। সূরা কালামও এই শপথ দিয়ে শুরু হয়েছে (৬৮:১)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে নিরক্ষর (উম্মী) ছিলেন, এটিও কুরআনের সত্যতার একটি প্রমাণ (সূরা আ'রাফ ৭:১৫৭)। যিনি কখনো কোনো পাঠশালায় যাননি, তিনি এমন অলৌকিক গ্রন্থ নিয়ে এলেন, যার মতো কিছু রচনা করতে মানুষ অক্ষম।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লামাল ইনসানা মা লাম ইয়ালাম', তিনি মানুষকে শিখিয়েছেন, যা সে জানত না। মানুষের কাছে আজ যা কিছু জ্ঞান আছে, সবই আল্লাহর দান। এখানেও রয়েছে বিনয়ের শিক্ষা। জ্ঞান নিয়ে অহংকার করার কিছু নেই, কারণ এটি আল্লাহর দেওয়া।

শিক্ষা ও উপদেশ

- ইসলামের প্রথম নির্দেশ 'পড়ো'। জ্ঞান অর্জন ইসলামের মূলে। তবে সেই জ্ঞান হতে হবে 'রবের নামে', যা আল্লাহকে চেনায় ও সঠিক পথ দেখায়।
- নিজে কুরআন শেখা ও পরিবারের সবাইকে শেখানো সবার দায়িত্ব।
- কুরআন শুধু তিলাওয়াতের জন্য নয়, বোঝা ও আমলের জন্যও নাযিল হয়েছে।
- সন্তানের দুনিয়াবী শিক্ষার মতো দ্বীনি শিক্ষার প্রতিও সমান গুরুত্ব ও বিনিয়োগ করা উচিত।
- মানুষ এক তুচ্ছ আলাক থেকে সৃষ্ট। অহংকার তার সাজে না।

- জ্ঞান আল্লাহর দান। কলম ও লেখা জ্ঞান সংরক্ষণের মাধ্যম।
- খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রজ্ঞা ও সহযোগিতা আদর্শ। স্বামীর কঠিন সময়ে স্ত্রীর সান্ত্বনা কত বড় শক্তি, তা তাঁর জীবন থেকে শেখা যায়।

সূরা আলাকের প্রথম পাঁচ আয়াত নাযিল হয়েছিল হেরা গুহায়। বাকি আয়াতগুলো নাযিল হয়েছে অনেক পরে, এমন এক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, যা মক্কার জীবনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেওয়া ব্যক্তি আবু জাহলের সঙ্গে জড়িত।

আবু জাহলের আসল নাম আমর ইবনে হিশাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে 'এই উম্মতের ফিরআউন' বলেছেন। বদরের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন তাকে আহত ও মুমূর্ষু অবস্থায় পেলেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেছিলেন (সহীহ বুখারী)। কারণ সে নিজের সম্পদ, প্রভাব ও ক্ষমতার জোরে শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নয়, সব দুর্বল মুসলমানের ওপর নির্যাতন চালাত। ইতিহাসে বহু জালিম ছিল। প্রত্যেক যুগে ভিন্ন ভিন্ন জালিম আল্লাহর নিদর্শন ও সতর্কবার্তা হয়ে এসেছে।

শানে নুযূল

সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আবু জাহল একবার কুরাইশদের জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মাদ কি তোমাদের সামনে মাটিতে মুখ রাখে, অর্থাৎ সিজদা করে? লোকেরা বলল, হ্যাঁ। সে বলল, লাত ও উযযার শপথ, যদি আমি তাকে এভাবে নামায পড়তে দেখি, তাহলে তার ঘাড়ে পা রাখব এবং তার মুখ মাটিতে মিশিয়ে দেব। এরপর একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামায পড়ছেন, সে এল এবং তাঁর ঘাড়ে পা রাখার জন্য এগোতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল সে পিছিয়ে আসছে এবং দুই হাত দিয়ে কিছু ঠেকানোর চেষ্টা করছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কী হয়েছে? সে বলল, আমার ও তার মাঝখানে আমি আগুনের এক গর্ত, ভয়ঙ্কর কিছু ও ডানা দেখলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে যদি আমার কাছে আসত, ফেরেশতারা তাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলত। তখন আল্লাহ এই আয়াতগুলো নাযিল করেন।

❖ সূরা আলাক, আয়াত ৬–৮

كَلَّآ إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَيَطْغَىٰٓ ﴿٦﴾

[৬] সত্যি সত্যি মানুষ সীমালংঘন করে

أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَىٰٓ ﴿٧﴾

[৭] এ কারণে যে, সে নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করে।

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰٓ ﴿٨﴾

[৮] নিশ্চয় আপনার পালনকর্তার দিকেই প্রত্যাবর্তন হবে।

আয়াত ৬–৮: অভাবমুক্ত মনে করলেই সীমালঙ্ঘন

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কাল্লা ইন্নাল ইনসানা লাইয়াতগা'। এখানে 'কাল্লা' অর্থ 'বাস্তবিক' বা 'সত্যি সত্যি'। আয়াতের আগ-পর মিলিয়ে অর্থ করা হয়। মানুষ সীমালঙ্ঘন করে। সপ্তম আয়াতে এর কারণ বলা হয়েছে, 'যখন সে নিজেকে অভাবমুক্ত দেখে।' মানুষের স্বভাব হলো, যখন তার সম্পদ আসে, ক্ষমতা আসে, তখন তার মধ্যে আল্লাহর ওপর ভরসা, কান্নাকাটি, বিনয়ের ভাব কমতে থাকে। কেউ বিলাসিতায়, কেউ নেশা ও অশ্লীলতায়, কেউ মানুষের ওপর জুলুমে জড়িয়ে পড়ে।

আমরা কি আসলেই অভাবমুক্ত? প্রতিটি শ্বাস, হৃদপিণ্ডের প্রতিটি স্পন্দন, সবকিছু আল্লাহর হুকুমে চলছে। তিনি এক মুহূর্তের জন্য হৃদপিণ্ড বন্ধ করে দিলে কোটি কোটি টাকাও কাজে আসবে না। আমার সামনে যে এক প্লেট ভাত, তা কি শুধু আমার টাকার ফল? এক কোটি টাকা দিয়েও কেউ একা এক প্লেট ভাত তৈরি করতে পারে না। কৃষকের অন্তরে আল্লাহ চাষাবাদের আগ্রহ দিয়েছেন। তাঁর ফসল স্থানীয় বাজার, পাইকারি বাজার ও শহরের দোকান হয়ে আমার কাছে আসে। কেউ রান্না করে। কত মানুষের সময়, শক্তি ও মেধা এর পেছনে। আল্লাহ একেকজনের অন্তরে একেক কাজের আগ্রহ দিয়েছেন। কেউ কৃষক, কেউ চালক, কেউ নিরাপত্তাকর্মী। এভাবেই তিনি পুরো পৃথিবী পরিচালনা করেন। আমি নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করলে সেটি চরম বোকামি।

অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তোমার রবের দিকেই প্রত্যাবর্তন।' এ কথা সব সময় মনে রাখা দরকার। আজ আমি শক্তিশালী, কাল বিছানায় পড়ে যেতে পারি। আজ সম্পদশালী, কাল সবকিছু হারাতে পারি। কিন্তু একটি জিনিস নিশ্চিত, আমাকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে।

❖ সূরা আলাক, আয়াত ৯–১৪

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يَنْهَىٰ ﴿٩﴾

[৯] আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে নিষেধ করে

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰٓ ﴿١٠﴾

[১০] এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে

أَرَءَيْتَ إِن كَانَ عَلَى ٱلْهُدَىٰٓ ﴿١١﴾

[১১] আপনি কি দেখেছেন যদি সে সৎপথে থাকে।

أَوۡ أَمَرَ بِٱلتَّقۡوَىٰٓ ﴿١٢﴾

[১২] অথবা খোদাভীতি শিক্ষা দেয়।

أَرَءَيۡتَ إِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰٓ ﴿١٣﴾

[১৩] আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।

أَلَمۡ يَعۡلَم بِأَنَّ ٱللَّهَ يَرَىٰ ﴿١٤﴾

[১৪] সে কি জানে না যে, আল্লাহ দেখেন

আয়াত ৯–১৪: নামাযে বাধা দানকারীর প্রতি প্রশ্ন

নবম ও দশম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বান্দাকে নিষেধ করে, যখন সে নামায পড়ে?' আবু জাহল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাবা চত্বরে নামায পড়তে নিষেধ করেছিল। একাদশ ও দ্বাদশ আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি কি দেখেছেন, যদি সে সঠিক পথে থাকে অথবা তাকওয়ার নির্দেশ দেয়?' অর্থাৎ যিনি হিদায়াতের ওপর আছেন, নামায পড়েন, তাকওয়ার আদেশ দেন, তাঁকে বাধা দেওয়া কত বড় অপরাধ! আল্লাহ সূরা বাকারায় বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয়, তার চেয়ে বড় জালিম আর কে? (২:১১৪)।

ত্রয়োদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আপনি কি দেখেছেন, যদি সে মিথ্যা বলে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়?' আর চতুর্দশ আয়াতে মূল প্রশ্ন, 'সে কি জানে না যে আল্লাহ দেখছেন?' এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আয়াত। আমরা যারা ক্ষমতা পেয়ে অন্যায় করি, যারা কারও জমি দখল করি, কারও ক্ষতি করি, কেউ কেউ সামান্য প্রভাব নিয়েও অন্যকে নির্যাতন করি, আমরা কি ভুলে যাই যে আল্লাহ আমাদের দেখছেন? ক্ষমতার মেয়াদ পাঁচ বছর, দশ বছর, বড়জোর পুরো জীবনটাই। তারপর কী? এই একটি আয়াত যদি আমাদের অন্তরে স্থায়ী জায়গা করে নেয়, কোনো গুনাহের ইচ্ছা জাগলেই আমরা মনে করি, 'আলাম ইয়ালাম বিআন্নাল্লাহা ইয়ারা', আল্লাহ আমাকে দেখছেন, তাহলে তাকওয়ার পথে চলা সহজ হয়ে যায়।

❖ সূরা আলাক, আয়াত ১৫–১৮

كَلَّا لَئِن لَّمۡ يَنتَهِ لَنَسۡفَعَۢا بِٱلنَّاصِيَةِ ﴿١٥﴾

[১৫] কখনই নয়, যদি সে বিরত না হয়, তবে আমি মস্তকের সামনের কেশগুচ্ছ ধরে হেঁচড়াবই

نَاصِيَةٖ كَٰذِبَةٍ خَاطِئَةٖ ﴿١٦﴾

[১৬] মিথ্যাচারী, পাপীর কেশগুচ্ছ।

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿١٧﴾

[১৭] অতএব, সে তার সভাসদদেরকে আহবান করুক।

سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ ﴿١٨﴾

[১৮] আমিও আহবান করব জাহান্নামের প্রহরীদেরকে

আয়াত ১৫–১৮: কপালের চুল ধরে টানা ও জাহান্নামের প্রহরী

পঞ্চদশ আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করছেন, 'কখনোই নয়! সে যদি বিরত না হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তার কপালের চুল ধরে টেনে নেব।' 'নাসিয়া' অর্থ মাথার সামনের চুলের গুচ্ছ। আরবে কারও কপালের চুল ধরে টানা চরম অপমানের চিহ্ন ছিল। ষোড়শ আয়াতে বলা হয়েছে, 'মিথ্যাচারী ও পাপী কপালের চুল।' এখানে কপালের চুলকে মিথ্যাবাদী ও পাপী বলা হয়েছে, কারণ কপাল ও মাথা মানুষের চিন্তা ও নেতৃত্বের প্রতীক। অর্থাৎ সে নিজে মিথ্যাবাদী ও পাপী।

সপ্তদশ আয়াতে আবু জাহলকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে, 'সে ডেকে আনুক তার পরিষদকে (নাদিয়া)।' আবু জাহলের বিশাল দলবল ছিল, মক্কার মুশরিকরা তাকে সমর্থন করত। আল্লাহ বলছেন, সে তার সব সঙ্গীকে ডেকে আনুক। অষ্টাদশ আয়াতে, 'আমিও ডেকে আনব জাবানিয়াদের।' 'যাবানিয়া' জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতা। তাঁরা অত্যন্ত কঠোর ও ভয়ঙ্কর। সূরা তাহরীমে বলা হয়েছে, জাহান্নামে নিয়োজিত আছে কঠোরস্বভাব ও শক্তিশালী ফেরেশতারা, তারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং যা আদেশ পায়, তা-ই করে (৬৬:৬)। তাঁদের অন্তরে দয়া নেই, তাঁরা বলবেন না যে আজ একটু কম মারব।

এই আয়াতগুলোর মধ্যে একটি ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে, অথচ আবু জাহলের লাঞ্ছনাময় মৃত্যু ঘটে হিজরতের পর মদীনার কাছে বদরের যুদ্ধে। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী মুআয ইবনে আমর ও মুআওয়ায ইবনে আফরা নামে দুজন অল্পবয়সী আনসারী যুবক তাকে আঘাত করেছিলেন। পরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে শেষ করেন। মৃত্যুর মুহূর্তেও তার অহংকার কমেনি। এ ঘটনায় বোঝা যায়, আল্লাহর সতর্কবার্তা কত সত্য।

❖ সূরা আলাক, আয়াত ১৯

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب ﴿١٩﴾

[১৯] কখনই নয়, আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সেজদা করুন ও আমার নৈকট্য অর্জন করুন।

আয়াত ১৯: সিজদা করো ও নৈকট্য অর্জন করো

শেষ আয়াতে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলছেন, 'কখনোই নয়! আপনি তার আনুগত্য করবেন না। আপনি সিজদা করুন এবং নৈকট্য অর্জন করুন।' আবু জাহল বা কোনো জালিমের হুমকির ভয়ে আপনি নামায ছাড়বেন না। বরং আরও বেশি সিজদা করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বান্দা তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয় সিজদা অবস্থায়, তাই সিজদায় বেশি বেশি দোয়া করো (সহীহ মুসলিম)।

এটি সিজদার আয়াত। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'ইযাস সামাউনশাক্কাত' ও 'ইকরা বিসমি রব্বিকা'-তে সিজদা করেছেন (সহীহ মুসলিম)। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এই আয়াত পাঠকারী ও শ্রবণকারী উভয়ের ওপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব।

শিক্ষা ও উপদেশ

- মানুষ নিজেকে অভাবমুক্ত মনে করলে সীমালঙ্ঘন করে। অথচ আমরা প্রতিটি মুহূর্তে আল্লাহর মুখাপেক্ষী।
- সম্পদ ও ক্ষমতা তখনই নিয়ামত, যখন তা মানুষকে আল্লাহর প্রতি আরও কৃতজ্ঞ ও বিনয়ী করে। যদি তা আনুগত্য কমায়, অহংকার বাড়ায়, তাহলে তা আযাবের কারণ।
- আল্লাহ সবকিছু দেখছেন, এই একটি আয়াত গুনাহ থেকে বাঁচার সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।
- নামাযে বাধা দেওয়া বা কাউকে নামায থেকে ফেরানো গুরুতর অপরাধ।
- আল্লাহ সবাইকে তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে। এ কথা মনে রাখলে জীবনের ভারসাম্য ঠিক থাকে।
- জালিমের হুমকিতে ভয় না পেয়ে আরও বেশি সিজদা ও আল্লাহর নৈকট্য খোঁজা মুমিনের কাজ।
- সিজদা বান্দার আল্লাহর সবচেয়ে কাছে যাওয়ার মুহূর্ত।

অধ্যায় ২০

সূরা কদর

القدر

হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ এক রাত

কুরআনের ৯৭তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৫টি

সূরা কদর কুরআনের ৯৭তম সূরা। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি মক্কায় অবতীর্ণ, তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। আয়াত সংখ্যা পাঁচ। সূরাটি একটি বিশেষ প্রেক্ষাপটে নাযিল হয়েছে। ইমাম মালিক রাহিমাহুল্লাহ মুওয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পূর্ববর্তী উম্মতের আয়ু দেখানো হলো। তিনি ভাবলেন, তাঁর উম্মতের আয়ু তো তুলনায় অনেক কম, তারা আমলে ওই উম্মতগুলোর সমান হতে পারবে না। তখন আল্লাহ তাঁকে লাইলাতুল কদর দান করলেন। তাফসীরের কিতাবগুলোতে আরেকটি বর্ণনা আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির কথা আলোচনা করছিলেন, যিনি প্রায় এক হাজার মাস, অর্থাৎ বহু বছর, দিনে রোযা রেখে আল্লাহর পথে জিহাদে থাকতেন আর রাতে নামাযে দাঁড়াতেন। এ কথা শুনে সাহাবীরা বিস্মিত হলেন এবং কিছুটা আফসোস করলেন, আমাদের যদি এমন দীর্ঘ আয়ু থাকত! তখন এই সূরা নাযিল হলো। কারণ দুনিয়ার প্রতিযোগিতার চেয়ে আখিরাতের প্রতিযোগিতাকে সাহাবীরা সবসময় বেশি গুরুত্ব দিতেন।

এ থেকে বোঝা যায়, লাইলাতুল কদর এই উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য, যা আল্লাহ তাআলা অন্য কোনো উম্মতকে দেননি।

❖ সূরা কদর, আয়াত ১

إِنَّآ أَنزَلۡنَٰهُ فِي لَيۡلَةِ ٱلۡقَدۡرِ ١

[১] আমি একে নাযিল করেছি শবে-কদরে।

আয়াত ১: ‘নিশ্চয়ই আমি এটি কদরের রাতে নাযিল করেছি’

প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘ইন্না আনযালনাহু ফী লাইলাতিল কদর’। ‘ইন্না’ ও ‘আনযালনা’ বহুবচন, অর্থ ‘আমরা নাযিল করেছি’। এটি আরবি ভাষার একটি রীতি, যেখানে রাজকীয় মর্যাদা ও গাম্ভীর্য প্রকাশের জন্য বহুবচন ব্যবহৃত হয়, যেমন রাজা বলেন, ‘এটি আমাদের সিদ্ধান্ত’। আল্লাহ যখন নিজের কোনো রহমত, কুদরত বা অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তখন সাধারণত বহুবচন ব্যবহার

করেন। আর যেখানে তাওহীদের কথা বলেন, সেখানে একবচন, যেমন 'ইন্নানী আনাল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা আনা' (আমিই আল্লাহ, আমি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, সূরা ত্বহা ২০:১৪)।

'হু' সর্বনামটি কুরআনের দিকে ইঙ্গিত করছে, যদিও এর নাম উল্লেখ করা হয়নি। কুরআন এত প্রসিদ্ধ যে নাম না নিলেও কারও বুঝতে অসুবিধা হয় না। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন, রমযান মাস, যে মাসে কুরআন নাযিল করা হয়েছে (২:১৮৫)। সূরা দুখানে আছে, আমি এটি এক বরকতময় রাতে নাযিল করেছি (৪৪:৩)।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে, কুরআন তো তেইশ বছর ধরে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, তাহলে এক রাতে নাযিল হওয়ার অর্থ কী? ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত ব্যাখ্যা অনুযায়ী কুরআন দুইবার নাযিল হয়েছে। প্রথমবার পুরো কুরআন লাওহে মাহফূয থেকে প্রথম আসমানের 'বাইতুল ইযযাহ'-এ এক রাতে, লাইলাতুল কদরে নাযিল করা হয়। এরপর প্রয়োজন ও ঘটনার প্রেক্ষিতে ধীরে ধীরে তেইশ বছর ধরে জিবরীল আলাইহিস সালামের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পৌঁছানো হয়েছে। তাই এখানে কোনো বিরোধ নেই।

'কদর' শব্দের দুটি অর্থ। এক, মর্যাদা ও মূল্য। আমরা বলি, 'লোকটি আমার কদর করল না।' এই রাতের মর্যাদা অসাধারণ বলেই একে লাইলাতুল কদর বলা হয়। দুই, তাকদীর বা নির্ধারণ। সূরা দুখানে বলা হয়েছে, এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের ফয়সালা করা হয় (৪৪:৪)। আলেমগণ বলেন, এই রাতে আগামী এক বছরের বিষয় যেমন জীবিকা, আয়ু, ঘটনাবলির তালিকা ফেরেশতাদের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগে। আল্লাহ তো সৃষ্টির বহু আগেই তাকদীর লিখে রেখেছেন, তাহলে এই রাতে আবার কীসের ফয়সালা? আলেমগণ ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহর জ্ঞান ও অনাদি তাকদীর অপরিবর্তনীয়। কিন্তু ফেরেশতাদের জন্য লিপিবদ্ধ কিছু বিষয় বান্দার কর্ম ও দোয়ার ওপর নির্ভর করে। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ যা ইচ্ছা মুছে দেন এবং যা ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত রাখেন (সূরা রা'দ ১৩:৩৯)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দোয়া ছাড়া কোনো কিছু তাকদীর পরিবর্তন করে না এবং সদাচরণ ছাড়া কিছু আয়ু বাড়ায় না (জামে তিরমিযী)।

এই কারণে 'তাকদীরে যা আছে তা-ই হবে' বলে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়। আমরা জানি না তাকদীরে কী লেখা আছে। আল্লাহ আগেই জানেন বলে লিখে রেখেছেন, কিন্তু আমাদের কাজ হলো চেষ্টা করা। যে পড়বে, সে পরীক্ষায় ভালো করবে। যে না পড়ে বলে, 'তাকদীরে থাকলে পাশ করব', সে ভুল বলে। আল্লাহর ব্যবস্থায় চেষ্টা ও ফলের মধ্যে সম্পর্ক আছে।

❖ সূরা কদর, আয়াত ২–৩

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ ٢

[২] শবে-কদর সম্বন্ধে আপনি কি জানেন

لَيۡلَةُ ٱلۡقَدۡرِ خَيۡرٞ مِّنۡ أَلۡفِ شَهۡرٖ ٣

[৩] শবে-কদর হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

আয়াত ২–৩: 'কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম'

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি কি জানেন কদরের রাত কী?' এই প্রশ্নের ধরনে বিষয়টির গুরুত্ব ও আকর্ষণ আরও বাড়ে। তৃতীয় আয়াতে উত্তর, 'কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম।'

লক্ষ করুন, বলা হয়নি 'হাজার মাসের সমান', বলা হয়েছে 'হাজার মাসের চেয়ে উত্তম'। হাজার মাস মানে প্রায় ৮৩ বছর ৪ মাস। এই রাত তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। আবার 'হাজার' শব্দটি আরবি বাগধারায় অনেক সময় সংখ্যার সীমা বোঝায় না, বরং বহুত্ব বোঝায়। তাই মর্যাদা শুধু ৮৩ বছর ৪ মাসের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি ঈমানের সঙ্গে ও সওয়াবের আশায় কদরের রাতে নামাযে দাঁড়াবে, তার পূর্বের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আল্লাহ এই উম্মতের জন্য কত সহজ ব্যবস্থা রেখেছেন! কেউ যদি দশ দিন পরিশ্রম করলে ৮৩ বছরের খরচ পেয়ে যায়, তাহলে কেউ কি বসে থাকবে? আল্লাহর ভাণ্ডারে কোনো কমতি নেই, আর তিনি প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন।

❖ সূরা কদর, আয়াত ৪–৫

تَنَزَّلُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذۡنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمۡرٖ ٤

[৪] এতে প্রত্যেক কাজের জন্যে ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে।

سَلَٰمٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطۡلَعِ ٱلۡفَجۡرِ ٥

[৫] এটা নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

আয়াত ৪–৫: ফেরেশতাদের অবতরণ ও সালাম

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেই রাতে ফেরেশতারা ও রূহ অবতরণ করে তাদের রবের অনুমতিক্রমে প্রত্যেক বিষয় নিয়ে।' 'রূহ' বলতে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে জিবরীল আলাইহিস সালাম। সব ফেরেশতার কথা বলার পর আলাদাভাবে জিবরীলের নাম তাঁর বিশেষ মর্যাদার কারণে উল্লেখ করা হয়েছে। বর্ণিত আছে, সেই রাতে পৃথিবীতে এত ফেরেশতা নামেন

যে তাঁদের সংখ্যা কঙ্করের সংখ্যার চেয়েও বেশি। তাঁরা মুমিন বান্দাদের অভ্যর্থনা জানান, তাদের জন্য দোয়া করেন।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'এ রাত শান্তিময় (সালাম), ফজরের উদয় পর্যন্ত।' রাতের শুরু থেকে ভোর পর্যন্ত সম্পূর্ণ রাত বরকত, রহমত ও শান্তিতে ভরপুর।

লাইলাতুল কদর কোন রাত?

আমাদের দেশে সাধারণত ২৭ রমযানের রাতকে শবে কদর মনে করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দিষ্ট করে কোনো রাত বলে যাননি। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে কদরের রাত খোঁজো (সহীহ বুখারী)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত আছে, শেষ দশকে খোঁজো, নবম, সপ্তম ও পঞ্চম অবশিষ্ট রাতে (সহীহ বুখারী)। উবাদা ইবনে সামিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের লাইলাতুল কদরের তারিখ জানাতে বের হয়েছিলেন, তখন দুজন মুসলমান ঝগড়া করছিল। তিনি বললেন, আমি তোমাদের কদরের রাতের খবর দিতে এসেছিলাম, কিন্তু অমুক অমুক ঝগড়া করছিল, তাই তা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এতেই তোমাদের কল্যাণ। তোমরা তা নবম, সপ্তম ও পঞ্চম রাতে খোঁজো (সহীহ বুখারী)। উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু দৃঢ়ভাবে বলতেন, এটি ২৭ রমযানের রাত (সহীহ মুসলিম)। ২৭তম রাতে হওয়ার সম্ভাবনা অবশ্যই আছে, কারণ এটি বেজোড় রাত। কিন্তু একে নির্দিষ্ট করে বাকি রাতগুলোতে ঘুমিয়ে থাকা ঠিক নয়। কোনো বছর ২১ বা ২৩ বা ২৫ তারিখেও হতে পারে।

আল্লাহ কেন নির্দিষ্ট করে বলেননি? শিক্ষক যদি ছাত্রদের বলে দেন, কোন প্রশ্ন পরীক্ষায় আসবে, তাহলে ছাত্র শুধু সেটাই পড়ে। শিক্ষক না বললে পুরো সিলেবাস পড়ে। শেষ দশ রাতে পুরোটা সময় ইবাদতে থাকলে আমাদের আমলের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শেষ দশকে নিয়মিত ইতিকাফ করতেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি যদি লাইলাতুল কদর পাই, তাহলে কী বলব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিখিয়ে দিলেন, **আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন তুহিব্বুল আফওয়া ফা'ফু আন্নী**, হে আল্লাহ, আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা ভালোবাসেন, তাই আমাকে ক্ষমা করুন (জামে তিরমিযী)। উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, কদরের রাতের পরের সকালে সূর্য উদিত হয় কিরণহীন, ধবধবে সাদা থালার মতো (সহীহ মুসলিম)।

ফযীলতের আশ্বাস, কিন্তু কবুলের ভয়

কেউ কেউ ভাবতে পারেন, উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস অনুযায়ী যে ইশা জামাআতে পড়ল, সে অর্ধেক রাত ইবাদতের সওয়াব পেল, আর যে ফজরও জামাআতে পড়ল, সে পুরো রাতের সওয়াব পেল (সহীহ মুসলিম)। তাহলে কদরের রাতে কিছু না করলেও ইশা ও ফজর জামাআতে আদায় করেই ৮৩ বছরের সওয়াব হয়ে গেল। এ কথা সত্য যে আল্লাহ বান্দার জন্য ইবাদতের সুযোগ এত সহজ করে রেখেছেন। তবে একটি বিষয় মনে রাখা জরুরি। আমরা নিশ্চিত নই, আমাদের ইবাদত কবুল হয়েছে কি না। ইখলাস ছিল কি, মনোযোগ ছিল কি, উপার্জন হালাল ছিল কি, এসব প্রশ্ন থেকে যায়। আল্লাহ মুমিনদের গুণ বর্ণনায় বলেছেন, তারা যা দান করে, ভীত কম্পিত হৃদয়ে দান করে, কারণ তারা তাদের রবের কাছে ফিরে যাবে (সূরা মুমিনূন ২৩:৬০)। আমরা যদি জানতাম, আমাদের ইবাদত কবুল হয়েছে, তাহলে হয়তো বলতে পারতাম, ৮৩ বছরের সওয়াব হয়ে গেছে। কিন্তু সেই নিশ্চয়তা আমাদের কাছে নেই, তাই দোয়া ও চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

লাইলাতুল কদরের প্রস্তুতি রমযানের আগে থেকেই নেওয়া ভালো। হঠাৎ করে সারারাত ইবাদত করার শক্তি থাকে না। আগে থেকে ধীরে ধীরে তাহাজ্জুদ, কিয়ামুল লাইল ও দীর্ঘ কিরাআতে নামাযের অভ্যাস করলে সেই রাতে আরামে ইবাদত করা সহজ হবে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- লাইলাতুল কদর উম্মতে মুহাম্মাদীর বিশেষ নিয়ামত। এই রাতের ইবাদত হাজার মাসের ইবাদতের চেয়ে উত্তম।
- কুরআন নাযিল হয়েছে এই রাতে। রমযান ও কুরআনের সম্পর্ক গভীর।
- নির্দিষ্ট একটি রাতের ওপর নির্ভর না করে রমযানের শেষ দশকের সব বেজোড় রাতে, বরং পুরো শেষ দশকেই ইবাদতে সচেষ্ট থাকা উচিত।
- তাকদীরে লিখিত আছে বলে চেষ্টা ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমাদের চেষ্টা ও দোয়াও আল্লাহর ব্যবস্থার অংশ।
- এই রাতে ক্ষমা চাওয়ার সবচেয়ে প্রিয় দোয়া 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আফুউন...'।
- ইবাদতের বিষয়ে আত্মতুষ্ট না হয়ে কবুলের ভয় ও আশা নিয়ে দোয়া করে যাওয়া দরকার।
- আগে থেকে রাত জাগার ও দীর্ঘ নামাযের অভ্যাস করলে লাইলাতুল কদরে ইবাদত সহজ হয়।

অধ্যায় ২১

সূরা বাইয়্যিনাহ

البينة

সৃষ্টির সেরা ও সৃষ্টির নিকৃষ্ট কারা

কুরআনের ৯৮তম সূরা · মাদানী · আয়াত ৮টি

সূরা বাইয়্যিনাহ কুরআনের ৯৮তম সূরা। এর আরেক নাম ‘সূরা লাম ইয়াকুন’। আয়াত সংখ্যা আট। এটি মক্কী না মাদানী, তা নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ আছে, তবে অনেকের মতে এটি মাদানী। মদীনার আহলে কিতাব ও মক্কার মুশরিক, উভয়ের প্রসঙ্গ এখানে এসেছে।

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমি যেন তোমাকে সূরা ‘লাম ইয়াকুন’ পড়ে শোনাই। উবাই জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ কি আমার নাম নিয়ে বলেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে উবাই কেঁদে ফেললেন। যিনি আল্লাহর দরবারে নাম নিয়ে স্মরণীয় হয়েছেন, তাঁর আবেগ সহজেই অনুমান করা যায়।

❖ সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ১–৩

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿١﴾

[১] আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের ছিল, তারা প্রত্যাবর্তন করত না যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসত।

رَسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يَتْلُواْ صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ﴿٢﴾

[২] অর্থাৎ আল্লাহর একজন রসূল, যিনি আবৃত্তি করতেন পবিত্র সহীফা

فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿٣﴾

[৩] যাতে আছে, সঠিক বিষয়বস্তু।

আয়াত ১–৩: সুস্পষ্ট প্রমাণ না আসা পর্যন্ত তারা বিরত হওয়ার ছিল না

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে এবং মুশরিকরা, তারা (নিজেদের অবস্থান থেকে) সরে আসার ছিল না, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ (বাইয়্যিনাহ) আসে।'

এখানে তিনটি পরিভাষা বোঝা দরকার। 'কাফির' অর্থ আল্লাহর একত্ব ও রাসূলের রিসালাত অস্বীকারকারী। 'মুশরিক' অর্থ আল্লাহর সঙ্গে অংশীদার স্থাপনকারী। 'আহলে কিতাব' হলো ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান, যাদের কাছে আসমানী কিতাব এসেছিল। খ্রিস্টানদের একটি অংশ ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করে, আর ইয়াহূদীদের একটি অংশ উযাইর আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলত, এসব শিরকের অন্তর্ভুক্ত। সূরা তাওবায় আল্লাহ বলেছেন, তারা যা শরীক করে, তা থেকে আল্লাহ পবিত্র (৯:৩১)। তবু কুরআনের পরিভাষায় আহলে কিতাবকে সাধারণত 'মুশরিক' না বলে 'আহলে কিতাব' বলা হয়েছে। এই সূরাতেও তাদের আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ তারা আসমানী কিতাবের অনুসরণের দাবি করত, যদিও তাদের কিতাবে বিকৃতি ঘটেছিল। এ পার্থক্যের কারণে ফিকহে তাদের কিছু বিধানও ভিন্ন, যেমন তাদের যবেহ করা পশু বৈধ এবং তাদের সতী নারীকে বিয়ে করা বৈধ (সূরা মায়িদা ৫:৫)।

আহলে কিতাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের অপেক্ষায় ছিল, কারণ তারা তাদের কিতাবে শেষ নবীর সুসংবাদ ও তাঁর পরিচয় পেয়েছিল। মদীনার ইয়াহূদী গোত্র, বনু কুরাইযা, বনু নাযীর ও বনু কাইনুকা সেই কারণেই সেখানে বসতি গেড়েছিল বলে বর্ণিত আছে। মুশরিকদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় তারা বলত, শেষ নবীর ওসীলায় আমরা তোমাদের বিরুদ্ধে বিজয় চাই। সূরা বাকারায় আল্লাহ এর উল্লেখ করেছেন (২:৮৯)। মুশরিকরাও নিজেদের কথায় বলত, কোনো সুস্পষ্ট দলিল না আসা পর্যন্ত আমরা শিরক থেকে ফিরব না।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় আয়াতে সেই সুস্পষ্ট প্রমাণের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, 'আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রাসূল, যিনি পবিত্র সহীফাসমূহ পাঠ করেন, যাতে আছে সঠিক ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান (কুতুবুন কাইয়্যিমাহ)।' অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে এমন কুরআন পাঠ করেন, যা পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবের মৌলিক শিক্ষার সত্যায়ন করে এবং সব ধরনের মিশ্রণ ও বিকৃতি থেকে মুক্ত।

❖ সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৪

وَمَا تَفَرَّقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ إِلَّا مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ﴿٤﴾

[৪] অপর কিতাব প্রাপ্তরা যে বিভ্রান্ত হয়েছে, তা হয়েছে তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেই।

আয়াত ৪: দলিল আসার পর বিভক্তি

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আহলে কিতাব বিভক্ত হয়ে পড়ল শুধু তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরই।' এটি একটি দুঃখজনক বাস্তবতা। যে প্রমাণের জন্য তারা অপেক্ষা করছিল, তা আসার পর তাদের একদল তা গ্রহণ করল, আরেক দল প্রত্যাখ্যান করল। কেউ কেউ ঈমান আনলেন, যেমন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ছিলেন মদীনার একজন বড় ইয়াহূদী আলেম (সহীহ বুখারী)। আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজাশী ঈমান এনেছিলেন। কিন্তু অনেকে অস্বীকার করল।

এর বড় কারণ ছিল হিংসা ও অহংকার। তাদের ধারণা ছিল, শেষ নবী বনী ইসরাঈলের বংশে আসবেন। কিন্তু তিনি এলেন ইসমাঈল আলাইহিস সালামের বংশে, আরবদের মধ্যে। আল্লাহ বলেছেন, তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পরও কেবল নিজেদের হিংসার কারণে তারা অনেকে চেয়েছিল, তোমাদের ঈমান আনার পর আবার কাফির বানিয়ে দিতে (সূরা বাকারা ২:১০৯)। জেনে-বুঝে সত্য প্রত্যাখ্যান করার এটাই কারণ।

এখান থেকে আমরাও একটি শিক্ষা নিতে পারি। আমাদের সমাজে 'দলিল' নিয়ে অনেক বিতর্ক হয়, যেমন মাযহাব মানব কি না। প্রত্যেকের জন্য একটাই কথা, আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে দলিল খুঁজুন, এবং দলিল বোঝার যোগ্যতা না থাকলে নির্ভরযোগ্য আলেমের শরণাপন্ন হন। ডাক্তার বাছাইয়ের সময় আমরা যেমন অভিজ্ঞতা ও সুনাম যাচাই করি, দ্বীনের ক্ষেত্রেও তা-ই করা উচিত। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে সত্য অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তাকে পথ দেখান।

❖ সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৫

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ ٥

[৫] তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে, নামায কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক ধর্ম।

আয়াত ৫: তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল কেবল তিনটি

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর তাদের কেবল এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, যেন তারা আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে, একনিষ্ঠভাবে (হুনাফা), নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। আর এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দ্বীন।'

এখানে তিনটি নির্দেশ: এক, একমাত্র আল্লাহর ইবাদত, অর্থাৎ শিরক থেকে মুক্ত হওয়া। দুই, নামায কায়েম করা। তিন, যাকাত দেওয়া। 'হুনাফা' অর্থ সব বাতিল থেকে সরে এসে সত্যের দিকে একনিষ্ঠভাবে ঝুঁকে পড়া। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের বিশেষণ ছিল 'হানীফ'।

লক্ষ করার বিষয়, কুরআনে নামায ও যাকাতের কথা প্রায় সবসময় একসঙ্গে আসে। এর তাৎপর্য আছে। যে ব্যক্তি প্রতিদিন নিজের কর্মব্যস্ততা ও উপার্জনের সময় থেকে সময় বের করে নামাযে আসে, সে আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো ও তাঁকে ভয় করার ব্যাপারে আন্তরিক। আর যে ব্যক্তি নিজের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ আল্লাহর পথে দেয়, সে প্রমাণ করে যে সে আল্লাহকে সম্পদের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। কেউ কেউ নামায পড়ে, কিন্তু যাকাত দেয় না। সম্পদের মোহ তাদের আটকে রাখে। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে বলেছিলেন, যে নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করবে, আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে লড়ব (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। রোযা ও হজেও অন্য উদ্দেশ্য মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই সেখানে ইখলাসের তাগিদ আছে। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা আল্লাহর জন্য হজ ও উমরা পূর্ণ করো (সূরা বাকারা ২:১৯৬)।

❖ সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৬

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أُوْلَٰٓئِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيَّةِ ﴿٦﴾

[৬] আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

আয়াত ৬: জেনে-বুঝে প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি

ষষ্ঠ আয়াতে ঘোষণা, 'নিশ্চয়ই আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরি করেছে, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির নিকৃষ্টতম (শার্‌রুল বারিয়্যাহ)।'

এ আয়াত নিয়ে একটি ভুল বোঝাবুঝি আছে। অনেকে এটিকে মুসলমানদের সংকীর্ণতা ও বিদ্বেষ বলে অভিহিত করে। কিন্তু এটি মুসলমানদের নিজস্ব কথা নয়, এটি আল্লাহর ঘোষণা। জান্নাত আল্লাহর, এর বিধান তিনিই নির্ধারণ করেন। আয়াতটির প্রেক্ষাপট বুঝতে হবে। এখানে তাদের কথা বলা হয়েছে, যাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ এসে পৌঁছেছে এবং তারা জেনে-বুঝে অহংকার, হিংসা বা জেদের কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেছে। যাদের কাছে সত্যের বার্তা যথাযথভাবে পৌঁছেনি, তাদের বিষয়টি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত। আল্লাহ বলেছেন, আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দিই না (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:১৫)। কার কী পরিণতি, তা চূড়ান্তভাবে আল্লাহই জানেন। আমাদের দায়িত্ব হলো মানুষকে ভালোবাসা ও সহমর্মিতার সঙ্গে সত্যের দিকে ডাকা এবং তাদের প্রতি জুলুম না করা।

আজকের যুগে সত্য প্রত্যাখ্যানের আরেকটি রূপ দেখা যায়। কেউ কেউ বলে, 'আমার জীবন, আমি যেভাবে ইচ্ছা চালাব, সব জায়গায় ইসলাম টানবেন না।' ইসলামকে শুধু মসজিদের

গণ্ডিতে আবদ্ধ করার এই মনোভাব সতর্ক হওয়ার মতো। আলেমগণ বলেন, কেউ যদি স্পষ্ট ফরয বিধানকে অস্বীকার করে বা আল্লাহর বিধানকে অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে, তাহলে সেটা কেবল গুনাহ নয়, বরং ঈমানের জন্য বিপজ্জনক। আর কেউ যদি বিধান মানে, কিন্তু প্রবৃত্তির তাড়নায় গুনাহ করে ফেলে এবং অনুতপ্ত হয়, সে গুনাহগার, তার জন্য তাওবার দরজা খোলা। এই পার্থক্য মনে রাখা জরুরি।

জনপ্রিয়তা, খ্যাতি, সম্পদ বা পদ আল্লাহর কাছে মর্যাদার মাপকাঠি নয়। আজ অনেক মানুষ খ্যাতিমানদের অন্ধ অনুকরণে নিজেদের জীবনধারা, পোশাক ও আদর্শ ঢেলে সাজাচ্ছে। যার জীবনে আল্লাহর আনুগত্য নেই, তার অনুসরণ আমাদের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে তাদেরই একজন (সুনানে আবু দাউদ)।

❖ সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৭

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ أُوْلَٰٓئِكَ هُمۡ خَيۡرُ ٱلۡبَرِيَّةِ ٧

[৭] যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা।

আয়াত ৭: সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ (খাইরুল বারিয়্যাহ)

সপ্তম আয়াতে ঘোষণা, ‘নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।’ এই সম্মান কার জন্য? যার ঈমান ও আমলে সালেহ আছে, সে যদি রিকশাচালক হয়, ঝাড়ুদার হয়, দিনমজুর হয়, তবু সে আল্লাহর কাছে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠদের একজন। সমাজে তার কোনো মর্যাদা না থাকতে পারে। সুন্নাহ মেনে চলার কারণে লোকে তাকে ‘সেকেলে’ বলতে পারে। মসজিদের কোণে সে পড়ে থাকে, সামনের কাতারে বসতে সংকোচ করে। কিন্তু আল্লাহর কাছে সে অত্যন্ত প্রিয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এমন অনেক এলোমেলো চুলওয়ালা, ধুলোমলিন মানুষ আছে, যাকে দরজা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু সে যদি আল্লাহর নামে শপথ করে, আল্লাহ তা পূর্ণ করে দেন (সহীহ মুসলিম)।

❖ সূরা বাইয়্যিনাহ, আয়াত ৮

جَزَآؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ۖ رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا۟ عَنْهُ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُۥ ﴿٨﴾

[৮] তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় কর।

আয়াত ৮: প্রতিদান ও আল্লাহর সন্তুষ্টি

অষ্টম আয়াতে তাদের প্রতিদানের বিবরণ, 'তাদের প্রতিদান তাদের রবের কাছে চিরস্থায়ী জান্নাত (জান্নাতু আদন), যার তলদেশে নদী প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে।'

'তাদের রবের কাছে' কথাটি মর্যাদাবান। কারও প্রতিদান অন্যের কাছে গচ্ছিত থাকা আর আল্লাহর নিজের কাছে থাকা সমান নয়। 'জান্নাতু আদন'-এর দুটি অর্থ আছে: বসবাসের যোগ্য জান্নাত অথবা চিরস্থায়ী জান্নাত।

সবচেয়ে মূল্যবান অংশ হলো 'রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওয়া রাদূ আনহু', আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট, তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ জান্নাতবাসীদের বলবেন, তোমরা কি সন্তুষ্ট? তারা বলবে, আমরা কেন সন্তুষ্ট হব না, আপনি আমাদের এমন কিছু দিয়েছেন, যা আর কাউকে দেননি। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের এর চেয়েও উত্তম কিছু দেব? তারা বলবে, এর চেয়ে উত্তম আর কী? তিনি বলবেন, আমি তোমাদের ওপর আমার সন্তুষ্টি অবতীর্ণ করছি, এরপর আমি কখনো তোমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হব না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

সূরার শেষে বলা হয়েছে, 'এটা তার জন্য, যে তার রবকে ভয় করে (খাশিয়া)।' কুরআনে ভয়ের জন্য কয়েকটি শব্দ আছে। 'খাশিয়াহ' এমন ভয়, যা ভালোবাসা ও আল্লাহ সম্পর্কে জ্ঞানের সঙ্গে জড়িত। আল্লাহ বলেছেন, তাঁর বান্দাদের মধ্যে আলেমরাই তাঁকে ভয় করে (সূরা ফাতির ৩৫:২৮)। সাপকে ভয় আর বাবাকে ভয় এক নয়। সাপকে ভয় করি ক্ষতির আশঙ্কায়। বাবাকে ভয় করি ভালোবাসা ও সম্মানের কারণে, যেন তাঁর মন কষ্ট না পায়। আল্লাহকে ভয় করা এই দ্বিতীয় ধরনের, যেখানে ভালোবাসা আছে এবং অসন্তুষ্ট করার আশঙ্কা আছে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আহলে কিতাব ও মুশরিকরা সত্যের দলিল আসার অপেক্ষায় ছিল। দলিল আসার পর হিংসা ও অহংকার তাদের ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত করেছে।
- নিষ্ঠার সঙ্গে দলিল খোঁজা এবং দলিল না বুঝলে নির্ভরযোগ্য আলেমের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।
- সব নবী-রাসূলের মূল শিক্ষা ছিল একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত, নামায কায়েম ও যাকাত আদায়।
- নামায আল্লাহর ভয়ের এবং যাকাত আল্লাহকে সম্পদের চেয়ে বেশি ভালোবাসার প্রমাণ।
- ঈমান ও আমলে সালেহ থাকলে সামাজিক মর্যাদা না থাকলেও আল্লাহর কাছে সে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।
- খ্যাতি, জনপ্রিয়তা ও সম্পদ আল্লাহর কাছে মর্যাদার মাপকাঠি নয়। অন্ধ অনুকরণ থেকে সতর্ক থাকা উচিত।
- আল্লাহ জান্নাতীদের প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, এটি জান্নাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত।
- আল্লাহকে ভয় করতে হবে ভালোবাসার সঙ্গে, যেন তিনি অসন্তুষ্ট না হন।

অধ্যায় ২২

সূরা যিলযাল

الزلزلة

অণু পরিমাণ ভালো-মন্দও দেখা যাবে

কুরআনের ৯৯তম সূরা · মাদানী · আয়াত ৮টি

সূরা যিলযাল কুরআনের ৯৯তম সূরা। আয়াত সংখ্যা আট। এটি মাক্কী না মাদানী, এ নিয়ে সাহাবীদের মধ্যেও মতভেদ ছিল। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের মতে এটি মাক্কী, আর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা প্রমুখের মতে মাদানী। অধিকাংশ মাসহাফে একে মাদানী হিসেবে লেখা হয়। যাঁরা মাক্কী বলেছেন, তাঁদের যুক্তি, মাক্কী সূরার প্রধান বিষয়বস্তু পুনরুত্থান, হাশর ও বিচার দিবস, আর এই সূরার আলোচ্য বিষয়ও তা-ই।

সূরাটির ফযীলত প্রসঙ্গে জামে তিরমিযীতে একটি হাদীস আছে, এটি কুরআনের অর্ধেকের সমান। এর সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। তবে সহীহ বুখারীতে সূরা ইখলাস কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান হওয়ার কথা এসেছে। সূরা যিলযালের মূল গুরুত্ব এর বিষয়বস্তুতেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শেষ দুই আয়াতকে 'আল-আয়াতুল জামিআতুল ফাযযাহ' অর্থাৎ ব্যাপক ও অনন্য আয়াত বলেছেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এর অর্থ, মাত্র দুটি আয়াতে সব ভালো-মন্দ কাজের নীতিমালা এসে গেছে।

মাক্কী সূরায় কাফিরদের মনে দুটি সন্দেহ ছিল। প্রথম সন্দেহ, এই বিশাল পাহাড়, মরুভূমি ও জমিন, যা এত স্থির, তা কি করে ধ্বংস হয়ে যাবে? দ্বিতীয় সন্দেহ, আমরা যা করছি, তা কে লিখে রাখছে, কে সাক্ষ্য দেবে, কীভাবে সবকিছুর প্রমাণ হবে? এই সূরায় আল্লাহ তাআলা দুটি সন্দেহেরই জবাব দিয়েছেন।

❖ সূরা যিলযাল, আয়াত ১–৩

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿١﴾

[১] যখন পৃথিবী তার কম্পনে প্রকম্পিত হবে

وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿٢﴾

[২] যখন সে তার বোঝা বের করে দেবে।

وَقَالَ ٱلۡإِنسَٰنُ مَا لَهَا ۝٣

[৩] এবং মানুষ বলবে, এর কি হল

আয়াত ১–৩: জমিনের প্রচণ্ড কম্পন

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যখন জমিনকে তার প্রচণ্ড কম্পনে প্রকম্পিত করা হবে।' এখানে 'যিলযাল' কম্পনের নাম, আর 'যুলযিলাত' ক্রিয়া। একই ধাতুর ক্রিয়া ও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পাশাপাশি এনে কম্পনকে অত্যন্ত প্রচণ্ড বোঝানো হয়েছে। 'ইযা' (যখন) শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত আছে, এটি অবশ্যই ঘটবে। আরবিতে নিশ্চিত বিষয়ের জন্য 'ইযা' এবং সংশয়ের জন্য 'ইন' ব্যবহার হয়।

আমরা সংবাদে শুনি, অমুক এলাকায় ভূমিকম্প হয়েছে। কিন্তু এটি হবে সমগ্র পৃথিবীর একযোগে কম্পন, কোনো বিশেষ অঞ্চলের নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর জমিন তার ভেতরের বোঝা বের করে দেবে।' 'আসকাল' অর্থ ভারী বোঝা। এর দুটি ব্যাখ্যা আছে। এক, জমিনে যত মানুষ কবর পেয়েছে, সবাইকে বের করে দেবে। দুই, জমিনের ভেতরে যত খনিজ সম্পদ, স্বর্ণ, রুপা ও তেল লুকিয়ে আছে, সবকিছু উগরে দেবে। সহীহ মুসলিমের হাদীসে আছে, জমিন তার কলিজার টুকরোগুলো স্তম্ভের মতো সোনা-রুপার আকারে বের করে দেবে। তখন হত্যাকারী বলবে, এই সম্পদের জন্য আমি হত্যা করেছিলাম। আত্মীয়তা ছিন্নকারী বলবে, এর জন্য আমি আত্মীয়তা ছিন্ন করেছিলাম। চোর বলবে, এর জন্য আমার হাত কাটা গিয়েছিল। তারপর সবাই সেগুলো ফেলে চলে যাবে, কেউ আর তাকিয়েও দেখবে না।

যুগ যুগ ধরে যে সম্পদের জন্য মানুষ যুদ্ধ করেছে, রক্ত ঝরিয়েছে, সেদিন তা পড়ে থাকবে অযত্নে। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর মানুষ বলবে, এর কী হলো?' এত বিস্ময়কর ও আকস্মিক ঘটনা দেখে মানুষ আতঙ্কিত হয়ে একে অপরকে জিজ্ঞেস করবে, জমিনের হঠাৎ এ কী অবস্থা!

❖ সূরা যিলযাল, আয়াত ৪–৫

يَوۡمَئِذٖ تُحَدِّثُ أَخۡبَارَهَا ۝٤

[৪] সেদিন সে তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে

بِأَنَّ رَبَّكَ أَوۡحَىٰ لَهَا ۝٥

[৫] কারণ, আপনার পালনকর্তা তাকে আদেশ করবেন।

আয়াত ৪–৫: জমিন তার সংবাদ বলবে

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সেদিন জমিন তার সংবাদ বর্ণনা করবে।' জমিন কী সংবাদ দেবে? আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই আয়াত তিলাওয়াত করে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো এর সংবাদ কী? সাহাবীরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, এর সংবাদ হলো, প্রত্যেক নারী-পুরুষ তার পিঠের ওপর যা করেছে, সে তার সাক্ষ্য দেবে। সে বলবে, অমুক দিন সে অমুক কাজ করেছিল। এটাই তার সংবাদ (জামে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)।

জমিন সাক্ষ্য দেবে ভালো ও মন্দ দুই ধরনের কাজেরই। বলবে, অমুক আমার পিঠে দাঁড়িয়ে অমুককে অন্যায়ভাবে মেরেছে, অমুক সম্পদ আত্মসাৎ করেছে, অমুক গোপনে অশ্লীল কাজ করেছে। আবার বলবে, অমুক আমার পিঠে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছে, আল্লাহর যিকির করেছে, অমুক সিজদা করেছে।

আজ প্রযুক্তির যুগে এই কথা বোঝা সহজ। মোবাইল, রেডিও, রেকর্ডার, কম্পিউটার, সবই জড় বস্তু, অথচ এগুলো থেকে মানুষের কণ্ঠ বের হয়। যেসব স্থানের কথা আমরা চিন্তাও করি না, সেসব স্থান কীভাবে সাক্ষ্য দিতে পারে, এ প্রশ্ন আর আগের মতো কঠিন মনে হয় না। পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'কারণ আপনার রব তাকে (জমিনকে) নির্দেশ দিয়েছেন।' জমিন যেন আগে থেকেই সবকিছু ধারণ করে রেখেছিল, শুধু আল্লাহর অনুমতির অপেক্ষায় আছে। আল্লাহ আদেশ করলেই সে সবকিছু বলে দেবে।

এই আয়াত গুনাহ থেকে বাঁচার একটি শক্তিশালী ধ্যান। যখনই গোপনে কোনো অন্যায়ের ইচ্ছা জাগে, তখন ভাবা উচিত, আমি যে জমিনের ওপর আছি, সেই জমিন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে। কেউ না দেখুক, জমিন সব দেখছে এবং রেকর্ড করছে।

এ থেকে আমরা ভালো আমলের একটি সুযোগও পাই। আমরা অনেক সময় গাড়িতে একশো-দুইশো কিলোমিটার ভ্রমণ করি। এই সময়ে যদি আমরা যিকির, তিলাওয়াত, দরূদ বা কোনো উপকারী পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকি, তাহলে এই বিস্তীর্ণ পথের জমিন আমার পক্ষে সাক্ষী দেবে, এমন আশা করা যায়। কাজেই সফরের সময় অলস না থেকে সদ্ব্যবহার করা ভালো।

❖ সূরা যিলযাল, আয়াত ৬

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَٰلَهُمْ ۝٦

[৬] সেদিন মানুষ বিভিন্ন দলে প্রকাশ পাবে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম দেখানো হয়।

আয়াত ৬: হাশরের ময়দানে বিভিন্ন দলে মানুষ

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘সেদিন মানুষ দলে দলে (বিক্ষিপ্তভাবে) বের হয়ে আসবে, যাতে তাদের কৃতকর্ম তাদের দেখানো হয়।’ ‘আশতাত’ অর্থ বিক্ষিপ্ত, আলাদা আলাদা। কবর থেকে উঠে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় হাশরের ময়দানের দিকে ছুটবে। কেউ নেককার দলে, কেউ বদকার দলে। সেদিন সবাই পরীক্ষার ফলাফলের অপেক্ষায় ব্যাকুল থাকবে, যেমন পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন ছাত্রছাত্রীরা উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করে।

সহীহ মুসলিমে জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক বান্দা যে অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে, সেই অবস্থায় পুনরুত্থিত হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে শহীদ হয়েছে, তার ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরতে থাকবে, কিন্তু সেই রক্ত থেকে মিশকের সুগন্ধ ছড়াবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তবে এখানে নিয়তের প্রশ্ন আছে। সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন প্রথম যাদের বিচার করা হবে, তাদের একজন সেই ব্যক্তি, যে যুদ্ধ করে নিহত হয়েছে। আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কী করেছ? সে বলবে, আমি আপনার জন্য যুদ্ধ করেছি, শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, তুমি যুদ্ধ করেছ এই জন্য যে লোকেরা তোমাকে বীর বলুক, আর তা বলাও হয়েছে। তারপর তাকে মুখ হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। একই বিচারে আছে আলেম ও দানশীল ব্যক্তি, যারা লোক-দেখানোর জন্য ইলম ও দান করেছিল। আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে নিয়তের ওপর।

❖ সূরা যিলযাল, আয়াত ৭–৮

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

[৭] অতঃপর কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে

وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ ﴿٨﴾

[৮] এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখতে পাবে।

আয়াত ৭–৮: অণু পরিমাণ ভালো-মন্দ

সপ্তম ও অষ্টম আয়াত এই সূরার সারকথা, ‘সুতরাং যে অণু পরিমাণ ভালো কাজ করবে, সে তা দেখবে। আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, সে তাও দেখবে।’

‘যার্‌রা’ অর্থ অতি ক্ষুদ্র কণা। বাঁশ বা বেড়ার ঘরের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে সূর্যের আলো এসে পড়লে সেই আলোয় যে ক্ষুদ্র ধুলোকণা ভেসে বেড়াতে দেখা যায়, যা ধরতে চাইলেও ধরা যায় না, সেটাই যার্‌রা। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, মাটিতে হাত রেখে ফুঁ দিলে

যে কণাগুলো উড়ে যায়, সেগুলোর প্রতিটিই যার্‌রা। এত সূক্ষ্ম পরিমাণ ভালো-মন্দ কাজও মানুষ সেদিন দেখতে পাবে।

ভালো কাজের ক্ষেত্রে রাতের অন্ধকারে চুপিসারে পড়া তাহাজ্জুদ, যা কেউ দেখেনি, কেউ প্রশংসা করেনি, তা সেদিন আমলনামায় জমা পাবে। রাস্তায় কেউ কলার খোসা ফেলে গেছে। আমি তা সরিয়ে দিয়েছি, কেউ জানেনি, কেউ ধন্যবাদ দেয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি রাস্তা থেকে কাঁটাযুক্ত গাছের ডাল সরিয়ে দিয়েছিল, আল্লাহ তার এই কাজের কদর করে তাকে ক্ষমা করে দিলেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তিনি আরও বলেছেন, তোমরা কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে কোরো না, এমনকি তোমার ভাইয়ের সঙ্গে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করাও (সহীহ মুসলিম)। তিনি বলেছেন, খেজুরের একটি টুকরো দিয়ে হলেও জাহান্নাম থেকে বাঁচো, তাও না পারলে একটি ভালো কথা দিয়ে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

মন্দ কাজের ক্ষেত্রেও একই কথা। কেউ হয়তো রাস্তায় ময়লা ফেলেছে, নিজের বাড়ির ময়লা প্রতিবেশীর বাড়ির সামনে রেখে এসেছে, ভেবেছে তাতে কী হলো। আল্লাহ সেটাও আমলনামায় লিখে রাখছেন। আমরা অনেক সময় ছোট গুনাহকে তুচ্ছ করে ফেলি। 'এটা তো মাকরূহ', 'এটা তো ছোট বিষয়', 'মানুষ তো আরও খারাপ করে'। আবার ভালো কাজকেও অনেকে অবহেলা করে, 'এটা তো সুন্নাত, ফরয তো না', 'এটা তো মুস্তাহাব'। দুটোই বিপজ্জনক মনোভাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা ছোট ছোট গুনাহ থেকে সাবধান থেকো। এগুলো জমতে জমতে মানুষকে ধ্বংস করে দেয়। তিনি দৃষ্টান্ত দিলেন, কয়েকজন লোক এক প্রান্তরে অবতরণ করল। প্রত্যেকে একটি করে কাঠ এনে জমা করল। দেখতে দেখতে এত কাঠ জমল যে তা দিয়ে তারা রুটি সেঁকতে পারল (মুসনাদে আহমাদ)। প্রতিটি কাঠ ছোট, কিন্তু একসঙ্গে বিশাল আগুন।

ভালো-মন্দের হিসাবে আল্লাহর অসীম দয়া প্রকাশ পেয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি ভালো কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু করতে পারল না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লেখেন। আর যদি করে ফেলে, তাহলে দশ থেকে সাতশো গুণ বা তারও বেশি নেকি লেখেন। আর যে মন্দ কাজের ইচ্ছা করল কিন্তু করল না, আল্লাহ তার জন্য একটি পূর্ণ নেকি লেখেন। আর যদি করে ফেলে, তাহলে মাত্র একটি গুনাহ লেখেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। ভালো কাজের প্রতিদান বহুগুণ, আর মন্দের শাস্তি যতটুকু অপরাধ ততটুকু। এ-ই আল্লাহর ইনসাফ ও রহমত। সূরা আনআমে আল্লাহ বলেছেন, কেউ একটি ভালো কাজ করলে সে তার দশগুণ পাবে, আর যে মন্দ কাজ করবে, সে শুধু তার সমান প্রতিফল পাবে (৬:১৬০)।

এই সূরা আমাদের শেখায়, দুনিয়ার যে সম্পদ ও পদের জন্য আমরা মারামারি, কাটাকাটি ও অন্যায়ে লিপ্ত, তা একদিন তুচ্ছ হয়ে যাবে। আর কিয়ামতের দিন প্রত্যেক জিনিস সাক্ষী দেবে। তাই ক্ষমতা ও শক্তিকে অপব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি করা বা আঘাত করার আগে ভাবা উচিত, এর হিসাব আমাকে দিতে হবে। জমিন, ফেরেশতা এবং আমার নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। তখন কেউ নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টাও করবে না, প্রত্যেকে নিজের অপরাধ স্বীকার করবে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কিয়ামতে সমগ্র পৃথিবী প্রচণ্ড কম্পনে কাঁপবে। যে সম্পদের জন্য মানুষ যুদ্ধ করে, তা সেদিন অযত্নে পড়ে থাকবে।
- জমিন আমাদের ভালো-মন্দ কাজের সাক্ষ্য দেবে। এই ভাবনা গোপন গুনাহ থেকে বাঁচতে সাহায্য করে।
- সফরসহ যেকোনো সময় যিকির, তিলাওয়াত ও ভালো কাজে ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত।
- আমলের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে নিয়তের ওপর। যুদ্ধ, দান বা ইলমও লোক-দেখানোর নিয়তে হলে মূল্যহীন।
- কোনো ভালো কাজকে তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়, আর কোনো ছোট গুনাহকেও হালকা ভাবা উচিত নয়।
- ভালো কাজের ইচ্ছাতেই নেকি লেখা হয়। মন্দ কাজের শাস্তি যতটুকু অপরাধ, ততটুকুই।
- ক্ষমতা ও শক্তির অপব্যবহার করে মানুষের ক্ষতি করার হিসাব আল্লাহর কাছে দিতে হবে।

অধ্যায় ২৩

সূরা আদিয়াত

العاديات

ঘোড়ার কৃতজ্ঞতা ও মানুষের অকৃতজ্ঞতা

কুরআনের ১০০তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১১টি

সূরা আদিয়াত কুরআনের ১০০তম সূরা। আয়াত সংখ্যা ১১। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি মক্কায় অবতীর্ণ, তবে কেউ কেউ মাদানী বলেছেন। এই সূরায় আল্লাহ তাআলা মানুষের একটি গভীর স্বভাবের কথা তুলে ধরেছেন, আর তা হলো অকৃতজ্ঞতা। আলোচনার শুরুটা অদ্ভুত। প্রথমে ঘোড়ার একটি চিত্র আঁকা হয়েছে, তারপর হঠাৎ ঘোষণা, মানুষ তার রবের প্রতি অকৃতজ্ঞ। আপাতদৃষ্টিতে দুটি বিষয়ের মধ্যে কোনো মিল নেই। কিন্তু এটি একটি চমৎকার উপস্থাপনরীতি, যেখানে শুরুতেই শ্রোতার মনোযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আর তারপর ঘোড়ার ঘটনা ও মানুষের অকৃতজ্ঞতার মধ্যে এক সূক্ষ্ম তুলনা সামনে এসেছে।

❖ সূরা আদিয়াত, আয়াত ১–৫

وَٱلْعَٰدِيَٰتِ ضَبْحًا ﴿١﴾

[১] শপথ ঊর্ধ্বশ্বাসে চলমান অশ্বসমূহের

فَٱلْمُورِيَٰتِ قَدْحًا ﴿٢﴾

[২] অতঃপর ক্ষুরাঘাতে অগ্নিবিচ্ছুরক অশ্বসমূহের

فَٱلْمُغِيرَٰتِ صُبْحًا ﴿٣﴾

[৩] অতঃপর প্রভাতকালে আক্রমণকারী অশ্বসমূহের

فَأَثَرْنَ بِهِۦ نَقْعًا ﴿٤﴾

[৪] ও যারা সে সময়ে ধুলি উৎক্ষিপ্ত করে

فَوَسَطْنَ بِهِۦ جَمْعًا ﴿٥﴾

[৫] অতঃপর যারা শত্রুদলের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে

আয়াত ১–৫: যুদ্ধের ঘোড়ার পাঁচটি দৃশ্য

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়াল আদিয়াতি দাবহা’, শপথ সেই ঘোড়ার, যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলে। ‘আদিয়াত’ অর্থ দ্রুত ধাবমান, আর ‘দাবহ’ অর্থ হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ানোর শব্দ। ঘোড়া যখন দ্রুত ছোটে, তার নিঃশ্বাসের আওয়াজ শোনা যায়।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ফাল মুরিয়াতি কাদহা’, অতঃপর যারা খুরের আঘাতে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ছড়ায়। ঘোড়ার ক্ষুরে সাধারণত লোহার নাল লাগানো হয়, যাতে পাথুরে পথে চলতে গিয়ে ক্ষুর ক্ষয়ে না যায়। দ্রুত ছোটার সময় এই লোহা পাথরের সঙ্গে ঘষা খেলে আগুনের ফুলকি বের হয়।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ফাল মুগিরাতি সুবহা’, অতঃপর যারা প্রভাতে আক্রমণ করে। যুদ্ধের একটি কৌশল হলো ভোরবেলা আক্রমণ, যখন শত্রু ঘুমে বা অসতর্ক থাকে। চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ফা আসারনা বিহী নাকআ’, অতঃপর তারা ধুলো উড়িয়ে দেয়। পঞ্চম আয়াতে, ‘ফা ওয়াসাতনা বিহী জামআ’, অতঃপর তারা শত্রুদলের মধ্যখানে ঢুকে পড়ে।

কিছু সাহাবী এখানে হজের উটের কথা বলেছেন, যারা আরাফাত থেকে মুযদালিফায় ছোটে। অধিকাংশ মুফাসসির, যাঁদের মধ্যে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা অন্যতম, এখানে জিহাদের ঘোড়ার কথা বলেছেন। এই ব্যাখ্যাই আয়াতগুলোর বর্ণনার সঙ্গে বেশি মেলে। ঘোড়া ইসলামে বিশেষ মর্যাদার প্রাণী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ঘোড়ার কপালের ঝুঁটিতে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ বাঁধা আছে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

❖ সূরা আদিয়াত, আয়াত ৬

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لِرَبِّهِۦ لَكَنُودٌ ﴿٦﴾

[৬] নিশ্চয় মানুষ তার পালনকর্তার প্রতি অকৃতজ্ঞ।

আয়াত ৬: ঘোড়ার তুলনায় মানুষ অকৃতজ্ঞ

ষষ্ঠ আয়াতে এই পাঁচ শপথের জবাব, ‘ইন্নাল ইনসানা লিরব্বিহী লাকানূদ’, নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ। ঘোড়ার দৃশ্যের পর হঠাৎ এ কথা শুনে অবাক হতে হয়। এর মধ্যে চমৎকার একটি যুক্তি আছে।

ঘোড়ার জন্য তার মালিক কী করে? একটি আস্তাবল দেয়, প্রতিদিন কিছু ঘাস-দানা ও পানি খেতে দেয়, আর এর বেশি বিশেষ কিছু নয়। তবু সেই ঘোড়া মালিকের ডাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায়। সে জানে, যেদিকে যাচ্ছে সেখানে মৃত্যু অপেক্ষা করছে। শত্রুদের মধ্যে তার নিজের জাতিভাই ঘোড়াও আছে, তবু সে আক্রমণ করে, মালিকের হুকুমে নিজেকে বিলিয়ে দেয়। একটুও পেছনে

তাকায় না, থামে না। শিক্ষা-দীক্ষাহীন এক চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে এই পরিমাণ আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা!

আর মানুষ? গর্ভে সৃষ্টির সূচনা থেকে শুরু করে মৃত্যুর পর কবর দেওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপে আল্লাহর অনুগ্রহ আমাদের ঘিরে আছে। অথচ সেই মানুষ নিজেকে জ্ঞানী, বিবেকবান ও সৃষ্টির সেরা মনে করে, কিন্তু ফজরের নামাযের জন্যও উঠতে পারে না, খাবার খেয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেও কার্পণ্য করে।

'কানূদ' শব্দের অর্থ অকৃতজ্ঞ। আরবরা যে জমিতে কিছুই ফলে না, তাকে 'আরদুন কানূদ' (অনুর্বর জমি) বলত। যে জমিতে যত পানি-সারই দেওয়া হোক, ফসল হয় না। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ 'কানূদ'-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, সে বিপদ-আপদের হিসাব রাখে আর নিয়ামত ভুলে যায়।

আমাদের অবস্থা কি এমন নয়? কেউ জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন? আমরা বলি, শরীর ভালো না, মাথা ব্যথা করছে। চোখ ভালো, কান ভালো, পেট ভালো, হাত-পা ভালো, শরীরের শতেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভালো, শুধু ব্যথাটাই চোখে পড়ে। জীবনের অর্জনের হিসাব করতে গেলেও আমাদের মনে আসে, একটি বাড়ি করতে পারিনি, দুটি গাড়ি কিনতে পারিনি, একটি কারখানা দাঁড় করাতে পারিনি। পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়ার তালিকা আমাদের কাছে অনেক দীর্ঘ।

অথচ যদি আমরা সত্যি ভাবি, অসংখ্য মানুষ আছে, যাদের একমাত্র স্বপ্ন দুটি চোখ ফিরে পাওয়া। দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে ঘরে বসে থাকা মানুষের একটাই আক্ষেপ, যদি পা-টা আগের মতো ভালো হতো, জীবনে আর কিছু চাইতাম না। আমরা শুধু সুস্থতার কথাই ভাবি, তাহলে অনেক লাখ মানুষের চেয়ে আমরা ভালো আছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিরাপদে সকাল করল, শারীরিকভাবে সুস্থ, তার কাছে সেদিনের খাবার আছে, তাকে যেন পুরো দুনিয়া দিয়ে দেওয়া হয়েছে (জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ)।

❖ সূরা আদিয়াত, আয়াত ৭–৮

وَإِنَّهُۥ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿٧﴾

[৭] এবং সে অবশ্য এ বিষয়ে অবহিত

وَإِنَّهُۥ لِحُبِّ ٱلْخَيْرِ لَشَدِيدٌ ﴿٨﴾

[৮] এবং সে নিশ্চিতই ধন-সম্পদের ভালবাসায় মত্ত।

আয়াত ৭–৮: সে নিজেই সাক্ষী এবং সম্পদের প্রতি তার আসক্তি

সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর নিশ্চয়ই সে এ বিষয়ে নিজেই সাক্ষী।' মানুষ জানে যে সে অকৃতজ্ঞ। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন, আল্লাহ তার এই কাজের সাক্ষী। উভয় ব্যাখ্যাই সম্ভব। তার বিবেক জানে, সে আল্লাহর অনুগ্রহের তুলনায় কত কম কৃতজ্ঞতা আদায় করছে।

ইবলীস যখন আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার কারণে অভিশপ্ত হয়ে বহিষ্কৃত হলো, তখন সে আল্লাহর কাছে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল। সে বলেছিল, আমি তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান দিক থেকে ও বাম দিক থেকে আসব, আর আপনি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবেন না (সূরা আ'রাফ ৭:১৭)। ইবলীস এই কাজেই সফল। আমরা প্রচুর নিয়ামত ভোগ করেও কৃতজ্ঞতা আদায় করি না।

অষ্টম আয়াতে এর কারণ বলা হয়েছে, 'আর নিশ্চয়ই সে সম্পদের ভালোবাসায় অত্যন্ত প্রবল (শাদীদ)।' এখানে সম্পদকে 'খাইর' (কল্যাণ) বলা হয়েছে। সম্পদ নিজে কল্যাণকর বস্তু, যদি তা সঠিকভাবে ব্যবহৃত হয়। যে সম্পদ আমাকে আল্লাহর কাছে নিয়ে যায়, কৃতজ্ঞতা শেখায়, দ্বীনের কাজে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেয়, মানুষের প্রতি মানবিক হতে সাহায্য করে, সেটি কল্যাণ। আর যে সম্পদ অহংকার, আল্লাহর অবাধ্যতা ও বিলাসিতায় ঠেলে দেয়, তা অকল্যাণ। সম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির কারণে মানুষের মধ্যে শুধু 'আরও চাই' মনোভাব তৈরি হয়। যতটুকু আছে, তার ওপর কৃতজ্ঞতা আসে না।

❖ সূরা আদিয়াত, আয়াত ৯–১১

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ﴿٩﴾

[৯] সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে, তা উত্থিত হবে

وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصُّدُورِ ﴿١٠﴾

[১০] এবং অন্তরে যা আছে, তা অর্জন করা হবে

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ﴿١١﴾

[১১] সেদিন তাদের কি হবে, সে সম্পর্কে তাদের পালনকর্তা সবিশেষ জ্ঞাত।

আয়াত ৯–১১: কবর থেকে উত্থান ও অন্তরের গোপন বিষয় প্রকাশ

নবম আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'সে কি জানে না, যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত করা হবে?' দশম আয়াতে, 'এবং অন্তরসমূহে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে।' 'হুসসিলা' অর্থ আলাদা করে প্রকাশ করা, যেমন খোসা থেকে শস্য আলাদা করা হয়। অন্তরে যা কিছু গোপন, ভালো-মন্দ নিয়ত, ইচ্ছা, সবকিছু সেদিন সামনে এসে যাবে।

একাদশ আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তাদের রব সেদিন তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত (খাবীর)।' 'খাবীর' বলা হয় তাঁকে, যিনি প্রতিটি বিষয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে জানেন, অস্পষ্ট বা অসম্পূর্ণভাবে নয়। আল্লাহ এ কথা বলে স্পষ্ট করে দিলেন, তাঁর কাছে কিছুই গোপন নেই, আর কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।

কৃতজ্ঞতা আদায়ের উপায়

এই সূরা আমাদের জিজ্ঞেস করে, একটা ঘোড়া যদি এত আনুগত্য দেখাতে পারে, আমরা কেন নয়? কৃতজ্ঞতা আদায়ের ব্যবহারিক উপায় তিনটি।

প্রথম, প্রতিটি কাজ ও নিয়ামতের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শেখানো দোয়াগুলো পড়া। ঘুম থেকে উঠে পড়ি, **আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আহইয়ানা বাদা মা আমাতানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর**, সকল প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের মৃত্যুর (ঘুমের) পর জীবিত করেছেন, আর তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে (সহীহ বুখারী)। কত মানুষ রাতে ঘুমিয়ে আর জাগেনি, অথচ আমি সুস্থভাবে জেগে উঠেছি, এ অনুভূতি নিয়ে দোয়া পড়লে অন্তরে কৃতজ্ঞতা জাগে। খাবারের পর পড়ি, **আলহামদুলিল্লাহিল্লাযী আতআমানা ওয়া সাকানা ওয়া জাআলানা মুসলিমীন** (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)। প্রায় প্রতিটি দোয়ার শুরুতেই 'আলহামদু' আছে। এই দোয়াগুলো অভ্যাসে পরিণত করলে ধীরে ধীরে প্রতিটি নিয়ামতের প্রতি সচেতনতা তৈরি হয়।

দ্বিতীয়, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যবহার করা। সুস্থতা দিয়েছেন, তা আল্লাহর ইবাদত ও মানুষের কল্যাণে ব্যয় করি। শক্তি দিয়েছেন, তা অন্যায়ে নয়, দ্বীনের কাজে ও মানবতার সেবায় ব্যয় করি। শুধু মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে ক্ষান্ত হলে কৃতজ্ঞতা আদায় হয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে এত দীর্ঘ নামায পড়তেন যে তাঁর পা ফুলে যেত। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বললেন, আপনার তো আগের-পরের সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে, তবু কেন এত কষ্ট? তিনি বললেন, আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হব না? (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতি নামাযের পর একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন, **আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি ইবাদাতিকা**, হে আল্লাহ, আপনার যিকির, শোকর ও উত্তমভাবে ইবাদত করতে আমাকে সাহায্য করুন (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী)।

তৃতীয়, মাঝেমধ্যে কেবল কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য নফল ইবাদত করা। আমরা সাধারণত বিপদে পড়লে সালাতুল হাজাত পড়ি। কখনো কি ভেবেছি, কোনো চাওয়া ছাড়াই শুধু আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের জন্য দুই রাকাত নামায পড়ি? মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম আট রাকাত নামায পড়েছিলেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, উম্মে হানী রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত)। সুসংবাদ পেলে শোকরের সিজদা করা সম্পর্কে হাদীস আছে (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে ইবনে মাজাহ), যদিও এর ধরন নিয়ে ফকীহদের মধ্যে কিছু মতভেদ আছে। আল্লাহর কাছে কিছু না চেয়ে শুধু ধন্যবাদ জানানোর এ অভ্যাসের প্রতিদান আল্লাহ অবশ্যই দেবেন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- মানুষ স্বভাবগতভাবে অকৃতজ্ঞ। একটি ঘোড়া যদি মালিকের প্রতি এত আনুগত্য দেখাতে পারে, মানুষের আরও বেশি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।
- আমরা নিয়ামত ভুলে যাই আর অভাব-অভিযোগের হিসাব রাখি। প্রাপ্তির তালিকা সামনে রাখলে কৃতজ্ঞতা বাড়ে।
- সুস্থতা, দৃষ্টি, শক্তি ও জীবন আল্লাহর বিশাল নিয়ামত। এগুলো যাঁরা হারিয়েছেন, তাঁদের কথা ভাবলে আমাদের নিয়ামতের মূল্য বোঝা যায়।
- ইবলীসের চ্যালেঞ্জ ছিল মানুষ অধিকাংশই কৃতজ্ঞ হবে না। কৃতজ্ঞ হওয়াই তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় প্রতিরোধ।
- সম্পদের অতিরিক্ত আসক্তি অকৃতজ্ঞতার বড় কারণ। সম্পদ কল্যাণকর হবে যদি তা আল্লাহর পথে ব্যয় হয়।
- কৃতজ্ঞতার তিন উপায়: মাসনূন দোয়া পড়া, নিয়ামতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা এবং কৃতজ্ঞতার নফল ইবাদত।
- আল্লাহ অন্তরের গোপন বিষয়ও জানেন। কিয়ামতে সবকিছু প্রকাশ পাবে।

অধ্যায় ২৪

সূরা ক্বারিআহ

القارعة

কিয়ামতের ভয়াবহ দৃশ্য ও আমলের পাল্লা

কুরআনের ১০১তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ১১টি

সূরা ক্বারিআহ কুরআনের ১০১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ১১। মক্কী জীবনের শেষ দিকে যখন মুশরিকদের অত্যাচার চরমে উঠেছিল, তখন এই সূরা নাযিল হয়। এই সূরায় মুমিনদের জন্য সুসংবাদ ও অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃসংবাদ, উভয়ই আছে। মূল বিষয়বস্তু হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে তার প্রাপ্য বুঝিয়ে দেবেন।

❖ সূরা ক্বারিআহ, আয়াত ১–৫

ٱلْقَارِعَةُ ﴿١﴾

[১] করাঘাতকারী

مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٢﴾

[২] করাঘাতকারী কি

وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴿٣﴾

[৩] করাঘাতকারী সম্পর্কে আপনি কি জানেন

يَوْمَ يَكُونُ ٱلنَّاسُ كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ ﴿٤﴾

[৪] যেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত

وَتَكُونُ ٱلْجِبَالُ كَٱلْعِهْنِ ٱلْمَنفُوشِ ﴿٥﴾

[৫] এবং পর্বতমালা হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত।

আয়াত ১–৫: মহাবিপর্যয়ের চিত্র

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আল-ক্বারিআহ’। ‘কারআ’ অর্থ সজোরে আঘাত করা বা কড়া নাড়া। গভীর নিস্তব্ধ রাতে হঠাৎ কেউ দরজায় কড়া নাড়লে মনে যেমন আতঙ্ক জাগে, কিয়ামতও তেমনই মানুষের অন্তরে সজোরে আঘাত করবে। এখানে ‘ক্বারিআহ’ কিয়ামতের একটি নাম। দ্বিতীয় আয়াতে প্রশ্ন, ‘মা আল-ক্বারিআহ’, মহাবিপর্যয় কী? তৃতীয় আয়াতে আরও জোর দিয়ে,

'আপনি কি জানেন মহাবিপর্যয় কী?' আল্লাহ প্রশ্ন করেন এবং নিজেই উত্তর দেন, যাতে শ্রোতার মনে কৌতূহল ও মনোযোগ জাগে।

চতুর্থ আয়াতে উত্তর, 'সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো।' 'ফারাশ' অর্থ পতঙ্গ বা পোকা। 'মাবসূস' অর্থ ছড়ানো-ছিটানো। পতঙ্গের সঙ্গে মানুষের মিল দুই দিক থেকে। এক, সংখ্যাধিক্য। আলো জ্বালালে যেমন অসংখ্য পোকা এক জায়গায় ছুটে আসে, তেমনি অসংখ্য মানুষ একসঙ্গে ছোটাছুটি করবে। দুই, দিশাহীনতা। পতঙ্গ যেমন এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়, কোনো স্থির পথ ধরে না, সেদিন মানুষও আতঙ্কে অস্থির হয়ে দিশেহারা হয়ে যাবে।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর পাহাড়গুলো হবে ধুনা রঙিন পশমের মতো।' 'ইহন' অর্থ রঙিন পশম, 'মানফূশ' অর্থ ধুনে ছড়ানো। পাহাড়গুলো বিভিন্ন রঙের হয়, কোনোটি সাদা, কোনোটি লাল, কোনোটি কালচে (সূরা ফাতির ৩৫:২৭)। সেদিন সেই পাহাড়গুলো রঙিন তুলার মতো ধুনা হয়ে বাতাসে উড়তে থাকবে। যে পাহাড়কে কেউ কখনো নাড়াতে পারেনি, সেই অটল পাহাড় সেদিন উড়ে যাবে।

এই বিপর্যয় শুরু হবে ইসরাফীল আলাইহিস সালামের ফুৎকারে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি কীভাবে শান্তিতে থাকতে পারি, যখন শিঙ্গাওয়ালা ফেরেশতা শিঙ্গা মুখে লাগিয়ে কপাল ঝুঁকিয়ে অপেক্ষা করছেন, কখন নির্দেশ হবে আর তিনি ফুঁ দেবেন (জামে তিরমিযী)। আমরা এখন কথা বলছি, আর তিনি সেই অবস্থায় আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন।

আমরা বজ্রপাতের শব্দ শুনে অনেক সময় ভয় পাই। শিঙ্গার ফুৎকারের আওয়াজ তার চেয়ে অসংখ্য গুণ বেশি ভয়াবহ হবে।

❖ সূরা ক্বারিআহ, আয়াত ৬–৯

فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٦﴾

[৬] অতএব যার পাল্লা ভারী হবে

فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴿٧﴾

[৭] সে সুখীজীবন যাপন করবে।

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَٰزِينُهُۥ ﴿٨﴾

[৮] আর যার পাল্লা হালকা হবে

فَأُمُّهُۥ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾

[৯] তার ঠিকানা হবে হাবিয়া।

আয়াত ৬–৯: মীযান ও দুই পরিণতি

ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘সুতরাং যার পাল্লা ভারী হবে, সে থাকবে সন্তোষজনক জীবনে (ঈশাতির রাযিয়াহ)।’ অষ্টম ও নবম আয়াতে, ‘আর যার পাল্লা হালকা হবে, তার আশ্রয় হবে ‘হাবিয়াহ’।’

এখানে আল্লাহর দয়ার একটি দিক লক্ষণীয়। আল্লাহ বলেননি যে একশোর মধ্যে নব্বই পেলে জান্নাত, পঞ্চাশ পেলে জাহান্নাম। তিনি বলেছেন, যার নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে জান্নাতে যাবে। আলেমগণ বলেছেন, পাল্লায় সামান্য একটি নেকিও যদি বেশি হয়, আল্লাহ তাকে জান্নাতে যাওয়ার সুযোগ দেবেন। আর যাদের নেকি ও গুনাহ সমান হবে, তাদের অবস্থান ‘আ'রাফ’ নামক স্থানে (সূরা আ'রাফ ৭:৪৬), পরে আল্লাহ যা ফয়সালা করবেন।

আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়। আল্লাহ বলেছেন পাল্লা ‘ভারী’ হওয়ার কথা, ‘বেশি’ হওয়ার কথা বলেননি। অর্থাৎ আমলের সংখ্যা নয়, ওজনই মূল। কে কত রাকাত পড়েছে, কত বছর পড়েছে, তার সংখ্যা মুখ্য নয়। ইখলাস, বিনয় ও একাগ্রতার মাধ্যমে আমলের ওজন নির্ধারিত হয়। একজন হয়তো জীবনে অল্প আমল করেছে, কিন্তু অত্যন্ত ইখলাসের সঙ্গে। তার আমল ভারী হবে। আরেকজন হয়তো পঞ্চাশ বছর নামায পড়েছে, কিন্তু খুশূ-খুযূ ছাড়া, তাড়াহুড়ো করে। তার আমল হালকা হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন এমন বিশাল মোটাসোটা মানুষ আসবে, যার ওজন আল্লাহর কাছে মশার একটি ডানার সমানও হবে না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আবার একটি বর্ণনায় আছে, ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর সরু পায়ের গোছা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, তাঁর দুটি পা মীযানে উহুদ পাহাড়ের চেয়েও ভারী হবে (মুসনাদে আহমাদ)।

কোন আমলগুলো মীযানে ভারী? হাদীসে বেশ কয়েকটির কথা এসেছে। এক, দুটি সহজ বাক্য, যা জিহ্বায় হালকা, মীযানে ভারী এবং আল্লাহর কাছে প্রিয়: ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম’ (সহীহ বুখারী, কিতাবের শেষ হাদীস ও সহীহ মুসলিম)। এটি ছোট, কিন্তু তার ওজন অনেক। দুই, ‘আলহামদুলিল্লাহ’ মীযানকে পূর্ণ করে দেয় (সহীহ মুসলিম)। তিন, কালেমা তাওহীদ। হাদীসে এসেছে, এক ব্যক্তির নিরানব্বইটি গুনাহের খাতা সামনে রাখা হবে, প্রতিটি দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। তখন তার একটি কার্ড (বিতাকা) এনে অপর পাল্লায় রাখা হবে, যাতে লেখা ‘আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু’। সেই কার্ডের ওজন সব খাতা অতিক্রম করে যাবে (জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ)। অবশ্য এই ওজন নির্ভর করে ইখলাসের ওপর। চার, উত্তম চরিত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মীযানে উত্তম চরিত্রের চেয়ে ভারী কিছু নেই (জামে তিরমিযী, সুনানে আবু দাউদ)।

আমরা সাধারণত নামায, রোযা ও সদকাকেই বড় আমল মনে করি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহার, হাসিমুখে কথা বলা, নম্র আচরণ, এগুলোও বিশাল আমল, যার ওজন কিয়ামতের দিন সবচেয়ে ভারী হবে। আমরা নামাযে অনেক মনোযোগী, কিন্তু ঘরে স্ত্রীর সঙ্গে, সন্তানের সঙ্গে, প্রতিবেশীর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার কেমন, তা-ও নিজেকে জিজ্ঞেস করা উচিত।

নবম আয়াতের 'উম্মুহু হাবিয়াহ' শব্দগুলোর আক্ষরিক অর্থ 'তার মা হাবিয়াহ'। 'উম্ম' (মা) শব্দটি আশ্রয় বা ঠিকানা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ হাবিয়াহ তার আশ্রয়স্থল। আবার 'হাবিয়াহ' ক্রিয়ার মূল অর্থ উপর থেকে নিচে পতিত হওয়া। কিছু মুফাসসির এর ব্যাখ্যা করেছেন, সে মাথা নিচু করে জাহান্নামে পড়বে। 'উম্ম' অর্থ মাথাও হয়, তাই এটি তার অবস্থার বর্ণনা। উভয় ব্যাখ্যাতেই ভয়াবহতা স্পষ্ট।

❖ সূরা ক্বারিআহ, আয়াত ১০–১১

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا هِيَهۡ ﴿١٠﴾

[১০] আপনি জানেন তা কি

نَارٌ حَامِيَةُۢ ﴿١١﴾

[১১] প্রজ্জ্বলিত অগ্নি

আয়াত ১০–১১: জাহান্নামের আগুন

দশম আয়াতে আল্লাহ জিজ্ঞেস করছেন, 'আপনি কি জানেন তা কী?' একাদশ আয়াতে উত্তর, 'এক প্রজ্বলিত আগুন (নারুন হামিয়াহ)।'

জাহান্নামের আগুন সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর ভাগের এক ভাগ। সাহাবীরা বললেন, এই আগুনই তো যথেষ্ট ছিল। তিনি বললেন, জাহান্নামের আগুন আরও উনসত্তর ভাগ বেশি উত্তপ্ত করা হয়েছে, প্রতিটি অংশ এই আগুনের মতো উত্তপ্ত (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আরেকটি বর্ণনায় আছে, জাহান্নামকে এক হাজার বছর জ্বালানো হয়েছে, ফলে তা লাল হয়েছে। আরও এক হাজার বছর জ্বালানো হয়েছে, ফলে তা সাদা হয়েছে। আরও এক হাজার বছর জ্বালানো হয়েছে, ফলে তা কালো হয়ে গেছে। এখন তা ঘোর অন্ধকার (জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ)।

জাহান্নামের শাস্তি শুধু আগুনের নয়, তাতে প্রচণ্ড শীতের শাস্তিও আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জাহান্নাম তার রবের কাছে অভিযোগ করল, হে আমার রব, আমার একাংশ আরেক অংশকে খেয়ে ফেলছে। তখন আল্লাহ তাকে দুটি নিঃশ্বাসের অনুমতি দিলেন, একটি শীতকালে, আরেকটি গ্রীষ্মকালে। দুনিয়ায় তোমরা যে প্রচণ্ড গরম অনুভব করো,

তা জাহান্নামের এক নিঃশ্বাস, আর যে তীব্র শীত অনুভব করো, তাও জাহান্নামের নিঃশ্বাস (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। জাহান্নাম আল্লাহর সঙ্গে কথা বলে, এ হাদীস তার প্রমাণ।

জান্নাত ও জাহান্নামের বিবরণ আমাদের বোঝানোর জন্য যতটুকু ভাষায় বলা সম্ভব, ততটুকুই বলা হয়েছে। প্রকৃত অবস্থা আমাদের কল্পনার বাইরে। জান্নাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে বর্ণনা করেছেন, আমি আমার নেক বান্দাদের জন্য এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছি, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের অন্তর কল্পনাও করেনি (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। জাহান্নামও তেমনই ভয়াবহ, যা কল্পনা করা সম্ভব নয়।

জাহান্নামের ভয়ে কান্না

আমাদের একটি অদ্ভুত অবস্থা। নাটক, সিনেমা ও উপন্যাসের চরিত্রের দুঃখে আমরা কেঁদে ফেলি, অথচ জানি, সবই অভিনয় ও কল্পনা। অথচ আমার নিজের জন্য সত্যিকারের জাহান্নাম অপেক্ষা করছে, তা শুনে আমার চোখে পানি আসে না। আমার মুনাজাতে চোখ ভিজে ওঠে না। যেন জান্নাত আমাদের জন্য আগেই বুক করা আছে, শুধু মৃত্যুর অপেক্ষা। আমরা এতটাই গাফেল। জান্নাতের আশা রাখা অবশ্যই ঈমানের অংশ, কিন্তু আমরা কেউ আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে যেতে পারব না। রহমত পেতে হলে নিজের আত্মসমালোচনা ও মুহাসাবার অভ্যাস থাকা চাই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে কাঁদে, সে জাহান্নামে যাবে না, যতক্ষণ না দুধ স্তনে ফিরে যায় (জামে তিরমিযী)। আর দুনিয়ার ভোগ-বিলাসে আমরা ডুবে আছি। তিনি আরও বলেছেন, আমি যা জানি, তোমরা যদি তা জানতে, তাহলে কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তিনি বলেছেন, দুটি চোখকে জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে না: যে চোখ আল্লাহর ভয়ে কাঁদে এবং যে চোখ আল্লাহর পথে পাহারায় জেগে থাকে (জামে তিরমিযী)।

এই সূরার শিক্ষা হলো, জান্নাত-জাহান্নামের আয়াত ও হাদীস নিয়মিত পাঠ করা, নিজের গুনাহের কথা স্মরণ করা এবং আল্লাহর ভয়ে কাঁদার চেষ্টা করা। আল্লাহ আমাদের এই তাওফীক দান করুন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- কিয়ামতের আকস্মিক আঘাত মানুষকে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো দিশেহারা করে দেবে। পাহাড় রঙিন ধুনা তুলার মতো উড়বে।
- আমলের সংখ্যার চেয়ে ওজন বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ইখলাস ও খুশূ আমলকে ভারী করে।
- ‘সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম’ সহজ কিন্তু মীযানে ভারী।

- উত্তম চরিত্র মীযানে সবচেয়ে ভারী আমলের একটি। মানুষের সঙ্গে সুন্দর আচরণও ইবাদত।
- জাহান্নামের আগুন দুনিয়ার আগুনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি উত্তপ্ত। তাতে তীব্র শীতের শাস্তিও আছে।
- জান্নাত ও জাহান্নামের প্রকৃত অবস্থা আমাদের কল্পনার বাইরে।
- আল্লাহর ভয়ে কান্না মুমিনের বড় সম্পদ। নিয়মিত আত্মসমালোচনা ও মুহাসাবা এতে সাহায্য করে।

অধ্যায় ২৫

সূরা তাকাসুর

التكاثر

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা যেভাবে মানুষকে গাফেল করে

কুরআনের ১০২তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৮টি

সূরা তাকাসুর কুরআনের ১০২তম সূরা। আয়াত সংখ্যা আট। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি মক্কী, কেউ কেউ মাদানী বলেছেন। এই সূরায় মানুষের একটি বিশেষ স্বভাব সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, আর তা হলো বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা। আমরা প্রত্যেকেই কোনো না কোনোভাবে এই প্রতিযোগিতায় জড়িত। যার একটি সাইকেল আছে, সে মোটরসাইকেলের স্বপ্ন দেখে। যার মোটরসাইকেল আছে, সে গাড়ির কথা ভাবে। গাড়ি কেনার পর ব্র্যান্ডের প্রতিযোগিতা শুরু হয়, আরও দামি, আরও আধুনিক মডেল।

শুরুতে প্রয়োজনই ছিল উদ্দেশ্য। মোটরসাইকেল বা পরিবারের জন্য একটি গাড়ি প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এক পর্যায়ে প্রয়োজন আর মূল কারণ থাকে না। তখন আরেকজনের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া, সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা এবং একটি ভাব তৈরি করাই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। মোবাইল, ঘড়ি, পোশাক, সর্বত্র একই চিত্র। পরের মডেল কী, পরের আপডেট কী, এ নিয়েই চিন্তা। এই মনোভাব শুধু বড়দের নয়, শিশুদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে। গেমের নতুন সংস্করণ, নতুন ডিভাইস, নতুন ব্র্যান্ড নিয়ে তাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতার সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো, আমরা জীবনের আসল উদ্দেশ্য ভুলে যাই।

❖ সূরা তাকাসুর, আয়াত ১–২

أَلْهَىٰكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ ﴿١﴾

[১] প্রাচুর্যের লালসা তোমাদেরকে গাফেল রাখে

حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمَقَابِرَ ﴿٢﴾

[২] এমনকি, তোমরা কবরস্থানে পৌঁছে যাও।

আয়াত ১–২: ‘প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের গাফেল করে রেখেছে’

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আলহাকুমুত তাকাসুর’, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদের মোহগ্রস্ত করে রেখেছে। ‘আলহা’ শব্দের মূল ‘লাহ’, যার অর্থ এমন কোনো কাজে মশগুল থাকা,

যা মানুষকে তার আসল কাজ থেকে গাফেল করে রাখে। কুরআনে দুনিয়ার জীবনকে 'লাহউ ও লায়িব' (খেলাধুলা ও তামাশা) বলা হয়েছে, যেমন সূরা আনআমে (৬:৩২)। খেলাধুলা কাজের ফাঁকে সামান্য বিনোদন, তা কখনো মূল লক্ষ্য হতে পারে না। 'তাকাসুর' অর্থ একে অপরকে ছাড়িয়ে বেশি অর্জনের প্রতিযোগিতা, সম্পদ, সন্তান, পদ, সামাজিক প্রভাব, সবকিছুতে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আদমসন্তানের যদি দুই উপত্যকা সোনা থাকে, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। মাটি ছাড়া আর কিছুই তার পেট ভরাতে পারে না। যে তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আমরা কাউকে দেখি না, যে কোটি টাকা অর্জন করে থেমে গেছে এবং আখিরাতমুখী হয়েছে। যার যত বড় কারখানা, সে আরও বড় কারখানার দিকে এগোয়। যার যত সম্পদ, তার ব্যস্ততা তত বাড়ে।

আমরা অনেকে ভাবি, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ হলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ইবাদতে মন দেব। কিন্তু বাস্তবে যে যত বেশি সম্পদ অর্জন করে, সে তত বেশি তাতে ডুবে যায়। সম্পদের কারণে পরিবারকে সময় দেওয়া তার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে যায়। একজন পরিশ্রমী রিকশাচালক হয়তো সন্ধ্যায় স্ত্রী-সন্তানের জন্য যে সময়টুকু পায়, বিশাল ব্যবসায়ী তা-ও পায় না।

সম্পদ বাড়লে সুখ বাড়ে, এটি ভুল ধারণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সম্পদের প্রাচুর্য প্রকৃত ধনাঢ্যতা নয়, প্রকৃত ধনাঢ্যতা হলো অন্তরের ধনাঢ্যতা (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। অনেক সময় ধনীর সম্পদ তার চোখে পড়েই না। তার সম্পদ ব্যাংকের হিসাবের কয়েকটি সংখ্যা মাত্র। সে তা স্পর্শও করে না, তার ওপর দাঁড়াতেও পারে না। কোটিপতি দিনে ছয়বার খায় না, তারা আমাদের মতোই খায়, অনেকে ডাক্তারের নির্দেশে আমাদের চেয়ে কম খায়। শেষ পর্যন্ত বিশাল সম্পদের এক ধরনের পাহারাদার ছাড়া আমরা আর কিছুই নই।

আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সূরা পড়ে বললেন, আদমসন্তান বলে, 'আমার সম্পদ, আমার সম্পদ'। কিন্তু তোমার সম্পদ তো কেবল ততটুকুই, যা তুমি খেয়ে শেষ করেছ, পরে পুরোনো করেছ, অথবা সদকা করে আখিরাতের জন্য আগে পাঠিয়েছ (সহীহ মুসলিম)। বাকি সব সম্পদ উত্তরাধিকারীদের। সে চোখ বন্ধ করামাত্র ভাগাভাগির জন্য লোকের লাইন দেরি করবে না।

বর্তমান যুগে প্রতিযোগিতার আরেকটি রূপ দেখা যায়, আমার ফলোয়ার কত, আমার লাইক কত, আমার সাবস্ক্রাইবার কত। এই ভার্চুয়াল খ্যাতির দৌড়ে অনেকে নিজের ব্যক্তিগত জীবন ও পরিবারের গোপনীয়তা বিক্রি করে ফেলছে। স্ত্রী, মা, বোন ও কন্যাকে ক্যামেরার সামনে এনে ভিডিও বানানো হচ্ছে। এর ফলাফল কী? একজন নারী যখন আমার সামনে দিয়ে যায়, শয়তান আমার মনে যেমন কুমন্ত্রণা দেয়, তেমনি আমার স্ত্রী, কন্যা বা বোনকে যারা ভিডিওতে দেখছে,

তাদের মনে কী আসে? তারা কি সবাই ফেরেশতা? এ প্রতিযোগিতার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই, তবু আমরা এতে ডুবে যাই। আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিন।

প্রসিদ্ধি, সম্পদ ও সামাজিক অবস্থান মানুষের চরিত্রের মান নিশ্চিত করে না। খ্যাতিমান ও ধনী হয়েও মানুষ নিজেকে চরম নৈতিক অধঃপতনে নিয়ে যেতে পারে। কাজেই আমাদের সন্তানদের সামনে কাউকে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরার আগে দেখতে হবে, তার চরিত্র ও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য কেমন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির', যতক্ষণ না তোমরা কবরে পৌঁছে যাও। এর দুটি প্রেক্ষাপট হতে পারে। এক, মক্কার কিছু গোত্র নিজেদের সংখ্যা নিয়ে গর্ব করত। বর্ণিত আছে, বনু আবদে মানাফ ও বনু সাহমের লোকেরা পরস্পর সংখ্যা নিয়ে গর্ব করল। তারা কবরস্থানে গিয়ে নিজেদের মৃত লোকদের কবর গুনে গর্ব করল, আমাদের এত লোক আছে। দুই, মানুষ মৃত্যু পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থাকে। উভয় অর্থই এই আয়াতে আছে।

এখানে 'যুরতুম' শব্দটি লক্ষ করার মতো। এর মূল 'যিয়ারত', অর্থ কারও সঙ্গে দেখা করা বা সাক্ষাৎ। কবরকে 'যিয়ারত' বলায় বোঝা যায়, কবর স্থায়ী ঠিকানা নয়, বরং এটি যাত্রাপথে একটি অস্থায়ী সাক্ষাৎ। চূড়ান্ত গন্তব্য আখিরাত।

❖ সূরা তাকাসুর, আয়াত ৩–৪

كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾

[৩] এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে।

ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾

[৪] অতঃপর এটা কখনও উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে।

আয়াত ৩–৪: 'কখনোই নয়, অচিরেই তোমরা জানতে পারবে'

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'কাল্লা সাওফা তা'লামূন', কখনোই নয়, তোমরা অচিরেই জানবে। চতুর্থ আয়াতে একই কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, 'সুম্মা কাল্লা সাওফা তা'লামূন'। এই পুনরাবৃত্তির ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ দুটি মত দিয়েছেন। এক, প্রথমবার মৃত্যুর সময় ও কবরে তারা এর ফল টের পাবে, দ্বিতীয়বার কিয়ামতের দিন জানতে পারবে। দুই, প্রথমবার সাধারণ মানুষকে এবং দ্বিতীয়বার কাফিরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে। দুটি অর্থই আয়াতে সম্ভব।

❖ সূরা তাকাসুর, আয়াত ৫–৭

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ﴿٥﴾

[৫] কখনই নয়; যদি তোমরা নিশ্চিত জানতে।

لَتَرَوُنَّ ٱلۡجَحِيمَ ٦

[৬] তোমরা অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيۡنَ ٱلۡيَقِينِ ٧

[৭] অতঃপর তোমরা তা অবশ্যই দেখবে দিব্য প্রত্যয়ে

আয়াত ৫–৭: ইয়াকীনের তিন স্তর

পঞ্চম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'কাল্লা লাউ তা'লামূনা ইলমাল ইয়াকীন', কখনোই নয়! যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞানের (ইলমুল ইয়াকীন) ভিত্তিতে জানতে। ষষ্ঠ আয়াতে, 'লা তারাওউন্নাল জাহীম', তাহলে অবশ্যই তোমরা জাহান্নাম দেখতে। সপ্তম আয়াতে, 'সুম্মা লা তারাওউন্নাহা আইনাল ইয়াকীন', অতঃপর অবশ্যই তোমরা তা দেখবে চাক্ষুষ নিশ্চয়তার সঙ্গে (আইনুল ইয়াকীন)।

ইয়াকীন বা নিশ্চিত বিশ্বাসের তিনটি স্তর আছে। প্রথম, 'ইলমুল ইয়াকীন', নিশ্চিত জ্ঞান। আমরা জানি, আগুন থাকলে ধোঁয়া হয়। এটি জ্ঞানের স্তর। দ্বিতীয়, 'আইনুল ইয়াকীন', চাক্ষুষ নিশ্চয়তা। আমরা নিজ চোখে আগুন জ্বলতে দেখলাম। তৃতীয়, 'হাক্কুল ইয়াকীন', পূর্ণ উপলব্ধি। আগুনের উষ্ণতা আমি নিজের শরীরে অনুভব করলাম। এই শেষ স্তরের কথা সূরা ওয়াকিয়ায় (৫৬:৯৫) ও সূরা হাক্কায় (৬৯:৫১) এসেছে।

এই সূরায় প্রথম দুই স্তর আছে। এখন আমরা জাহান্নামের কথা শুনে জানি, এটি ইলমুল ইয়াকীন। আল্লাহ যখন সবাইকে জাহান্নাম দেখাবেন, তা হবে আইনুল ইয়াকীন। কুরআনে বলা হয়েছে, তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে জাহান্নামের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে না। এটি তোমার রবের অনিবার্য ফয়সালা (সূরা মারইয়াম ১৯:৭১)। তারপর আল্লাহ মুত্তাকীদের রক্ষা করবেন এবং জালিমদের সেখানেই রেখে দেবেন (১৯:৭২)। আর যারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, তাদের শাস্তি পরিপূর্ণভাবে অনুভব করা হবে হাক্কুল ইয়াকীন।

আমাদের জাহান্নাম নিয়ে বিশ্বাসটি এখনো 'ইলমুল ইয়াকীন'-এর স্তরেও পূর্ণ দৃঢ় নয়। যদি এই জ্ঞান আমাদের মধ্যে দৃঢ় হতো, তাহলে প্রতিযোগিতার এই মোহ আমাদের গ্রাস করতে পারত না।

❖ সূরা তাকাসুর, আয়াত ৮

ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ ٨

[৮] এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।

আয়াত ৮: প্রতিটি নিয়ামতের হিসাব

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুম্মা লাতুসআলুন্না ইয়াওমাইযিন আনিন না'ঈম', অতঃপর সেদিন অবশ্যই তোমরা নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। কোনো নিয়ামতই এই প্রশ্ন থেকে বাদ যাবে না।

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন প্রচণ্ড ক্ষুধায় আবু বকর ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ঘর থেকে বের হলেন। পথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে দেখা, তিনিও একই কারণে বের হয়েছেন। তিনি তাঁদের নিয়ে আনসারী সাহাবী আবুল হাইসাম ইবনুত তাইয়িহান রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে গেলেন। তিনি তখন বাড়িতে ছিলেন না, কিছুক্ষণ পরেই ফিরলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও দুই সাহাবীকে দেখে আনন্দে বললেন, আজ আমার চেয়ে সৌভাগ্যবান মেহমানদারী আর কেউ করেনি। তিনি খেজুরের কাঁদি কেটে আনলেন, তাতে কাঁচা-পাকা খেজুর ছিল। তারপর একটি ছাগল যবেহ করলেন, খাবার প্রস্তুত করলেন। সবাই তৃপ্তি সহকারে খেলেন ও ঠান্ডা পানি পান করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এটাই সেই নিয়ামত, যার সম্পর্কে কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে। ঠান্ডা ছায়া, উত্তম খেজুর ও ঠান্ডা পানি (সহীহ মুসলিম)।

যে অবস্থায় তাঁরা ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়েছিলেন, সেই সামান্য খাবারও নিয়ামত বলে গণ্য হলো। তাহলে আমরা যারা প্রতিদিন তিন বেলা খাবার পাই, ঘর, বিছানা, বিদ্যুৎ, পানি ও সুস্থতা পাই, আমাদের নিয়ামত কত বেশি! জামে তিরমিযীর একটি হাদীসে এসেছে, কিয়ামতের দিন বান্দাকে প্রথম যে নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, তা হলো, আমি কি তোমার শরীরকে সুস্থ রাখিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি পান করাইনি? তিনি আরও বলেছেন, কিয়ামতের দিন কোনো বান্দা পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসিত না হওয়া পর্যন্ত এক কদমও সরতে পারবে না: তার জীবন কোথায় ব্যয় করেছে, যৌবন কোথায় কাটিয়েছে, সম্পদ কোথা থেকে অর্জন করেছে ও কোথায় ব্যয় করেছে, আর নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে (জামে তিরমিযী)।

আমরা অনেকে মনে করি, আমাদের জীবনের লক্ষ্য শুধু সকালে ঘুম থেকে উঠে অফিসে যাওয়া, সন্ধ্যায় ফিরে পরিবারের সঙ্গে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া। দ্বীনের কাজ করবেন আলেমরা বা অন্য কোনো বিশেষ মানুষ, আমার কোনো দায়িত্ব নেই। এ ধারণা ভুল। প্রত্যেকের জীবনের প্রতিটি নিয়ামত নিয়ে জবাবদিহি করতে হবে। দাতার হক কতটুকু আদায় করেছি, তাঁর বিধান অনুযায়ী জীবন কতটুকু চালিয়েছি, তাঁর দ্বীনের জন্য কতটুকু সময় ও সম্পদ ব্যয় করেছি, তা-ই প্রশ্ন। আজকের এই প্রতিযোগিতার যুগে আল্লাহ আমাদের কবরে যাওয়ার আগেই হিদায়াতের পথে ফিরে আসার তাওফীক দিন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- বেশি পাওয়ার প্রতিযোগিতা মানুষকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য থেকে গাফেল করে রাখে। মৃত্যু ছাড়া এই মোহ থামে না।
- প্রয়োজনের জন্য সম্পদ অর্জন দোষের নয়, কিন্তু প্রয়োজনের সীমা পেরিয়ে প্রতিযোগিতায় নামা ক্ষতিকর।
- সম্পদ বেশি হলে সুখ বেশি হয় না। প্রকৃত ধনাঢ্যতা অন্তরের তৃপ্তি।
- আমাদের প্রকৃত সম্পদ ততটুকুই, যা আমরা খেয়েছি, পরেছি ও সদকা করে আখিরাতে পাঠিয়েছি।
- সামাজিক মাধ্যমে ফলোয়ার ও লাইকের প্রতিযোগিতায় গোপনীয়তা ও পরিবারের সম্মান বিক্রি করা বড় ক্ষতি।
- কবর স্থায়ী ঠিকানা নয়, আখিরাতই চূড়ান্ত গন্তব্য।
- ইয়াকীনের তিন স্তর: ইলমুল ইয়াকীন, আইনুল ইয়াকীন ও হাক্কুল ইয়াকীন। জাহান্নামের ব্যাপারে বিশ্বাস দৃঢ় করা জরুরি।
- প্রত্যেকটি নিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ হবে। দাতার হক আদায় করা আমাদের দায়িত্ব।

অধ্যায় ২৬

সূরা আসর

العصر

মাত্র তিন আয়াতে মুক্তির পূর্ণ সূত্র

কুরআনের ১০৩তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৩টি

সূরা আসর কুরআনের ১০৩তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, নাযিলের দিক থেকে একেবারে প্রথম দিকের সূরাগুলোর একটি। আয়াত মাত্র তিনটি, কিন্তু এর বার্তা এত ব্যাপক যে ইমাম শাফিঈ রাহিমাহুল্লাহ এই সূরা সম্পর্কে বলেছেন, আল্লাহ যদি মানুষের জন্য এই সূরা ছাড়া আর কোনো প্রমাণ নাযিল না করতেন, তবে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হতো। অর্থাৎ পুরো কুরআনের সারনির্যাস যেন এই সূরায় আছে।

এই সূরার গুরুত্ব সাহাবীরা এতটা উপলব্ধি করেছিলেন যে বর্ণিত আছে, দুজন সাহাবী পরস্পর দেখা করলে আলাদা হওয়ার আগে একজন আরেকজনকে সূরা আসর পাঠ করে শোনাতেন (আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী)। এটি ছিল পরস্পরের জন্য স্মারক, আবার এই সূরার নির্দেশ অনুযায়ী নিজের জন্য একটি আমলও।

❖ সূরা আসর, আয়াত ১

وَٱلۡعَصۡرِ ١

[১] কসম যুগের (সময়ের)

আয়াত ১: ‘শপথ যুগের’

প্রথম আয়াতে আল্লাহ শপথ করেছেন, ‘ওয়াল আসর’। ‘আসর’ শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। এক, বিকেলের সময় বা আসরের নামায। দুই, সময়, যুগ বা মহাকাল।

আসরের নামাযের অর্থ নেওয়ার পক্ষে যুক্তি হলো, এই নামাযের গুরুত্ব অসামান্য। সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন, তোমরা সব নামায এবং মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি যত্নবান হও (২:২৩৮)। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে মধ্যবর্তী নামায হলো আসরের নামায (সহীহ মুসলিম, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার আসরের নামায ছুটে গেল, তার যেন পরিবার ও সম্পদ লুট হয়ে গেল (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

সময়ের অর্থ নেওয়ার পক্ষে যুক্তি হলো, সময় মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ। মানুষ যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ সে এক বিশাল সম্পদের মালিক, কারণ এই জীবনটাকে কাজে লাগিয়ে সে অনেক কিছু অর্জন করতে পারে। যে সময়ের মূল্য দেয়, সে-ই সফল হয়। আল্লাহ সময়ের শপথ করে এর গুরুত্ব স্পষ্ট করেছেন।

❖ সূরা আসর, আয়াত ২

إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ ﴿٢﴾

[২] নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

আয়াত ২: 'নিশ্চয়ই সব মানুষ ক্ষতির মধ্যে আছে'

দ্বিতীয় আয়াতে শপথের জবাব, 'ইন্নাল ইনসানা লাফী খুসর'। এখানে 'ইনসান' বলতে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা জাতিকে বোঝানো হয়নি। সমগ্র মানবজাতির কথা বলা হয়েছে। সবাই ক্ষতিতে আছে।

একজন মুফাসসির বর্ণনা করেছেন, তিনি এই সূরার মর্ম এক বরফবিক্রেতার কাছ থেকে বুঝেছিলেন। বরফবিক্রেতা রাস্তায় ডেকে বলছিল, ওই লোকের প্রতি দয়া করো, যার মূলধন গলে যাচ্ছে। তখন ফ্রিজ ছিল না। ক্রেতার হাতে তুলে দেওয়ার আগ পর্যন্ত বরফ গলতেই থাকত, ধীরে ধীরে কমত, শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হয়ে যেত। সেই মুফাসসির ভাবলেন, আমাদের জীবনও ঠিক এমন। আমরা সবাই সময়ের এক বিশাল পুঁজি নিয়ে এসেছি, ষাট, সত্তর বা আশি বছর। এই পুঁজি ব্যবহার না করলেও প্রতিনিয়ত গলে যাচ্ছে। হাসান বসরী রাহিমাহুল্লাহ বলতেন, আদমসন্তান কয়েকটি দিনের সমষ্টি। একটি দিন গেলে তার একটি অংশ চলে গেল।

কিন্তু শুধু ব্যস্ত থাকা যথেষ্ট নয়। আমরা অনেক কাজে ব্যস্ত, অথচ সেই কাজগুলো আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার জন্য কতটা ফলপ্রসূ, তা-ই আসল প্রশ্ন। আমাদের সফলতার মাপকাঠি সাধারণত সম্পদ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতা। কিন্তু কুরআনের মতে সত্যিকারের ক্ষতিগ্রস্ত তারা, যারা কিয়ামতের দিন নিজেদের ও পরিবারকে হারিয়েছে। আল্লাহ বলেছেন, জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি (সূরা যুমার ৩৯:১৫)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দুটি নিয়ামতের বিষয়ে অধিকাংশ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, সুস্থতা ও অবসর (সহীহ বুখারী)। সুস্থ অবস্থায় আমরা ইবাদতকে পিছিয়ে দিই। বার্ধক্যে এসে আফসোস করি, যৌবনে আরও রোযা রাখতাম, আরও ইবাদত করতাম। তখন নামাযে দাঁড়াতে গেলে বসতে কষ্ট, বসলে উঠতে কষ্ট। অবসরে খেলাধুলায় সময় কাটাই, ব্যস্ততা শুরু হলে বুঝি সেই সময়টা কাজে লাগালে ভালো হতো। শিক্ষার্থী জীবনেও আমরা এটি দেখেছি। সারা বছর পড়ার সুযোগ ছিল, পরীক্ষার দুদিন আগে হুঁশ হয়, রোজ একটি অধ্যায় পড়লে এত কষ্ট করতে হতো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরেকটি নসিহত করেছেন, পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটির আগে মূল্য দাও: বার্ধক্যের আগে যৌবনকে, অসুস্থতার আগে সুস্থতাকে, দারিদ্র্যের আগে সচ্ছলতাকে, ব্যস্ততার আগে অবসরকে এবং মৃত্যুর আগে জীবনকে (মুস্তাদরাকে হাকিম)।

❖ সূরা আসর, আয়াত ৩

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلۡحَقِّ وَتَوَاصَوۡاْ بِٱلصَّبۡرِ ٣

[৩] কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

আয়াত ৩: ক্ষতি থেকে বাঁচার চার শর্ত

তৃতীয় আয়াতে এই ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় বলা হয়েছে, ‘তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, সৎকর্ম করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে।’ এখানে চারটি গুণ। এর একটিও বাদ দিয়ে ক্ষতি থেকে মুক্তি নেই।

এক, ঈমান

ঈমান কী? আহলুস সুন্নাহর আলেমগণ এর তিনটি অংশের কথা বলেছেন। প্রথম, অন্তরে বিশ্বাস (তাসদীক)। কেউ মুখে বলল আমি ঈমান এনেছি, কিন্তু অন্তরে আল্লাহকে মানে না। তার পরিচয়পত্রে যা-ই লেখা থাকুক, সে মুমিন নয়। দ্বিতীয়, মুখে স্বীকার করা (ইকরার)। কেউ অন্তরে বিশ্বাস করে, কিন্তু মুখে স্বীকার করে না। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনা অনুযায়ী আবু তালিব মৃত্যুর সময়ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্যতা ভেতরে ভেতরে জানতেন বলে অনেক আলেম মন্তব্য করেছেন, কিন্তু কালেমা পড়তে সম্মত হননি। তখন আল্লাহ নাযিল করলেন, আপনি যাকে ভালোবাসেন, তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না (সূরা কাসাস ২৮:৫৬)। অন্তরের বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও মুখের স্বীকৃতির অভাবে তাঁর পরিণতি এমন হয়েছে। তৃতীয়, আমল। ফকীহদের মধ্যে আমলকে ঈমানের মূল অংশ ধরা হবে কি না, তা নিয়ে সামান্য ব্যাখ্যাগত পার্থক্য আছে। জমহুর সালাফের মতে আমল ঈমানের অংশ। হানাফী আলেমগণের মতে আমল ঈমানের পূর্ণতার অপরিহার্য অনুষঙ্গ। তবে ফলাফলের দিক থেকে সবাই একমত, আমলহীন ঈমান অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

আমরা একটি দৃষ্টান্ত নিতে পারি। ঈমান একটি বীজ, আর আমল তার ডালপালা ও পাতা। কেউ বলল, আমার কাছে বীজ আছে, কিন্তু তাতে কোনো অঙ্কুর বা ডাল নেই। এ বীজ শুকনো, তার মাটি ভেদ করে গজানোর শক্তি নেই। আবার কেউ বলল, আমার কাছে ডালপালা আছে, কিন্তু তার ভেতরে কাণ্ড বা শিকড় নেই। অমুসলিমদের অনেকে ভালো কাজ করে, মানুষের সেবা

করে, সত্য কথা বলে, ঠকায় না। এগুলো ভালো গুণ। কিন্তু ঈমান না থাকলে আখিরাতের জন্য সেগুলো শিকড়বিহীন। ঈমান থাকলে তার প্রকাশ ঘটে আমলে।

দুই, আমলে সালেহ

আমলে সালেহ হওয়ার জন্য দুটি শর্ত। এক, আমলটি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা। দুই, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পদ্ধতি অনুযায়ী করা। কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যে আমল, বাপ-দাদার ভুল প্রথা জেনেও অনুসরণ করা বা সমাজে চালু আছে বলে মেনে নেওয়া আমল নয়। আয়াতে 'অথবা' বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'এবং'। অর্থাৎ ঈমান ও আমলে সালেহ একসঙ্গে থাকতে হবে।

তিন, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ

এই তৃতীয় শর্ত সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। কেউ ভাবতে পারে, আমি ঈমান এনেছি, নামায পড়ি, তাহাজ্জুদ পড়ি, জান্নাতের টিকিট পাকা। অথচ আমার ছেলে নামায পড়ে না, মেয়ে পড়ে না, স্ত্রী দ্বীন মানে না, সমাজ ও জাতি নিয়ে আমার কোনো চিন্তা নেই। আল্লাহ বলছেন, এভাবে একা বাঁচার কোনো সুযোগ নেই।

একটি উদাহরণ নেওয়া যায়। শীতের রাতে ঘরে আগুন লেগেছে, আপনি ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ জেগে দেখলেন, আগুন জ্বলছে, আর আপনার শরীর আপনার ছোট ভাইয়ের শরীরের সঙ্গে বাঁধা। একা বের হওয়া সম্ভব নয়। তখন কী করবেন? আপনি ভাইকে ঠেলা দিয়ে ডাকবেন, ওঠো, ঘরে আগুন লেগেছে। নিজে বাঁচতে হলে তাকেও জাগাতে হবে। ঠিক এভাবে আল্লাহ উম্মাহর ধারণা দিয়েছেন। উম্মত হিসেবে আমরা একে অপরের সঙ্গে বাঁধা।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নৌকার একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। একটি নৌকায় কিছু লোক ওপরের তলায়, কিছু লোক নিচের তলায় আছে। নিচের তলার লোকেরা পানির জন্য ওপরে যেতে হয়। তারা ভাবল, আমরা নিচের তলা ফুটো করে নিই, তাহলে আর ওপরের লোকদের কষ্ট দিতে হবে না। যদি ওপরের লোকেরা তাদের বাধা না দেয়, সবাই ডুবে মরবে। আর যদি বাধা দেয়, সবাই রক্ষা পাবে (সহীহ বুখারী)। কাজেই সত্যের উপদেশ ও সৎকাজের আদেশ কেবল আলেমদের দায়িত্ব নয়, প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব।

সত্যের উপদেশ দিতে গেলে সমাজের প্রচলিত ধারণা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কথা বলতে হয়। তখন কষ্ট আসে, লোকে আপনাকে খারাপ ভাবে। আপনি ঘুষ খান না বলে কারও কারও স্বার্থে আঘাত লাগে। এ কারণেই আল্লাহ চতুর্থ শর্ত যুক্ত করেছেন।

চার, পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ

সবর তিন প্রকার।

প্রথম, ইবাদতে সবর। ফজরের নামায কোনোমতে দুই মিনিটে না সেরে মনোযোগের সঙ্গে সময় নিয়ে পড়া একটি ধৈর্যের পরীক্ষা। তারাবির নামাযে দেড় থেকে দুই ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকাও সবর।

দ্বিতীয়, গুনাহ থেকে বিরত থাকার সবর। মন চায় চোখকে হারামে নিয়ে যেতে। মন চায় একটি স্বাক্ষর দিয়ে ঘুষের মোটা অঙ্ক পকেটে ভরতে। তখন 'আল্লাহ আমাকে দেখছেন' ভেবে নিজেকে সংযত রাখা এই সবর।

তৃতীয়, বিপদ-আপদে সবর। আপনি সৎপথে চলেন বলে রোগ, অভাব ও নানা সংকটে আছেন, আর প্রতিবেশী অন্যায় করেও বাহ্যত আরামে আছে। তখন ধৈর্য ধরা।

এখানে একটি ভুল বোঝাবুঝি দূর করা দরকার। অনেকে সবরকে নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকা মনে করে। কেউ কেউ বলে, ধৈর্য ধরো, সব ঠিক হয়ে যাবে। এটি সবরের সঠিক অর্থ নয়। আপনি সমাজে দ্বীনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন, কিন্তু কিছুই না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলেন, এটি সবর নয়। সবর হলো নিজের সাধ্যমতো প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং সেই পথে যে বিপদ আসে, তাতে নিজেকে সংযত ও অবিচল রাখা।

সব মিলিয়ে সূরা আসর বলছে, ক্ষতি থেকে বাঁচতে হলে চারটি গুণ একসঙ্গে থাকতে হবে। এক, ঈমান, যা সত্যের পথ দেখায় ও আনুগত্য শেখায়। দুই, আমলে সালেহ, যা ইখলাস ও সুন্নাহর আলোকে হবে। তিন, নিজের পরিবার, সমাজ ও উম্মাহকে সত্যের দিকে ডাকা। চার, এই পথে আসা কষ্টে নিজে ধৈর্য ধরা এবং অন্যকে ধৈর্যের উপদেশ দেওয়া। জান্নাতের পথে একা হাঁটার কোনো ব্যবস্থা নেই। সবাইকে নিয়ে যেতে হবে।

সাহাবীদের এই অভ্যাস থেকে আমাদের শেখার আছে। দেখা হলে আমরা একে অপরকে উপদেশ দিতে পারি, সংক্ষেপে হলেও কোনো ভালো কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারি। নিজে একা আমল করলেই হবে না, জাতিকে নিয়ে, উম্মাহকে নিয়ে আমল করতে হবে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- সময় মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি। এটি প্রতিনিয়ত ক্ষয় হচ্ছে। যে সময়ের সদ্ব্যবহার করে, সে-ই সফল।
- সুস্থতা ও অবসর, এই দুটি নিয়ামতের মূল্য আমরা অনেক সময় ঠিকমতো বুঝি না।
- ক্ষতি থেকে বাঁচার চারটি শর্ত: ঈমান, আমলে সালেহ, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ ও পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ। একটিও বাদ দেওয়া যাবে না।
- ঈমানের অংশ অন্তরের বিশ্বাস ও মুখের স্বীকৃতি। আমলহীন ঈমান ঝুঁকিপূর্ণ।
- আমল গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত ইখলাস ও সুন্নাহর অনুসরণ।
- নিজে বাঁচলেই চলবে না। পরিবার, সমাজ ও উম্মাহকে সত্যের দিকে ডাকা দায়িত্ব।

- সবর মানে চুপচাপ বসে থাকা নয়, বরং চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া এবং সেই পথে আসা কষ্টে অবিচল থাকা।
- ইবাদতে, গুনাহ থেকে বাঁচতে এবং বিপদ-আপদে, তিন ক্ষেত্রেই সবর প্রয়োজন।

অধ্যায় ২৭

সূরা হুমাযাহ

الهمزة

পরনিন্দা ও সম্পদের মোহের পরিণতি

কুরআনের ১০৪তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৯টি

সূরা হুমাযাহ কুরআনের ১০৪তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা নয়। এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে একটি বদস্বভাবের নামে, যা সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলা এখানে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। সূরায় তিনটি দোষের উল্লেখ আছে: পেছনে নিন্দা করা (হুমাযা), সামনে ভর্ৎসনা বা অপমান করা (লুমাযা) এবং সম্পদ জমিয়ে বারবার গোনা। তাফসীরের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত আছে, এই আয়াতগুলো প্রথমত ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, কারও কারও মতে আখনাস ইবনে শারীক বা উমাইয়া ইবনে খালাফের ক্ষেত্রে নাযিল হয়েছে। তবে এটি ব্যক্তি-নির্দিষ্ট নয়, একটি রোগ। যার মধ্যেই এই রোগ পাওয়া যাবে, সে একই সতর্কবাণীর আওতায় পড়বে।

❖ সূরা হুমাযাহ, আয়াত ১

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ﴿١﴾

[১] প্রত্যেক পশ্চাতে ও সম্মুখে পরনিন্দাকারীর দুর্ভোগ

আয়াত ১: ‘ধ্বংস প্রত্যেক পেছনে ও সামনে নিন্দাকারীর জন্য’

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযাহ’। ‘ওয়াইল’ শব্দের ব্যাখ্যা আমরা সূরা মুতাফফিফীনে দেখেছি: ধ্বংস, দুর্ভোগ, জাহান্নামের একটি উপত্যকা। মানুষ যখন কাউকে অভিশাপ দেয়, সে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে, হে আল্লাহ, তাকে ধ্বংস করুন। কিন্তু আল্লাহ যখন বলেন ‘ধ্বংস’, তা কারও কাছে প্রার্থনা নয়, তা তাঁর ফয়সালা। এ ঘোষণা অনিবার্য। ‘হুমাযা’ ও ‘লুমাযা’ শব্দ দুটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত আছে। সহজে মনে রাখার জন্য সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাটি এই। ‘হুমাযা’ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের পেছনে তার বদনাম করে, নিন্দা রটায়। ‘লুমাযা’ সেই ব্যক্তি, যে সামনাসামনি মানুষকে তিরস্কার করে, লজ্জা দেয়, অপমান করে। অন্য মতে হুমাযা হলো যে মুখের কথা দিয়ে কষ্ট দেয়, আর লুমাযা হলো যে চোখ, হাত বা ইশারা-ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ করে (ইবনে কাসীর)। উভয় ব্যাখ্যাতেই মূল কথা এক: মানুষের মর্যাদা নষ্ট করার সব পথ এই আয়াতে নিষিদ্ধ।

হুমাযা: গীবত ও অপবাদ

পেছনে নিন্দা করার সহজ ভাষা 'গীবত'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গীবতের সংজ্ঞা দিয়েছেন। সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো গীবত কী? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, তোমার ভাইয়ের এমন কথা আলোচনা করা, যা সে অপছন্দ করে। কেউ জিজ্ঞেস করল, যদি আমি যা বলছি তা তার মধ্যে সত্যিই থাকে? তিনি বললেন, তোমার কথা যদি তার মধ্যে থাকে, তাহলেই তুমি গীবত করেছ। আর যদি তার মধ্যে না থাকে, তাহলে তুমি তার ওপর অপবাদ (বুহতান) দিয়েছ (সহীহ মুসলিম)।

আমরা অনেকে বলি, আমি তো তার সামনেও এ কথা বলতে পারব। এতে কেউ বাঁচে না। কথাটি তার মধ্যে আছে বলেই তো বলছি। সেটাই গীবত। আর যদি না থাকত, তাহলে তা হতো অপবাদ, যা আরও ভয়াবহ।

কুরআনে আল্লাহ গীবতের ঘৃণ্যতা তুলে ধরেছেন, তোমরা একে অপরের গীবত কোরো না। তোমাদের কেউ কি পছন্দ করবে, তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে? তোমরা তা ঘৃণা করো (সূরা হুজুরাত ৪৯:১২)। আমাদের অবস্থা হলো, দুজন মানুষ কোথাও বসলে তৃতীয় একজন আলোচনায় চলে আসে। গীবত আমাদের কাছে মুখরোচক, যেন ঘি দিয়ে ভাত মাখা। অথচ এটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মতো ঘৃণ্য।

গীবত কখন বৈধ?

শরীয়তে কিছু ক্ষেত্রে মানুষের দোষ আলোচনা করা বৈধ, কোথাও কোথাও জরুরিও। ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ রিয়াদুস সালেহীনে এমন ছয়টি ক্ষেত্র উল্লেখ করেছেন। মূলনীতি হলো, যেখানে দ্বীন ও মানুষের বৈধ স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে তা বলতে হয়, সেখানে বলা বৈধ। যেমন:

- জুলুমের শিকার ব্যক্তি বিচারক বা কর্তৃপক্ষের কাছে জালিমের অন্যায় তুলে ধরা।
- অন্যায় প্রতিরোধে সক্ষম ব্যক্তির সাহায্য চাওয়ার জন্য ঘটনা বলা।
- ফতোয়া চাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় তথ্য দেওয়া।
- মুসলমানদের ক্ষতি থেকে বাঁচাতে সতর্ক করা। যেমন বিয়ের পরামর্শের ক্ষেত্রে, ব্যবসায়িক অংশীদার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে, হাদীসের বর্ণনাকারীদের যাচাইয়ে।
- যে প্রকাশ্যে গুনাহ করে বেড়ায়, তার প্রকাশ্য গুনাহ আলোচনা করা।
- যাকে কোনো পরিচয়ে চেনা যায় না, সেই পরিচয়ে উল্লেখ করা, যদি অন্য উপায় না থাকে।

বিয়ের পরামর্শের ক্ষেত্রে হাদীসেই দৃষ্টান্ত আছে। ফাতিমা বিনতে কায়স রাদিয়াল্লাহু আনহা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানালেন, আবু জাহম ও মুআবিয়া তাঁকে বিয়ের

প্রস্তাব দিয়েছেন। তিনি বললেন, মুআবিয়া দরিদ্র, তাঁর সম্পদ নেই। আর আবু জাহম, তিনি লাঠি কাঁধ থেকে নামান না (অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি কঠোর)। তুমি উসামাকে বিয়ে করো (সহীহ মুসলিম)।

ধরুন, আপনার কাছে কেউ ছেলে বা মেয়ের বিয়ের জন্য কারও সম্পর্কে জানতে এল। আপনি জানেন, ছেলেটি নেশা করে। আপনি যদি গীবত হয়ে যাবে ভয়ে মিথ্যা প্রশংসা করে বলেন, ছেলে খুব ভালো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে, তাহলে আপনি একটি মেয়ের জীবন নষ্ট করলেন। এখানে প্রয়োজন অনুযায়ী ইঙ্গিতে বা সরাসরি বলে দিতে হবে, আমার কাছে তাঁর বিষয়ে ভালো কিছু জানা নেই, আপনি ভালো করে খোঁজ নিন। কিন্তু এই সুযোগে তার সব পুরোনো বদনাম, বাবার সঙ্গে শত্রুতার ঝাল মেটানোর কথা টেনে আনা যাবে না। প্রয়োজনের বেশি এক শব্দও বলা যাবে না।

হাদীসশাস্ত্রের কিতাবগুলোতে বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে 'অমুক মিথ্যাবাদী', 'অমুক দুর্বল' ইত্যাদি মন্তব্য থাকে। এটি গীবত নয়, উম্মতের স্বার্থে রাসূলের হাদীস রক্ষার জন্য। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ এমন মন্তব্য করেও বলেছেন, আমি আশা করি, আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করব এমন অবস্থায় যে গীবতের জন্য কেউ আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না। কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল দ্বীনের হেফাজত। গীবত তখনই গুনাহ, যখন তাতে উম্মতের কোনো স্বার্থ নেই।

লুমাযা: সামনে অপমান ও তিরস্কার

কেউ কেউ বলে, আমি কাউকে পরোয়া করি না, যা বলার মুখের ওপর বলে দিই। এটি গর্বের বিষয় নয়, এটি সতর্ক হওয়ার বিষয়। কাউকে সংশোধন করতে হলে তার পদ্ধতি আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো সমস্যা দেখলে নাম ধরে কাউকে অপমান করতেন না। তিনি বলতেন, লোকদের কী হলো, তারা এমন করছে কেন? (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। একবার কিছু সাহাবী ওযুর সময় গোড়ালি শুকনো রেখে দিয়েছিলেন। তিনি সাধারণভাবে বললেন, গোড়ালিগুলোর জন্য জাহান্নামের আগুনের দুর্ভোগ (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। যিনি বোঝার, তিনি বুঝে নিয়ে সংশোধন হয়ে যেতেন।

আমরা যাঁরা দল বা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করি, তাঁদের জন্য এটি আদর্শ পদ্ধতি। প্রথমে সাধারণভাবে সবাইকে সতর্ক করা, যাতে যার ভুল, সে নিজে বুঝে নেয়। তাতে কাজ না হলে তাকে একান্তে ডেকে বা ব্যক্তিগতভাবে জানানো। সবার সামনে লাঞ্ছিত করা নয়। একজন শিক্ষক বা অভিভাবক রাগের মাথায় যে শাস্তি বা তিরস্কার করেন, তাতে অপরাধের চেয়ে বেশি শাস্তি হয়ে যেতে পারে। হাদীসে এসেছে, কোনো বিচারক রাগান্বিত অবস্থায় দুজনের মধ্যে ফয়সালা করবে না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তাকে সংশোধন করার অধিকার আমার আছে, কিন্তু দশজনের সামনে করলে সংশোধনের সঙ্গে লাঞ্ছনা যুক্ত হয়ে অপরাধ আরও বেড়ে যায়।

পারিবারিক জীবনেও এই শিক্ষা প্রযোজ্য। স্ত্রী অনেক কষ্ট করে রান্না করে এনেছেন। আপনি মুখে দিয়ে অতিথিদের সামনে বললেন, তুমি এখনো রান্না শিখলে না, বলেছিলাম না ঝাল কম দিতে! তিনি তাঁর সাধ্যমতো চেষ্টা করেছেন, অথচ আপনার কথায় অপমানিত বোধ করলেন। এ-ই লুমাযা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনো কোনো খাবারের দোষ ধরেননি। পছন্দ হলে খেতেন, না হলে রেখে দিতেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তিনি আরও বলেছেন, মুমিন কখনো তিরস্কারকারী, অভিশাপকারী, অশ্লীল ও কটুভাষী হয় না (জামে তিরমিযী)। কোমলতা যেকোনো জিনিসকে সুন্দর করে, আর কোমলতা তুলে নিলে তা কুৎসিত হয়ে যায় (সহীহ মুসলিম)।

বান্দার হকের ক্ষেত্রে আল্লাহ অত্যন্ত কঠোর। আল্লাহ গাফুরুর রাহীম, তিনি নিজের হক ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু বান্দার হক বান্দা ক্ষমা না করলে আল্লাহ ক্ষমা করেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, নিঃস্ব কে? সাহাবীরা বললেন, যার টাকাপয়সা ও সম্পদ নেই। তিনি বললেন, আমার উম্মতের নিঃস্ব সে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও যাকাত নিয়ে আসবে, কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারও ওপর অপবাদ দিয়েছে, কারও সম্পদ খেয়েছে, কারও রক্ত ঝরিয়েছে, কাউকে মেরেছে। তখন তার নেকি থেকে এদের পাওনা মেটানো হবে। নেকি শেষ হয়ে গেলে ওদের গুনাহ তার ঘাড়ে চাপিয়ে তাকে জাহান্নামে ফেলা হবে (সহীহ মুসলিম)।

❖ সূরা হুমাযাহ, আয়াত ২–৩

ٱلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُۥ ﴿٢﴾

[২] যে অর্থ সঞ্চিত করে ও গণনা করে

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُۥٓ أَخْلَدَهُۥ ﴿٣﴾

[৩] সে মনে করে যে, তার অর্থ চিরকাল তার সাথে থাকবে

আয়াত ২–৩: সম্পদ জমানো ও গোনার নেশা

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘যে সম্পদ জমা করে এবং বারবার গোনে।’ সম্পদ গোনা দোষের নয়। কারও কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিলে গুনে নেওয়াই স্বাভাবিক। এখানে গণনার অর্থ সম্পদের প্রতি এমন মোহ, যা তাকে বারবার গোনায়, নাড়াচাড়া করায়, উল্টে-পাল্টে দেখায়। একটি নেশার মতো কাজ করে, আমার এত সম্পদ, আমি অনেক বড়।

আয়াতের মর্ম হলো, সে সম্পদ জমা করে কিন্তু তার হক আদায় করে না। যাকাত দেয় না। যাকাত ছাড়াও সম্পদের আরও কিছু হক আছে: আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, মেহমান, ইয়াতীম, মিসকিন ও অভাবী মানুষ। আল্লাহ বলেছেন, তাদের সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতদের হক আছে (সূরা

যারিয়াত ৫১:১৯)। যে সম্পদ জমিয়ে রাখে এবং আল্লাহর পথে খরচ করে না, তাদের জন্য কঠিন শাস্তির সংবাদ আছে (সূরা তাওবা ৯:৩৪–৩৫)।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'সে মনে করে, তার সম্পদ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে (আখলাদাহু)।' সম্পদ যার জীবনের মূল লক্ষ্য, সারাদিন যার চিন্তা সম্পদ নিয়ে, সে ভুলে যায় যে মৃত্যু অবধারিত।

❖ সূরা হুমাযাহ, আয়াত ৪–৯

كَلَّا لَيُنۢبَذَنَّ فِي ٱلۡحُطَمَةِ ٤

[৪] কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে পিষ্টকারীর মধ্যে।

وَمَآ أَدۡرَىٰكَ مَا ٱلۡحُطَمَةُ ٥

[৫] আপনি কি জানেন, পিষ্টকারী কি

نَارُ ٱللَّهِ ٱلۡمُوقَدَةُ ٦

[৬] এটা আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি

ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلۡأَفۡـِٔدَةِ ٧

[৭] যা হৃদয় পর্যন্ত পৌছবে।

إِنَّهَا عَلَيۡهِم مُّؤۡصَدَةٞ ٨

[৮] এতে তাদেরকে বেঁধে দেয়া হবে

فِي عَمَدٖ مُّمَدَّدَةِۭ ٩

[৯] লম্বা লম্বা খুঁটিতে।

আয়াত ৪–৯: 'হুতামা' ও আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'কখনোই নয়! তাকে অবশ্যই 'হুতামা'-তে নিক্ষেপ করা হবে।' 'হুতামা' জাহান্নামের একটি নাম। এর মূল অর্থ যা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়। যে সম্পদ ও সম্মান নিয়ে মানুষ অহংকার করেছে, সেই দাম্ভিক মানুষকে সেখানে ভেঙে চুরমার করা হবে। পঞ্চম আয়াতে প্রশ্ন, 'আপনি কি জানেন হুতামা কী?' ষষ্ঠ আয়াতে উত্তর, 'আল্লাহর প্রজ্বলিত আগুন (নারুল্লাহিল মুকাদা)।'

আগুনকে 'আল্লাহর আগুন' বলায় এর বিশেষ ভয়াবহতা বোঝা যায়। আল্লাহ যে জিনিসকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করেন, তা বিশেষ মর্যাদা পায়। সেটি ভালো হলে সর্বোচ্চ ভালো। যেমন 'বাইতুল্লাহ'। আর এটি আগুনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হলে তা সর্বোচ্চ ভয়াবহ।

সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'যা অন্তর পর্যন্ত পৌঁছে যাবে (তাত্তালিউ আলাল আফইদাহ)।' দুনিয়ার আগুন শরীর পোড়ায়, কিন্তু অন্তর পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই মানুষের মৃত্যু হয়ে যায়। জাহান্নামে মৃত্যু নেই। ফলে আগুন তার চামড়া, হাড়, এমনকি অন্তরকেও পোড়াবে, আর সে প্রতিটি কষ্ট অনুভব করবে। আল্লাহ বলেছেন, সেখানে সে মরবেও না, বাঁচবেও না (সূরা আ'লা ৮৭:১৩)।

গীবতের অপরাধের সঙ্গে শাস্তির মিল আছে। কুরআন গীবতকে মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করেছে। এর শাস্তি হিসেবে আগুন তার দেহের মাংস ও অন্তর খেয়ে ফেলবে, এমন ইঙ্গিত থাকতে পারে। আল্লাহই ভালো জানেন।

অষ্টম আয়াতে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই তা তাদের ওপর পরিবেষ্টিত থাকবে (মু'সাদা)।' নবম আয়াতে, 'দীর্ঘ স্তম্ভসমূহে (ফী আমাদিম মুমাদ্দাদাহ)।' এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিরদের দুটি মত আছে। এক, আগুনের শিখা এত লম্বা হবে যে তা দীর্ঘ স্তম্ভের মতো দেখাবে। আমরা মোমবাতির সরু শিখা দেখি, জাহান্নামের শিখা তার চেয়ে অনেক গুণ উঁচু ও ভয়াবহ হবে। দুই, জাহান্নামে বাস্তবেই দীর্ঘ স্তম্ভে পাপীদের বাঁধার ব্যবস্থা থাকবে। 'মু'সাদা' অর্থ দরজা বন্ধ করে দেওয়া, অর্থাৎ বের হওয়ার কোনো পথ থাকবে না।

সূরা হুমাযাহ আমাদের শেখায়, মানুষের মর্যাদা রক্ষা করা কত গুরুত্বপূর্ণ। আর সম্পদের নেশা কত বিপজ্জনক হতে পারে।

শিক্ষা ও উপদেশ

- গীবত ও পরনিন্দা কঠিন গুনাহ। আমরা অনেক সময় একে হালকা মনে করি, অথচ কুরআনে এটি মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনীয়।
- গীবত বৈধ হয় শুধু শরীয়তের নির্ধারিত প্রয়োজনে, যেমন জুলুম প্রতিকার, বিয়ের পরামর্শ, প্রতারণা থেকে সতর্ক করা। এখানেও প্রয়োজনের বেশি বলা যাবে না।
- কাউকে সংশোধন করতে হলে হিকমত ও কোমলতা দরকার। সবার সামনে অপমান করা নিষিদ্ধ, নাম না ধরে সাধারণভাবে সতর্ক করা রাসূলের সুন্নাত।
- রাগের মাথায় শাস্তি বা তিরস্কার করা উচিত নয়।
- বান্দার হক আল্লাহ ক্ষমা করেন না, বান্দা নিজে ক্ষমা না করলে। তাই এ বিষয়ে বেশি সতর্ক থাকা জরুরি।
- সম্পদের হক শুধু যাকাতে সীমাবদ্ধ নয়। আত্মীয়, প্রতিবেশী, মেহমান, ইয়াতীম ও মিসকিনের হকও আছে।
- সম্পদের মোহ মানুষকে অহংকারী ও গাফেল করে দেয়, আর মৃত্যু যে অনিবার্য, তা ভুলিয়ে রাখে।

- জাহান্নামের আগুন অন্তর পর্যন্ত পৌঁছাবে, আর সেখানে মৃত্যু নেই।

অধ্যায় ২৮

সূরা ফীল

الفيل

আবরাহার হাতির বাহিনী যেভাবে ধ্বংস হলো

কুরআনের ১০৫তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৫টি

সূরা ফীল কুরআনের ১০৫তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা পাঁচ। এখান থেকে শুরু করে শেষ দশটি সূরা কুরআনের সবচেয়ে বেশি তিলাওয়াত করা ও মুখস্থ থাকা সূরাগুলোর অন্তর্ভুক্ত।

মাক্কী ও মাদানী সূরা

এই সূরাগুলো বুঝতে মাক্কী ও মাদানী সূরার পার্থক্য সম্পর্কে একটু জানা দরকার। সাধারণভাবে মনে করা হয়, যা মক্কায় অবতীর্ণ, তা মাক্কী, আর যা মদীনায় অবতীর্ণ, তা মাদানী। তবে আলেমদের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হলো, হিজরতের পূর্বে যা নাযিল হয়েছে, তা মাক্কী, আর হিজরতের পরে যা নাযিল হয়েছে, তা মাদানী, স্থান যা-ই হোক। মাক্কী সূরার সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো, আয়াতগুলো ছোট ছোট, বিধানের আলোচনা কম, আর মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদ, কিয়ামত, পুনরুত্থান ও আল্লাহর কুদরত। কারণ মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রধান দায়িত্ব ছিল ঈমানের দিকে আহ্বান। মাদানী সূরায় আয়াত অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ এবং বিধিবিধানের আলোচনা বেশি।

শেষ দশটি সূরায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এর অনেকগুলোতে পরকালের সাধারণ আলোচনা নেই। বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বা মক্কার কোনো বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গ হয়ে এসেছে। সূরা ফীলে আছে হাতির বাহিনীর ঘটনা, যা নবীজির জন্মবছরে ঘটেছিল। সূরা কুরাইশে কুরাইশদের বিশেষ নিয়ামতের কথা। সূরা মাউনে ইয়াতীম ও মিসকিনের হক। সূরা কাউসারে নবীজির প্রতি কটূক্তির জবাব। সূরা কাফিরূনে মুশরিকদের আপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান। সূরা লাহাবে আবু লাহাবের শত্রুতা। সূরা ফালাক ও নাসে জাদুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষার দোয়া।

পূর্ববর্তী সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

কুরআনের সূরাগুলোর বর্তমান বিন্যাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা অনুযায়ী করা হয়েছে, এটি অধিকাংশ আলেমের মত। সূরা হুমাযায় আমরা দেখেছি, যারা মানুষকে অপমান করে ও সম্পদের মোহে মত্ত থাকে, তাদের জন্য জাহান্নামের কঠিন শাস্তি

অপেক্ষা করছে। সূরা ফীল শিক্ষা দেয়, আল্লাহ কখনো কখনো এমন অহংকারীদের শাস্তি দুনিয়াতেও দেখিয়ে দেন। আসহাবুল ফীল তার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

❖ সূরা ফীল, আয়াত ১

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَٰبِ ٱلْفِيلِ ﴿١﴾

[১] আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন

আয়াত ১: 'আপনি কি দেখেননি'

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আলাম তারা কাইফা ফাআলা রব্বুকা বিআসহাবিল ফীল', আপনি কি দেখেননি, আপনার রব হাতিওয়ালাদের সঙ্গে কী আচরণ করেছেন? এখানে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'দেখেননি' বলছেন। অথচ ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর জন্মের বছরে, তিনি তখন এই পৃথিবীতে আসেননি। এর কারণ হলো, ঘটনাটি এত প্রসিদ্ধ ও অকাট্য ছিল যে তা চোখে দেখার মতোই নিশ্চিত। মক্কার সবাই ঘটনাটি জানত। আরবরা বছর হিসাবে বড় ঘটনার সূত্র ধরত, যেমন 'হাতির ঘটনার এত বছর পর'। তখন হিজরী সনের প্রচলন হয়নি, তা শুরু হয়েছে অনেক পরে। এভাবে 'আমুল ফীল' বা 'হাতির বছর' আরবদের জন্য একটি সময়ের সীমারেখা ছিল।

❖ সূরা ফীল, আয়াত ২–৫

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾

[২] তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾

[৩] তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾

[৪] যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

[৫] অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

আয়াত ২–৫: ষড়যন্ত্র ব্যর্থ, আবাবীল ও কঙ্কর

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'তিনি কি তাদের চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেননি?' তৃতীয় আয়াতে, 'আর তিনি তাদের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি পাঠিয়েছিলেন (তাইরান আবাবীল)।' আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে 'আবাবীল' একটি পাখির নাম। আসলে এটি কোনো নির্দিষ্ট পাখির নাম নয়,

'আবাবীল' অর্থ ঝাঁক বা দল। চতুর্থ আয়াতে, 'যারা তাদের ওপর নিক্ষেপ করছিল পোড়ামাটির কঙ্কর (সিজ্জীল)।' পঞ্চম আয়াতে, 'ফলে তিনি তাদের করে দিলেন চর্বিত তৃণ-ভুসির মতো (কা'আসফিম মা'কূল)।' 'আসফ' অর্থ ঘাস বা শস্যের খোসা, 'মা'কূল' অর্থ যা খাওয়া হয়েছে বা চিবানো হয়েছে। অর্থাৎ পাথরের আঘাতে তারা চূর্ণ-বিচূর্ণ ও ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে গেল।

ঘটনার বিবরণ

ঘটনাটি ইতিহাস ও সীরাতের গ্রন্থে (ইবনে ইসহাক ও ইবনে কাসীরের বর্ণনা) এভাবে এসেছে। ইয়েমেনের শাসনকর্তা ছিলেন আবরাহা আল-আশরাম। সে খ্রিস্টান ছিল এবং হাবশার বাদশাহর অধীনে ইয়েমেন শাসন করত। সে ইয়েমেনের রাজধানী সানআতে 'আল-কুল্লাইস' নামে এক বিশাল ও জমকালো গির্জা নির্মাণ করল। তার ইচ্ছা ছিল, আরবরা কাবা ঘরের পরিবর্তে তার এই গির্জায় তাওয়াফ করতে আসবে। আরবরা তা মানল না। কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী, কিনানা গোত্রের এক ব্যক্তি গির্জায় ঢুকে অপমানের উদ্দেশ্যে মলত্যাগ করে চলে আসে। এতে আবরাহা ক্ষিপ্ত হয়ে শপথ করল, আমি কাবা ঘর ধ্বংস করে ছাড়ব।

আবরাহা বিশাল সৈন্যবাহিনী ও হাতি নিয়ে মক্কার দিকে রওনা হলো। আরবরা যুদ্ধে হাতি ব্যবহার করতে দেখেনি, তাই আতঙ্কিত ছিল। পথে বিভিন্ন গোত্র তাকে বাধা দিয়ে পরাজিত হলো। নুফাইল ইবনে হাবীব নামে এক গোত্রনেতা বন্দী হয়ে প্রাণ বাঁচাতে পথ দেখানোর প্রস্তাব দিল। কোনো কোনো বর্ণনায় আবু রিগাল নামের এক ব্যক্তি পথপ্রদর্শক ছিল, যার পরিণতিও ভালো হয়নি। ঐতিহাসিকরা হাতি ব্যবহারের কারণ হিসেবে উল্লেখ করেন, আবরাহার ইচ্ছা ছিল কাবা ঘরের চারদিকে শিকল পরিয়ে হাতিদের দিয়ে টেনে ভেঙে ফেলা।

মক্কার কাছাকাছি পৌঁছে আবরাহার সৈন্যরা লুটতরাজ করল। তাতে আবদুল মুত্তালিবের দুশো উটও লুট হলো। আবদুল মুত্তালিব ছিলেন মক্কার সর্দার ও কাবার তত্ত্বাবধায়ক। তিনি আবরাহার কাছে গেলেন। আবরাহা তাঁর ব্যক্তিত্ব দেখে প্রভাবিত হলো এবং ভাবল, তিনি হয়তো কাবা রক্ষার জন্য সমঝোতার আলোচনা করবেন। কিন্তু তিনি বললেন, আমার উটগুলো ফেরত দিন। আবরাহা অবাক হয়ে বলল, আমি ভেবেছিলাম আপনি আপনার ধর্মের কেন্দ্র কাবা নিয়ে কথা বলবেন, আর আপনি আপনার উট নিয়ে এসেছেন! তিনি জবাব দিলেন, আমি উটের মালিক, তাই উট চাইছি। আর এই ঘরের একজন মালিক আছেন, তিনিই একে রক্ষা করবেন।

আবদুল মুত্তালিব কুরাইশদের পাহাড়ে আশ্রয় নিতে বললেন। তিনি কাবার দরজা ধরে আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আবরাহা ভাবল, মক্কায় তাকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই, তাই সে অহংকারে ফুলে হাতিসহ এগোল। হাতিদের নেতা ছিল 'মাহমূদ' নামের একটি বিশাল হাতি। কাবার দিকে মুখ ফেরানোমাত্র সে মাটিতে বসে পড়ল, কিছুতেই এগোল না। ইয়েমেনের দিকে ঘোরালে ছুটে যেত, মক্কার দিকে ঘোরালে বসে যেত।

এমন সময় সমুদ্রের দিক থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ছোট পাখি আকাশে দেখা গেল। দূর থেকে মনে হচ্ছিল কালো মেঘ। প্রতিটি পাখির ঠোঁটে ও দুই পায়ে মসুরের ডালের মতো ছোট ছোট পোড়ামাটির কঙ্কর। তারা সৈন্যদের ওপর কঙ্কর ফেলতে লাগল। যার গায়ে পড়ল, তার দেহ গলতে শুরু করল। সবাই পালাতে গিয়ে পথে পথে মরে পড়ে রইল। আবরাহা পালাল, কিন্তু আল্লাহ তাকে সঙ্গে সঙ্গে মারলেন না। তার শরীর টুকরো টুকরো হয়ে পচে গলতে লাগল, আর এ অবস্থায় সানআয় পৌঁছে সে মারা গেল। বর্ণিত আছে, আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, আমি হাতির মাহুত ও পথপ্রদর্শককে অন্ধ ও বিকলাঙ্গ অবস্থায় মক্কায় ভিক্ষা করতে দেখেছি। হুদাইবিয়ার সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উটনী কাসওয়া হঠাৎ বসে পড়েছিল। সাহাবীরা বললেন, কাসওয়া জেদ করছে। তিনি বললেন, কাসওয়া জেদ করেনি, এটি তার স্বভাবও নয়। যিনি হাতিকে মক্কা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, তিনিই তাকে আটকে রেখেছেন (সহীহ বুখারী)। এখান থেকে বোঝা যায়, কাবা ঘরের সম্মান ও হেফাজত আল্লাহ নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। অবশ্য আখেরি যামানায় আল্লাহর নির্ধারিত সময়ে একদল লোক কাবা ধ্বংস করবে বলে সহীহ হাদীসে এসেছে। তা আল্লাহর ফয়সালা, কিন্তু আবরাহার সময়ে আল্লাহ তা ঠেকিয়েছেন।

এই ঘটনার শিক্ষা

প্রথম শিক্ষা, ক্ষমতা ও অহংকারের পরিণতি। আবরাহা ছিল শক্তিশালী শাসক, তার বাহিনী ছিল বিশাল, সঙ্গে হাতি। অথচ আল্লাহ ক্ষুদ্র পাখি দিয়ে তাকে পরাজিত করলেন। বাহ্যিকভাবে মনে হয়, হাতির সামনে পাখি কী করবে? একটি লাঠির আঘাতেই পাখিকে ফেলে দেওয়া যায়। কিন্তু আল্লাহ যখন কাউকে ধ্বংস করতে চান, তখন ক্ষুদ্রতম সৃষ্টিও যথেষ্ট। আমরাও যখন ক্ষমতা, সম্পদ ও শক্তি পেয়ে যাই, তখন দ্বীনের বিধানকে নিজের স্বার্থে বিকৃত বা উপেক্ষা করার মনোভাব তৈরি হতে পারে। আবরাহার মতো প্রতাপশালী ব্যক্তি যদি ছোট্ট এক পাখির সামনে পরাজিত হয়, তাহলে আমরা কোথায়?

দ্বিতীয় শিক্ষা, আল্লাহ সবাইকে দুনিয়াতে শাস্তি দেন না, কিন্তু কাউকে কাউকে দুনিয়াতেও দেন। তাই অপরাধ করে বেঁচে যাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা নেই। দুনিয়ায় না হলেও আখিরাতে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে।

তৃতীয় শিক্ষা, যাঁরা আল্লাহর দ্বীনের কাজ করছেন, তাঁদের জন্য সান্ত্বনা। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহী শক্তি বিশাল হতে পারে, আর আমাদের সংখ্যা ও সামর্থ্য কম হতে পারে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনের যুদ্ধের ইতিহাস প্রমাণ করে, মুসলমানরা নিজেদের শক্তিতে নয়, আল্লাহর সাহায্যে বিজয়ী হয়। বদরের যুদ্ধে তিনশো তেরো জন এক হাজার সৈন্যকে পরাজিত করেছে। অবশ্য আমাদের সাধ্যমতো প্রস্তুতি নেওয়া কর্তব্য। আল্লাহ

বলেছেন, তোমরা তাদের মোকাবেলায় যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত করো (সূরা আনফাল ৮:৬০)। তবে সাফল্য আল্লাহর নুসরতের ওপর নির্ভর করে। আর আল্লাহ বলেছেন, তোমরা হীনবল হয়ো না, দুঃখ করো না, তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা মুমিন হও (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৯)। আমরা আল্লাহর দ্বীনের হেফাজতের কাজে ক্ষুদ্র পাখির মতো, ক্ষুদ্রতার কারণে হতাশ হওয়ার কিছু নেই। শর্ত হলো প্রকৃত মুমিন হওয়ার চেষ্টা করা এবং সঠিক পদ্ধতিতে কাজ করা।

চতুর্থ শিক্ষা, কাবা ঘর আল্লাহর ঘর, তাওহীদের কেন্দ্র। ইবরাহীম আলাইহিস সালামের আনা তাওহীদের ধর্মকে বিকৃত করে মক্কার মুশরিকরা সেখানে তিনশো ষাটটি মূর্তি রেখেছিল। আল্লাহ তাদের জানিয়ে দিচ্ছেন, যারা তাঁর ঘরের অসম্মান করতে এসেছিল, তাদের কী পরিণতি হয়েছে। তোমরা তা থেকে শিক্ষা নাও।

শিক্ষা ও উপদেশ

- হাতির বাহিনীর ঘটনা এত প্রসিদ্ধ ছিল যে আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'আপনি কি দেখেননি' বলে সম্বোধন করেছেন।
- 'আবাবীল' কোনো নির্দিষ্ট পাখির নাম নয়, এর অর্থ ঝাঁক বা দল।
- কাবা ঘরের হেফাজত আল্লাহ নিজেই করেছেন। আবদুল মুত্তালিবের কথা, এই ঘরের একজন মালিক আছেন, ঈমানের শিক্ষা দেয়।
- ক্ষমতা, সম্পদ ও অস্ত্রের অহংকার আল্লাহর সামনে তুচ্ছ। ক্ষুদ্রতম সৃষ্টি দিয়েও আল্লাহ বিশাল বাহিনী ধ্বংস করতে পারেন।
- আল্লাহ কাউকে কাউকে দুনিয়াতেও শাস্তি দেন, তবে আখিরাতে জবাবদিহি অনিবার্য।
- দ্বীনের কাজে ক্ষুদ্রতার কারণে হতাশ হওয়া উচিত নয়। সাধ্যমতো প্রস্তুতির পাশাপাশি আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করতে হবে।

অধ্যায় ২৯

সূরা কুরাইশ

قريش

ক্ষুধা ও ভয় থেকে নিরাপত্তার নিয়ামত

কুরআনের ১০৬তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৪টি

সূরা কুরাইশ কুরআনের ১০৬তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা চার। 'কুরাইশ' একটি বংশের নাম, যাঁরা মক্কা নগরীর অধিবাসী ছিলেন এবং কাবা ঘরের সেবার দায়িত্ব পালন করতেন। ইতিহাসবিদদের মতে ফিহর ইবনে মালিক বা নাযর ইবনে কিনানার বংশধররাই কুরাইশ। নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেছেন।

সূরাটির আলোচনায় যাওয়ার আগে মক্কা নগরীর অতীত ইতিহাসের কিছু কথা মনে করা দরকার। এই নগরীর গোড়াপত্তন করেছেন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম। আল্লাহর নির্দেশে তিনি স্ত্রী হাজেরা ও শিশুপুত্র ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে এই জনমানবহীন, শুষ্ক উপত্যকায় রেখে গিয়েছিলেন। যাওয়ার সময় তিনি আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন। সেই দোয়া সূরা বাকারা ও সূরা ইবরাহীমে বর্ণিত আছে। সূরা ইবরাহীমের ৩৫ নম্বর আয়াতে তিনি বলেছেন, 'হে আমার রব, আপনি এই নগরীকে নিরাপদ করুন।' সূরা বাকারার ১২৬ নম্বর আয়াতে আরও বিস্তারিত দোয়া আছে, 'হে আমার রব, এই নগরীকে নিরাপদ করুন এবং এর অধিবাসীদের ফলমূল দিয়ে রিযিক দান করুন।'

অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম দুটি দোয়া করেছিলেন, এক নিরাপত্তার, দুই রিযিকের প্রাচুর্যের। এই দুই দোয়া আল্লাহ কবুল করেছেন। যাঁরা সৌদি আরবে আছেন বা ছিলেন, তাঁরা জানেন, মক্কায় সারা পৃথিবীর ফল পাওয়া যায়, অথচ সেখানে কৃষির সুযোগ খুবই সীমিত। একটি অনুর্বর মরুভূমিতে বিশ্বের নানা প্রান্তের ফল পৌঁছে যাওয়া সেই দোয়ার ফল।

❖ সূরা কুরাইশ, আয়াত ১–২

لِإِيلَٰفِ قُرَيۡشٍ ١

[১] কোরাইশের আসক্তির কারণে

إِۦلَٰفِهِمۡ رِحۡلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيۡفِ ٢

[২] আসক্তির কারণে তাদের শীত ও গ্রীষ্মকালীন সফরের।

আয়াত ১–২: কুরাইশের অভ্যস্ততা ও দুই সফর

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘লি-ঈলাফি কুরাইশ’। আয়াতটি শুরু হয়েছে ‘লি’ (জন্য) দিয়ে, যা একটি বাক্যাংশের মতো শোনায়। এ কারণে কোনো কোনো ভাষাবিদ ও মুফাসসির বলেছেন, এই আয়াত আগের সূরা ফীলের সঙ্গে সংযুক্ত। অর্থাৎ আল্লাহ হাতির বাহিনীকে ধ্বংস করেছেন কুরাইশের ‘ঈলাফ’-এর কারণে। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এটি আলাদা একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা। তবু দুই সূরার মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

‘ঈলাফ’ শব্দের কয়েকটি অর্থ: ঐক্য, অভ্যস্ততা, প্রিয় বা পছন্দের বিষয়। দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘তাদের শীত ও গ্রীষ্মের সফরের অভ্যস্ততা’। সৌদি আরবের ভূমি ছিল মরুভূমি, সেখানে কৃষির সুযোগ ছিল না। কুরাইশের জীবিকার প্রধান উপায় ছিল ব্যবসা। তাঁরা শীতকালে ইয়েমেনের দিকে এবং গ্রীষ্মকালে শামের (আজকের ফিলিস্তিন, জর্ডান ও আশপাশের অঞ্চল) দিকে বাণিজ্যিক কাফেলা নিয়ে যেতেন। ইয়েমেন তুলনামূলক উষ্ণ অঞ্চল, তাই শীতে সেখানে যাওয়া সহজ ছিল। শাম তুলনামূলক শীতল, তাই গ্রীষ্মে সেখানে যাওয়া আরামদায়ক। ইবনে কাসীর বর্ণনা করেছেন, নবীজির পরদাদা হাশিম এসব সফরের জন্য বিভিন্ন রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে নিরাপত্তার চুক্তি করেছিলেন।

সে যুগে আরব সমাজের অবস্থা ছিল এমন যে সফর ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। পথে ডাকাত ও লুটেরারা কাফেলা ঘিরে ধরত। কেউ নিরাপদে সফর করতে পারত না। কিন্তু সূরা ফীলের ঘটনার পর, যেখানে আল্লাহ আসমানী আযাব পাঠিয়ে আবরাহার বাহিনীকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলেন, কুরাইশের সম্মান সারা আরবে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই জানল, এ এমন এক বংশ, যাদের হেফাজতে আল্লাহ নিজে হস্তক্ষেপ করেছেন। কাবার খাদেম হিসেবে তাঁদের মর্যাদা আগেও ছিল। এ কারণে কেউ তাঁদের কাফেলায় আক্রমণ করত না। তাঁরা নিরাপদে ব্যবসায়িক সফর করতে পারতেন। এটি ছিল আল্লাহর বিশেষ নিয়ামত। প্রথম নিয়ামত সম্মান, দ্বিতীয় নিয়ামত নিরাপত্তা।

❖ সূরা কুরাইশ, আয়াত ৩–৪

فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ﴿٣﴾

[৩] অতএব তারা যেন এবাদত করে এই ঘরের পালনকর্তার

ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍۢ ﴿٤﴾

[৪] যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং যুদ্ধভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

আয়াত ৩–৪: ঘরের রবের ইবাদত

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'সুতরাং তারা যেন এই ঘরের রবের ইবাদত করে।' আয়াতটির শুরুতে 'ফা' (সুতরাং) আছে, যা কারণ-ফলাফলের সম্পর্ক বোঝায়। অর্থাৎ যেহেতু আল্লাহ তাঁদের এত নিয়ামত দিয়েছেন, তাই তাঁদের উচিত শুধু তাঁর ইবাদত করা।

এখানে আল্লাহ বলেছেন 'এই ঘরের রব'। অথচ আল্লাহ তো সমগ্র বিশ্বজগতের রব। তবু 'এই ঘরের রব' বলার মধ্যে একটি তাৎপর্য আছে। কুরাইশরা এই ঘরকে ঘিরেই সম্মান পেয়েছে, এই ঘরকে ঘিরেই রিযিক ও নিরাপত্তা পেয়েছে। অথচ তারা এই ঘরের ভেতরে ৩৬০টি মূর্তি রেখে সেগুলোর পূজা করছিল। যে ঘর নির্মিত হয়েছিল একমাত্র আল্লাহর ইবাদতের জন্য, সেখানে তারা শিরক করছিল। আল্লাহ তাদের জানিয়ে দিলেন, নিয়ামতদাতা এই ঘরের মালিক, মূর্তি নয়।

চতুর্থ আয়াতে নিয়ামতের বিবরণ, 'যিনি তাদের ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় থেকে নিরাপদ করেছেন।' ক্ষুধা ও ভয়, এ দুটি মানুষের মৌলিক কষ্টের কারণ। ক্ষুধা থেকে রক্ষা ও ভয় থেকে নিরাপত্তা, এ দুটি নিয়ামত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার ফল।

কুরআনের আরও কয়েকটি আয়াতে এই নিয়ামতের কথা এসেছে। সূরা নামলে বলা হয়েছে, আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এই নগরীর রবের ইবাদত করতে, যিনি একে সম্মানিত করেছেন (২৭:৯১)। সূরা আনকাবূতে আল্লাহ বলেছেন, তারা কি দেখে না, আমি হারামকে নিরাপদ করেছি, অথচ তাদের চারপাশের মানুষকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে? (২৯:৬৭)। সূরা কাসাসে মুশরিকদের একটি অজুহাত উদ্ধৃত হয়েছে। তারা বলত, আমরা যদি আপনার সঙ্গে হিদায়াত অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের দেশ থেকে উচ্ছেদ হব। আল্লাহ জবাব দিয়েছেন, আমি কি তাদের এক নিরাপদ হারামে প্রতিষ্ঠিত করিনি, যেখানে সব ধরনের ফল আমদানি করা হয়? কিন্তু তাদের অধিকাংশ জানে না (২৮:৫৭)।

মক্কার সর্দারদের সবচেয়ে বড় ভয় ছিল, ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের নেতৃত্ব ও সুযোগ-সুবিধা হারাবে। অথচ আল্লাহ বলছেন, তোমরা শিরক করা অবস্থায়ও আমার দেওয়া নিরাপত্তা ও রিযিক ভোগ করছ। আমার ইবাদত করলে কি তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে? আল্লাহ বলেন, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, আমি অবশ্যই তোমাদের নিয়ামত বাড়িয়ে দেব (সূরা ইবরাহীম ১৪:৭)।

আমাদের জন্য শিক্ষা

আল্লাহ কুরাইশদের নিয়ামতের কথা বলে কৃতজ্ঞ হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। আমরা যদি নিজেদের নিয়ামতের দিকে তাকাই, কুরাইশদের চেয়ে কম পাচ্ছি না, বরং অনেক বেশি পাচ্ছি। তখন মানুষ দুই বেলা, বড়জোর তিন বেলা খাবার পেত। আমরা সকালের নাশতা, দুপুরের খাবার, বিকালের চা-নাশতা, রাতের খাবার, এভাবে প্রায় পাঁচ বেলা খাই। খাবার ছাড়াও আমাদের আরও অসংখ্য নিয়ামত আছে। তখন সফর ছিল অত্যন্ত কষ্টের, উট বা ঘোড়ার পিঠে দীর্ঘ পথ, শরীর

ক্লান্ত হয়ে যেত। আর আমরা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে বা স্লিপার বাসে ঘুমাতে ঘুমাতে সফর করি। এই যানবাহনের আবিষ্কারও আল্লাহর দেওয়া জ্ঞানের ফল।

মনে প্রশ্ন আসতে পারে, মুসলমানরা তো আজ অনেক জায়গায় নির্যাতিত, আর কাফির-মুশরিকরা অনেক বেশি ভোগবিলাসে আছে। এ প্রশ্নের জবাব আমরা সূরা ফাজরে দেখেছি। দুনিয়ার সম্পদ আল্লাহর কাছে মূল্যহীন। কাফিররা যা পাচ্ছে, তার প্রতিদান হিসেবে দুনিয়াতেই পাচ্ছে, আখিরাতে তাদের জন্য কিছু নেই। আর মুমিনদের আসল প্রতিদান আখিরাতে। দুনিয়ায় যা পাচ্ছে, তা বাড়তি।

এই সূরা থেকে আরেকটি শিক্ষা মসজিদ বা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলদের জন্য। কুরাইশদের সম্মানের মূল কারণ ছিল কাবার সেবা। কাবার চাবির দায়িত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ তাদের হাতে ছিল, এ কারণে সবাই তাদের সম্মান করত। যাঁরা আজ কোনো মসজিদ, মাদ্রাসা বা দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে আছেন, তাঁরাও আল্লাহর ঘরের সেবক হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এই মর্যাদা ধরে রাখার উপায় হলো কৃতজ্ঞতা ও বিনয়। ক্ষমতা পেয়ে স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ বা পছন্দ-অপছন্দের কারণে মসজিদে সুদ, ঘুষ বা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সঠিক কথা বলতে বাধা দেওয়া অকৃতজ্ঞতার শামিল। বরং সত্য কথা মানুষের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ও নিজেকে সংশোধন করা কর্তব্য।

কৃতজ্ঞতা কেবল মুখে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার নাম নয়। খাবার খেয়ে মুখে আলহামদুলিল্লাহ বললাম, কিন্তু সেই খাদ্যে অর্জিত শক্তি দিয়ে মানুষের সঙ্গে মারামারি, হানাহানি, অন্যায় ও নিজের শক্তির বড়াই করলাম, তাহলে তা অকৃতজ্ঞতা। প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো, আল্লাহর দেওয়া নিয়ামতকে তাঁর সন্তুষ্টির কাজে ব্যয় করা।

শিক্ষা ও উপদেশ

- ইবরাহীম আলাইহিস সালামের দোয়ার বরকতে মক্কা নিরাপদ নগরী ও রিযিকের প্রাচুর্যের স্থান।
- কুরাইশের সম্মান ও নিরাপত্তার কারণ ছিল কাবার সেবক হওয়া এবং আসহাবুল ফীলের ঘটনা।
- ক্ষুধা থেকে মুক্তি ও ভয় থেকে নিরাপত্তা, এই দুই নিয়ামতের মূল্য আমরা সচরাচর বুঝি না।
- নিয়ামত পেলে তার দাতার ইবাদত করা আমাদের কর্তব্য। কুরাইশদের মতো শিরক নয়।
- কাফিরদের দুনিয়ার ভোগবিলাস আল্লাহর কাছে সম্মানের প্রমাণ নয়। মুমিনের আসল প্রতিদান আখিরাতে।

- মসজিদ ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলরা আল্লাহর ঘরের সেবক। এই মর্যাদার শোকর হলো বিনয় ও সত্য প্রচারে সহযোগিতা।
- প্রকৃত কৃতজ্ঞতা হলো নিয়ামতকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা, শুধু মুখে আলহামদুলিল্লাহ বলা নয়।

অধ্যায় ৩০

সূরা মাউন

الماعون

নামায পড়েও যারা ধ্বংসের কাছে

কুরআনের ১০৭তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৭টি

সূরা মাউন কুরআনের ১০৭তম সূরা। আয়াত সংখ্যা সাত। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি মক্কায় অবতীর্ণ। কেউ কেউ বলেছেন, প্রথম তিন আয়াত মাক্কী এবং শেষ চার আয়াত মাদানী, যেগুলো নামাযে অবহেলাকারী ও লোক-দেখানো মুনাফিকদের প্রসঙ্গে নাযিল হয়েছে। আলেমদের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, এই সূরা মূলত আখিরাতে অবিশ্বাস ও মানুষের সঙ্গে মন্দ আচরণের মধ্যকার সম্পর্ক তুলে ধরেছে।

সূরা কুরাইশের সঙ্গে সম্পর্ক

আগের সূরা কুরাইশে আল্লাহ তাআলা কুরাইশ বংশের লোকদের নিয়ামতের কথা মনে করিয়ে কোমল ভঙ্গিতে তাঁর ইবাদতের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাদের বাণিজ্যিক সফরকে নিরাপদ করেছেন, ক্ষুধা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এত নিয়ামতের শোকর হিসেবে তাদের উচিত একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা। কিন্তু এই আদর-ভরা আহ্বানেও যারা সাড়া দেয়নি, তাদের সম্পর্কে এই সূরায় আল্লাহ কিছুটা কঠোর ভাষায় সতর্ক করছেন।

'মাউন' শব্দের অর্থ দৈনন্দিন জীবনের সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিস। যেমন হাঁড়ি, বালতি, চামচ, লবণ, পেঁয়াজ, এমন সব বস্তু, যা মানুষ সাধারণত প্রতিবেশীর কাছ থেকে চেয়ে নেয়। তখন আজকের মতো অনলাইনে অর্ডার করে দশ-বিশ মিনিটে জিনিস পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল না। বাড়িতে লবণ ফুরিয়ে গেলে প্রতিবেশীর কাছেই যেতে হতো। এই সামান্য সাহায্যটুকু দিতেও যারা গড়িমসি করত, তাদের কথা বলেই সূরার নামকরণ।

❖ সূরা মাউন, আয়াত ১–৩

أَرَءَيْتَ ٱلَّذِي يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ ﴿١﴾

[১] আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে মিথ্যা বলে

فَذَٰلِكَ ٱلَّذِي يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ ﴿٢﴾

[২] সে সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

[৩] এবং মিসকীনকে অন্ন দিতে উৎসাহিত করে না।

আয়াত ১–৩: আখিরাত অস্বীকারকারীর পরিচয়

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আরাআইতাল্লাযী ইউকাযযিবু বিদ-দ্বীন', আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে প্রতিদান দিবসকে অস্বীকার করে? এখানে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ বিচার ও প্রতিদান। সূরা ফাতিহার 'মালিকি ইয়াওমিদ্দীন' (বিচার দিবসের মালিক) আয়াতেও এই অর্থ। 'দ্বীন' ধর্ম ও জীবনব্যবস্থা অর্থেও ব্যবহৃত হয়, যেমন 'ইন্নাদ দ্বীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম' (আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন ইসলাম)।

মুফাসসিরগণ বলেছেন, এখানে মক্কার বড় বড় মুশরিক সর্দার, যেমন আবু জাহল ও ইসলামপূর্ব আবু সুফিয়ানের কথা বলা হয়েছে। বর্ণিত আছে, আবু জাহল ছিল একজন ইয়াতীমের অভিভাবক। ইয়াতীম ছেলেটি একদিন নিজের সম্পদের কিছু অংশ চাইতে এসে তার কাছ থেকে রূঢ় ব্যবহার পেয়েছিল (তাফসীরে ইবনে কাসীর)।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'ফাযালিকাল্লাযী ইয়াদু'উল ইয়াতীম', সে-ই সেই ব্যক্তি, যে ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। 'ইয়াদু'উ' অর্থ কঠোরভাবে ঠেলে দেওয়া। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়ালা ইয়াহুদ্দু আলা তাআমিল মিসকীন', আর সে মিসকিনকে খাদ্য দিতে উৎসাহ দেয় না। লক্ষ করুন, বলা হয়নি, 'সে মিসকিনকে খাওয়ায় না', বলা হয়েছে, 'খাওয়াতে উৎসাহ দেয় না'। অর্থাৎ নিজে দেওয়ার পাশাপাশি অন্যদেরও দানের পরিবেশ তৈরি করা মুমিনের দায়িত্ব। নিজে অন্যের পাশে দাঁড়ানো এবং অন্যদেরও পাশে দাঁড়াতে উৎসাহ দেওয়া, দুটিই কর্তব্য।

আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি। এই বিশ্বাস দৃঢ় হলে মানুষ অন্যায় থেকে বিরত থাকে। যে সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করে, আখিরাতে আমার প্রতিটি কাজের হিসাব হবে, সে চুরি, দুর্নীতি, জুলুম ও মানুষের ক্ষতি করতে পারে না। আমাদের বিশ্বাস মুখে আছে, কিন্তু অনেক সময় কর্মে তার ছাপ নেই। মনে হয়, আমরা যেন আখিরাতকে অবিশ্বাস করি।

একজন অবিশ্বাসী একবার এক মুমিনকে বলেছিল, আপনারা তো দুনিয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত থাকেন, আমরা উপভোগ করছি। যদি আখিরাত না থাকে, তাহলে আপনারা তো দুনিয়াতেও বঞ্চিত, আখিরাতেও। জবাব হলো, আখিরাতের বিশ্বাস এমন এক বিশ্বাস, যা শুধু অন্যায় থেকে বাঁচায় না, জীবনকে অর্থবহ করে। তাছাড়া হারাম আনন্দ আসলেই কোনো আনন্দ নয়, আর হালাল আনন্দ মুমিন দুনিয়াতেও ভোগ করে।

ইয়াতীমের হক

আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো ভাবতে পারেন, আমি তো ইয়াতীমকে ধাক্কা দিই না, আমার পরিবারে ইয়াতীম নেই। কিন্তু আমাদের সমাজে ইয়াতীমদের লালন-পালনের দায়িত্ব কি সুসংগঠিতভাবে পালিত হচ্ছে? আমাদের দেশে ইয়াতীমদের দায়িত্বে বড় ভূমিকা রাখছে বিভিন্ন কওমি মাদ্রাসা ও দ্বীনি প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা আমাদের কাছে এসে সহযোগিতা চান। আমরা বলি, রমযানে এসো। রমযানে এলে ফোন ধরি না। এই আচরণ ইয়াতীমকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার শামিল।

আমি কোনো অন্ধ অনুদান দেওয়ার কথা বলছি না। প্রতারণাও আছে। কিন্তু যাচাই করে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা করা যায়। সবচেয়ে ভালো উপায় হলো, কোনো নির্ভরযোগ্য ইয়াতীমখানায় গিয়ে নিজে দুজন ইয়াতীম শিশুর পুরো খরচের দায়িত্ব নেওয়া। শুরু থেকে প্রতি মাসে তাদের খাবার ও পড়াশোনার খরচ দেওয়া। এতে ইয়াতীমের খোঁজ রাখার দায়িত্ব কিছুটা হলেও আদায় হবে, ইনশাআল্লাহ।

যাঁদের ঘরে ছোট সন্তান আছে, তাঁরা বিষয়টি গভীরভাবে অনুভব করবেন। চার বছরের বাচ্চা দশ মিনিটের জন্যও মা-বাবাকে না দেখলে কেঁদে অস্থির হয়ে যায়। সেই শিশু যখন চিরতরে মা-বাবাকে হারায়, তার কোমল হৃদয়ের শূন্যতা কোনো চকলেট বা জুস দিয়ে পূরণ করা যায় না। শরীয়তের পরিভাষায় যার পিতা বালেগ হওয়ার আগে মারা যায়, সে ইয়াতীম। আমাদের চারপাশে আরেক ধরনের শিশুও আছে, যাদের মা-বাবা বিচ্ছেদের কারণে আলাদা হয়ে গেছে, যারা পিতা-মাতার ছায়া থেকে বঞ্চিত। তাদের প্রতিও মমতা দেখানো দরকার। এমন শিশুর সঙ্গে কেউ কঠোর ভাষায় কথা বললে বা রূঢ় আচরণ করলে আল্লাহ তাআলার ক্রোধ আরও বেশি হয়।

মিসকিনের হক

ফিকহের কিতাবে মিসকিনের সংজ্ঞা হলো, যার এক বেলা খেলে পরের বেলার খাবারের নিশ্চয়তা নেই। আমরা শহরে পেশাদার ভিক্ষুক দেখি, তাই মনে করি সমাজে প্রকৃত মিসকিন নেই। কিন্তু প্রান্তিক এলাকায়, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের অনেক জায়গায়, এমন মানুষ আছেন, যাঁরা সারাদিন পরিশ্রম করে সামান্য মজুরি পান, 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' অবস্থা। এমন মানুষদের খুঁজে খুঁজে সাহায্য করা আমাদের কর্তব্য।

যাকাতের ক্ষেত্রেও আমরা অনেক সময় অগোছালো। কাউকে পাঁচশো, কাউকে হাজার টাকা দিয়ে দিই। যাকাতের মূল উদ্দেশ্য হলো অভাবীকে স্বাবলম্বী করা, যা এভাবে অর্জিত হয় না। যাকাত পরিকল্পিতভাবে দেওয়া উচিত, যাতে অভাবী মানুষ ধীরে ধীরে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।

❖ সূরা মাউন, আয়াত ৪–৬

فَوَيۡلٞ لِّلۡمُصَلِّينَ ٤

[৪] অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর

ٱلَّذِينَ هُمۡ عَن صَلَاتِهِمۡ سَاهُونَ ٥

[৫] যারা তাদের নামায সম্বন্ধে বে-খবর

ٱلَّذِينَ هُمۡ يُرَآءُونَ ٦

[৬] যারা তা লোক-দেখানোর জন্য করে

আয়াত ৪–৬: নামাযীর জন্য দুর্ভোগ, কখন?

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লীন', দুর্ভোগ সেসব নামাযীর জন্য। 'ওয়াইল' অর্থ দুর্ভোগ বা ধ্বংস, আবার জাহান্নামের একটি উপত্যকাও। পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাযীনা হুম আন সালাতিহিম সাহূন', যারা তাদের নামায সম্পর্কে গাফেল।

লক্ষ করুন, আল্লাহ বলেছেন 'আন সালাতিহিম' (নামাযের ব্যাপারে), 'ফী সালাতিহিম' (নামাযের ভেতরে) বলেননি। যদি 'ফী' বলতেন, তাহলে আমরা সবাই এর আওতায় পড়ে যেতাম, কারণ আমরা সবাই নামাযে কোনো না কোনো সময় অন্যমনস্ক হয়ে যাই। নামাযে দাঁড়িয়ে হিসাব-নিকাশ, বাজারের কথা, ব্যাংকের কাজ, আগামী মাসের পরিকল্পনা মাথায় ঘুরতে থাকে। যদি নামাযের সময়কার চিন্তার কোনো ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হতো, তাহলে প্রতিটি আয়াতের ফাঁকে দুনিয়ার সব কথা লেখা থাকত। এটি অবশ্যই দুঃখজনক, এবং নামাযে একাগ্রতা অর্জনের চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু আয়াতের মূল লক্ষ্য তারা, যারা নামাযের ব্যাপারেই গাফেল।

নামাযের ব্যাপারে গাফেল হওয়ার ধরন কেমন? সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, তারা সেসব লোক, যারা নামাযকে তার সময় থেকে বিলম্বিত করে (মুসনাদে আবু ইয়ালা, বায়হাকী)। সহীহ মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, এটি মুনাফিকের নামায, সে বসে বসে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, সূর্য শয়তানের দুই শিঙের মাঝখানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি) পৌঁছালে উঠে চারটি ঠোকর দেয়, আর আল্লাহর যিকির খুব সামান্যই করে।

আমরা কীভাবে নামাযে গাফলতি করি? খেলাধুলা দেখছি, ভাবছি খেলা শেষ হোক, তারপর আসরের নামায পড়ব। সিনেমা বা নাটক শেষ হোক। এসব অজুহাতে নামাযকে এমন সময়ে নিয়ে যাই যে মাকরূহ ওয়াক্ত শুরু হয়ে যায়। অনেক সময় রান্না ও ঘরের কাজ শেষ করে গোসল

সেরে পড়তে পড়তে সাড়ে তিনটা বেজে যায়। যে নামায সময়মতো পড়া উচিত ছিল, তা অবহেলায় পিছিয়ে যায়। এ ধরনের গাফলতিই এই আয়াতের লক্ষ্য।

ষষ্ঠ আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাযীনা হুম ইউরাউন', যারা লোক-দেখানোর জন্য (নামায পড়ে)। 'রিয়া' বা লোক-দেখানো ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের ব্যাপারে আমি সবচেয়ে বেশি ভয় করি ছোট শিরকের, আর তা হলো রিয়া (মুসনাদে আহমাদ)। তিনি আরও বলেছেন, যে লোক-দেখানোর জন্য আমল করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার গোপন বিষয় সবার সামনে প্রকাশ করে দেবেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আমরা অনেকে সামাজিক মর্যাদার কারণে নামাযী হয়ে যাই। সমাজে কিছু পদ বা সম্মান পেলে নামায না পড়লে মানুষ কী বলবে, এ ভাবনা কাজ করে। এ ধরনের কারণ আমাদের রিয়ার দিকে নিয়ে যায়। তখন দুনিয়ায় আমি মুসল্লি, কিন্তু আল্লাহর কাছে আমি রিয়াকার।

❖ সূরা মাউন, আয়াত ৭

وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ ﴿٧﴾

[৭] এবং নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু অন্যকে দেয় না।

আয়াত ৭: 'আর তারা সামান্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিতেও বিরত থাকে'

সপ্তম আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া ইয়ামনাউনাল মাউন'। 'মাউন'-এর অর্থ নিয়ে সাহাবীদের থেকে দুটি ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। প্রথম, ছোটখাটো গৃহস্থালি সামগ্রী। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে 'মাউন' বলতে বালতি ও হাঁড়ি ধার দেওয়াকে বুঝতাম (সুনানে আবু দাউদ)। দ্বিতীয়, আলী ও ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুম প্রমুখ থেকে বর্ণিত, 'মাউন' অর্থ যাকাত। উভয় অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

আয়াতের শিক্ষা হলো, প্রতিবেশীর ছোটখাটো প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া ঈমানের অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, জিবরীল আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে এত বেশি উপদেশ দিচ্ছিলেন যে আমার মনে হচ্ছিল, তিনি তাকে উত্তরাধিকারী বানিয়ে দেবেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। তিনি আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেছেন, যখন তুমি তরকারি রান্না করো, ঝোল বাড়িয়ে নিয়ো এবং প্রতিবেশীদের দিয়ো (সহীহ মুসলিম)। তিনি মুসলিম নারীদের বলেছেন, কোনো প্রতিবেশিনী যেন তার প্রতিবেশিনীর উপহারকে তুচ্ছ না ভাবে, এমনকি তা ছাগলের একটি খুর হলেও (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

একটি সুন্দর ঘটনা এখানে মনে পড়ে। একজন মা প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে সামান্য লবণ চাইতে গেলেন, অথচ তাঁর ঘরে লবণ ছিল। সন্তান জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমার প্রতিবেশী

প্রায়ই আমার কাছে কিছু না কিছু চাইতে আসে। আমি যদি কখনো তার কাছে না চাই, সে হয়তো চাইতে সংকোচ বোধ করবে। তাই আমি মাঝেমধ্যে তার কাছে চাই, যাতে সে নির্দ্বিধায় আমার কাছে চাইতে পারে। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রতিবেশীর প্রতি এই ধরনের সংবেদনশীলতা আখিরাতে বড় প্রতিদানের কারণ হতে পারে।

এই সূরায় তিন শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে, যারা নামাযের ব্যাপারে গাফেল, যারা লোক-দেখানো ইবাদত করে এবং যারা অন্যের সামান্য প্রয়োজনে সাড়া দিতে কার্পণ্য করে। এদের জন্য ধ্বংস।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আখিরাতে বিশ্বাস মানুষকে অন্যায় থেকে ফেরায়। এই বিশ্বাস দুর্বল হলে ইয়াতীম ও দরিদ্রের প্রতি নির্দয়তা তৈরি হয়।
- ইয়াতীমকে সম্মানের সঙ্গে সাহায্য করা এবং তার অধিকার রক্ষা করা প্রতিটি মুমিনের দায়িত্ব। নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে কোনো ইয়াতীমের খরচের দায়িত্ব নেওয়া একটি উত্তম পথ।
- নিজে মিসকিনকে সাহায্য করার পাশাপাশি অন্যদেরও উৎসাহিত করা মুমিনের দায়িত্ব।
- নামাযের সময়ের ব্যাপারে অবহেলা, খেলাধুলা, কাজ বা বিনোদনের কারণে নামায পিছিয়ে দেওয়া গুরুতর অপরাধ।
- লোক-দেখানো নামায বা ইবাদত ছোট শিরক। আমাদের প্রতিটি আমল হওয়া উচিত আল্লাহর জন্য।
- প্রতিবেশীর সামান্য প্রয়োজনে সাড়া দেওয়া ঈমানের দাবি। এই ছোট সহযোগিতাও আল্লাহর কাছে বড় প্রতিদান বয়ে আনে।
- যাকাত পরিকল্পিতভাবে এমনভাবে দেওয়া দরকার, যাতে অভাবী মানুষ স্বাবলম্বী হতে পারে।

অধ্যায় ৩১

সূরা কাউসার

الكوثر

হাউযে কাউসার ও নবীজির মর্যাদা

কুরআনের ১০৮তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৩টি

সূরা কাউসার কুরআনের ১০৮তম সূরা এবং সবচেয়ে ছোট সূরা। আয়াত মাত্র তিনটি। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এটি মক্কায় অবতীর্ণ। এই ছোট্ট সূরার পেছনে একটি বড় ও বেদনাদায়ক প্রেক্ষাপট আছে।

নবীজির জীবনের এক বেদনাময় অধ্যায়

আমরা অনেক সময় ভাবি, যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে চলে, নামায পড়ে, সদকা দেয়, তার জীবনে বিপদ আসবে কেন? আমার ব্যবসায় বরকত হবে, যে নামায পড়ে না তার হবে না, এটাই নিয়ম। তাই বিপদে পড়লে অভিযোগ করি, আমি এত নামায পড়ি, এত দান করি, তবু আমার জীবনে শুধু বিপদ, আর যে নামাযই পড়ে না, তার তো দিন দিন উন্নতি! যদি এই ধারণা সঠিক হতো, তাহলে কোনো নবীর জীবনে কোনো কষ্ট থাকত না, সব দুঃখ আসত কাফিরদের জীবনে। অথচ ইতিহাস বলে, নবীদের জীবনে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা এসেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা নবীদের, তারপর যাঁরা তাঁদের পর সবচেয়ে উত্তম, তারপর যাঁরা তাঁদের পর (জামে তিরমিযী)। আল্লাহর যিনি যত নিকটবর্তী, তাঁর পরীক্ষা তত কঠিন হতে পারে। পরীক্ষার ধরনও ভিন্ন। কারও পরীক্ষা নিয়ামত পেয়ে শোকর করার, যেমন সুলাইমান আলাইহিস সালামের বিশাল রাজত্ব ছিল। কারও পরীক্ষা কষ্টে সবর করার, যেমন আইয়ূব আলাইহিস সালামের রোগ।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মের আগেই পিতাকে হারিয়েছেন। শৈশবে মা ও দাদাকে হারিয়েছেন। আমরা অনেকেই মেনে নিই যে বাবা-মা আমাদের আগে দুনিয়া ছেড়ে যাবেন। কিন্তু সন্তান নিজের আগে চলে যাবে, কাঁধে করে সন্তানের লাশ বহন করে দাফন করতে হবে, এটি মেনে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাতজন সন্তান ছিলেন। তাঁর তিন পুত্র কাসিম, আবদুল্লাহ ও ইবরাহীম শৈশবেই ইন্তেকাল করেন। কন্যাদের মধ্যে যয়নাব, রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুন্না তাঁর জীবদ্দশাতেই চলে যান। শুধু ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা তাঁর ওফাতের কিছুদিন পর পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। অর্থাৎ

ছয়জন সন্তানের মৃত্যু তিনি নিজের চোখে দেখেছেন। পৃথিবীর সবচেয়ে ভারী বোঝা বাবার কাঁধে সন্তানের লাশ, যাঁরা এ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁরাই বুঝবেন। ছোট্ট ইবরাহীমের মৃত্যুর সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চোখ থেকে অশ্রু ঝরেছে। তিনি বলেছেন, চোখ অশ্রু ঝরায়, অন্তর ব্যথিত হয়, আর আমরা তা-ই বলি, যা আমাদের রব সন্তুষ্ট করে। হে ইবরাহীম, তোমার বিচ্ছেদে আমরা শোকাহত (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এর আগে প্রিয়তমা স্ত্রী খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকেও তিনি দাফন করেছেন।

এমনই এক শোকের সময়, যখন সান্ত্বনা দেওয়ারই কথা, তখন মক্কার কিছু কাফির তাঁকে নিয়ে বিদ্রূপ করল, মুহাম্মাদ তো 'আবতার', অর্থাৎ নির্বংশ, তাঁর কোনো পুত্রসন্তান বেঁচে নেই, তাঁর বংশধারা টিকবে না। বর্ণনায় এই বিদ্রূপকারী হিসেবে আস ইবনে ওয়াইল, কারও মতে আবু লাহাব, উকবা ইবনে আবু মুআইত প্রমুখের নাম এসেছে। তাদের ধারণা ছিল, পুত্রসন্তান না থাকলে নাম মুছে যাবে।

এই পরিস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় নবীকে সান্ত্বনা দিতে এই সূরা নাযিল করলেন।

❖ সূরা কাউসার, আয়াত ১

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ١

[১] নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি।

আয়াত ১: 'নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি'

প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, 'ইন্না আতাইনাকাল কাউসার'। 'কাউসার' শব্দের মূল 'কাসরাত' (প্রাচুর্য)। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, কাউসার অর্থ প্রভূত কল্যাণ। তিনি এ-ও বলেছেন, এর অন্তর্ভুক্ত জান্নাতের নদীও (সহীহ বুখারী)। এখানে দুটি অর্থই সুসংহত। প্রথম অর্থ, সব ধরনের কল্যাণ, জ্ঞান, হিকমত, কুরআন, নবুওয়াত, অগণিত অনুসারী, আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন। দ্বিতীয় অর্থ, জান্নাতের একটি বিশেষ নদী, যার নাম কাউসার।

সহীহ মুসলিমে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হলেন, তারপর হাসিমুখে মাথা তুললেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কেন হাসছেন? তিনি বললেন, এখনই আমার ওপর একটি সূরা নাযিল হয়েছে। তিনি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, ইন্না আতাইনাকাল কাউসার' পড়লেন। তারপর বললেন, তোমরা কি জানো কাউসার কী? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালো জানেন। তিনি বললেন, এটি একটি নদী, যার প্রতিশ্রুতি আমার রব আমাকে দিয়েছেন। এতে প্রচুর কল্যাণ আছে। এটি একটি হাউয, যার কাছে কিয়ামতের দিন আমার উম্মত আসবে। এর পাত্রের সংখ্যা আকাশের তারকার সমান।

সহীহ বুখারীর বর্ণনায় আছে, মিরাজের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জান্নাতে এক নদী দেখলেন, যার দুই তীরে ফাঁপা মুক্তার গম্বুজ। জিবরীলকে জিজ্ঞেস করলেন, এটি কী? তিনি বললেন, এটি কাউসার। তার মাটি ছিল মিশকের মতো সুগন্ধি।

হাউযে কাউসারের পানি দুধের চেয়ে সাদা, মধুর চেয়ে মিষ্টি, মিশকের চেয়ে সুগন্ধি। যে একবার পান করবে, সে আর কখনো তৃষ্ণার্ত হবে না (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ-ও বলেছেন, কিছু লোককে হাউয থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে। আমি বলব, এরা তো আমার উম্মত। বলা হবে, আপনি জানেন না আপনার পরে তারা কী নতুন জিনিস সৃষ্টি করেছে। আমি বলব, দূর হও, দূর হও, যারা আমার পরে (দ্বীনে) পরিবর্তন ঘটিয়েছে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। এই হুঁশিয়ারি আমাদের সুন্নাহ অনুসরণে যত্নবান হতে এবং দ্বীনে নতুন সংযোজন থেকে বাঁচতে তাগিদ দেয়।

কাউসার দান করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাঁর নবীকে এক ধরনের জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি অবশ্যই জান্নাতী, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবু এই দানের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

❖ সূরা কাউসার, আয়াত ২

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ ﴿٢﴾

[২] অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে নামায পড়ুন এবং কোরবানী করুন।

আয়াত ২: 'সুতরাং আপনার রবের জন্য নামায পড়ুন এবং কুরবানি করুন'

দ্বিতীয় আয়াতে নির্দেশ, 'ফাসাল্লি লিরব্বিকা ওয়ানহার'। 'ফা' (সুতরাং) অব্যয় কারণ-ফলাফল বোঝায়। আমি আপনাকে এত বড় নিয়ামত দিয়েছি, তাই আপনি শোকর আদায়ে নামায পড়ুন ও কুরবানি করুন।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা আছে। আমরা সাধারণত কোনো গ্যারান্টি পেলে বেপরোয়া হয়ে যাই। ধরুন, কেউ শুনল, আমার জন্য সবকিছু ঠিক আছে, তাহলে সে যা ইচ্ছা করতে প্রস্তুত। কিন্তু আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আচরণ ভিন্ন। আশারায়ে মুবাশশারা, অর্থাৎ যে দশজন সাহাবী একসঙ্গে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন, তাঁদের কেউ নামায ছাড়েননি, বরং তাঁদের ইবাদতের সাধনা আরও বেড়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়ার পরেও আল্লাহ বলেছেন, নামায পড়ুন ও কুরবানি করুন।

'নাহর' অর্থ উট যবেহ করা। অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে এখানে কুরবানির নির্দেশ। সে সমাজে উট ছিল সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ, আজকের দামি গাড়ির মতো। উট কুরবানি করা মানে নিজের একটি বড় সম্পদ আল্লাহর জন্য বিলিয়ে দেওয়া। কুরআনে নামাযের সঙ্গে যাকাত বা দানের কথা প্রায়ই একসঙ্গে আসে, কারণ নামাযে যেমন শরীর ও সময়ের ত্যাগ, দানে তেমন সম্পদের

ত্যাগ। অনেক মানুষ তাহাজ্জুদ পর্যন্ত পড়েন, কিন্তু সদকা দিতে সংকোচ বোধ করেন। ঈমানের পরীক্ষা এই দুই ক্ষেত্রেই। আল্লাহ বলেছেন, আপনি বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজগতের রব আল্লাহর জন্য (সূরা আনআম ৬:১৬২)। ঈদুল আযহার দিনে প্রথমে ঈদের নামায, তারপর কুরবানি, এ সুন্নাহও এখান থেকে এসেছে (সহীহ বুখারী)।

❖ সূরা কাউসার, আয়াত ৩

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

[৩] যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।

আয়াত ৩: 'নিশ্চয়ই আপনার শত্রুই নির্বংশ'

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বিদ্রূপকারীদের জবাব দিয়েছেন, 'ইন্না শানিআকা হুওয়াল আবতার'। 'শানিআ' অর্থ বিদ্বেষ পোষণকারী, শত্রু। 'আবতার' অর্থ লেজকাটা, যার কোনো ধারা বা উত্তরসূরি নেই। অর্থাৎ যারা আপনার নিন্দা করছে, তারাই নির্বংশ, তাদের নাম-নিশানা মুছে যাবে।

ইতিহাস এ কথার সাক্ষী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহার মাধ্যমে হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা হয়ে আজও টিকে আছে। আর তাঁর নিন্দাকারীদের নাম এসেছে শুধু ধিক্কারের সঙ্গে, তাদের বংশধারা তাঁর অনেক আগেই হারিয়ে গেছে। 'নির্বংশ' বলে বিদ্রূপকারীদের উদ্দেশ্য ছিল, সন্তান না থাকলে তাঁর নাম কেউ স্মরণ করবে না, কারণ সন্তানের মাধ্যমেই মানুষের নাম বংশপরম্পরায় টিকে থাকে।

কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে কতটা স্মরণীয় করে রেখেছেন, তা একটু ভাবুন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে সময়ের পার্থক্য আছে। এক এলাকায় যখন ফজরের আযান শেষ হয়, তার কিছুক্ষণ পরই আরেক এলাকায় আযান শুরু হয়। আযানে আছে 'আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ'। আল্লাহর নামের সঙ্গে তাঁর নাম যুক্ত। এভাবে পৃথিবীর কোথাও না কোথাও প্রতি মুহূর্তে তাঁর নাম উচ্চারিত হচ্ছে। আমরা প্রতিদিন নামাযে তাশাহহুদ ও দরূদ পড়ি। আমাদের প্রতিটি কাজে তাঁর সুন্নাহ আছে। এভাবে আল্লাহ তাঁর নাম স্মরণীয় করে রেখেছেন, যেভাবে সূরা ইনশিরাহে বলেছেন, 'আমি আপনার আলোচনাকে সমুন্নত করেছি' (৯৪:৪)।

কেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোনো পুত্র সন্তান বেঁচে থাকলেন না, এর মধ্যে আল্লাহর বড় হিকমত আছে। আল্লাহই ভালো জানেন। হতে পারে, কোনো পুত্র বেঁচে থাকলে তাঁকে ঘিরে 'নবীর সন্তান' বলে অতিভক্তি, এমনকি শিরক শুরু হয়ে যেতে পারত। সূরা আহযাবে আল্লাহ স্পষ্ট বলেছেন, মুহাম্মাদ তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন, তিনি আল্লাহর রাসূল ও সর্বশেষ নবী (৩৩:৪০)। তাঁর আধ্যাত্মিক পিতৃত্ব পুরো উম্মতের ওপর, আর বংশধারা কন্যার মাধ্যমে রক্ষিত হয়েছে।

এখান থেকে আমাদের জন্য একটি শিক্ষা আছে। অনেক মা-বাবা পুত্রসন্তান না হওয়ায় দুশ্চিন্তায় থাকেন, ভাবেন, আমার বংশ বুঝি শেষ হয়ে যাবে। আল্লাহ যাঁকে যে সন্তান দিয়েছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। আল্লাহর পরিকল্পনা আমাদের জানা নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কন্যাদের লালন-পালনের বিশাল ফযীলতের কথা বলেছেন, যা আমরা সূরা তাকভীরে দেখেছি।

সূরা কাউসার আমাদের শেখায়, আল্লাহ যখন কারও জীবনে কষ্ট দেন, তার বিপরীতে প্রতিদানও রাখেন। কারও ক্ষেত্রে তা দুনিয়ায় প্রকাশ পায়, কারও ক্ষেত্রে আখিরাতে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ওহী আসত, তাই তাঁর প্রতিদান আমাদের জানা। যিনি দুনিয়ার সামান্য খ্যাতি বা সম্মান না পেয়ে মন খারাপ করেন, তিনি মনে রাখুন, আল্লাহ চাইলে অন্য কোনো উপায়ে তাঁর সম্মান বাড়াতে পারেন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরও কঠিন পরীক্ষা আসে। বিপদ মানেই আল্লাহর অসন্তুষ্টি নয়।
- সন্তান হারানোর মতো কঠিন কষ্টও আল্লাহর নবীকে সহ্য করতে হয়েছে। ধৈর্যের এটি সবচেয়ে বড় আদর্শ।
- কাউসার মানে প্রভূত কল্যাণ এবং জান্নাতের একটি বিশেষ নদী। হাউযে কাউসারের পানি তার থেকেই আসে।
- জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েও নবীজিকে নামায ও কুরবানির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সুসংবাদ ইবাদতের গতি বাড়ায়, বেপরোয়া করে না।
- নামায শরীর ও সময়ের ইবাদত, কুরবানি সম্পদের ইবাদত। উভয় ক্ষেত্রেই ত্যাগ প্রয়োজন।
- আল্লাহ তাঁর নবীর নাম প্রতি মুহূর্তে সারা বিশ্বে স্মরণীয় করে রেখেছেন। বিদ্রূপকারীদের নাম হারিয়ে গেছে।
- আল্লাহ যাকে যা দেন, তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। পুত্র বা কন্যা, সবই তাঁর হিকমতপূর্ণ ফয়সালা।
- হাউযে কাউসারের পানি পান করতে হলে সুন্নাহর অনুসরণ জরুরি। দ্বীনে নতুন সংযোজনকারীদের সেখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

অধ্যায় ৩২

সূরা কাফিরূন

الكافرون

তোমাদের দ্বীন তোমাদের, আমার দ্বীন আমার

কুরআনের ১০৯তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৬টি

সূরা কাফিরূন কুরআনের ১০৯তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা ছয়। এই সূরাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের আগের দুই রাকাত সুন্নাতের প্রথম রাকাতে সূরা কাফিরূন এবং দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়তেন (সহীহ মুসলিম)। মাগরিবের পরের দুই রাকাত সুন্নাতেও একই বর্ণনা আছে (জামে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)। তাওয়াফের পর দুই রাকাত নামাযেও তিনি এই দুই সূরা পড়েছেন (সহীহ মুসলিম, জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত)। বিতর নামাযের প্রথম রাকাতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাতে সূরা কাফিরূন ও তৃতীয় রাকাতে সূরা ইখলাস পড়া সুন্নাহ (সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ)। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি নামাযে এই সূরা অনেক বেশি তিলাওয়াত করতেন।

জামে তিরমিযীতে একটি বর্ণনায় এসেছে, সূরা কাফিরূন কুরআনের এক-চতুর্থাংশের সমান, তবে এর সনদ নিয়ে মুহাদ্দিসদের মধ্যে মতভেদ আছে। আরেকটি হাদীসে নওফাল আল-আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তুমি 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন' পড়ে ঘুমাও, কারণ এটি শিরক থেকে মুক্তির ঘোষণা (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)। কেউ যদি ঘুমের আগে এই সূরা তিলাওয়াত করে, সে নিজেকে শিরক থেকে মুক্ত ঘোষণা করে ঘুমায়। ঘুমের মধ্যে মৃত্যু এলে ইনশাআল্লাহ তাওহীদের ওপর মৃত্যু হবে। এই আমলটি আমরা নিয়মিত করতে পারি।

'তিন কুল' ও 'চার কুল'

আমাদের সমাজে 'তিন কুল' ও 'চার কুল' নামে একটি পরিভাষা প্রচলিত আছে। সকাল-সন্ধ্যা তিনবার করে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়লে তা যথেষ্ট হয়ে যায়, এ হাদীস প্রমাণিত (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)। এই আমলকে বলা হয় 'তিন কুল'। অনেকে এর সঙ্গে সূরা কাফিরূন যোগ করে 'চার কুল' বলেন, শুধু প্রত্যেকটির শুরুতে 'কুল' থাকার কারণে। অথচ হাদীসে বর্ণিত আমলটিতে সূরা কাফিরূন নেই। শুধু 'কুল' দিয়ে শুরু হওয়ার কারণে যদি কোনো সূরা এই তালিকায় আসত, তাহলে সূরা জিনও আসত, যার শুরুতে আছে 'কুল উহিয়া ইলাইয়া'

(৭২:১)। তবে সূরা কাফিরূন নিজে স্বতন্ত্রভাবে অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ, ঘুমের আগে এবং বিভিন্ন সুন্নাত নামাযে এটি পড়া উত্তম।

❖ সূরা কাফিরূন, আয়াত ১–৫

قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡكَٰفِرُونَ ١

[১] বলুন, হে কাফেরকূল

لَآ أَعۡبُدُ مَا تَعۡبُدُونَ ٢

[২] আমি এবাদত করিনা, তোমরা যার এবাদত কর।

وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٣

[৩] এবং তোমরাও এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি

وَلَآ أَنَا۠ عَابِدٞ مَّا عَبَدتُّمۡ ٤

[৪] এবং আমি এবাদতকারী নই, যার এবাদত তোমরা কর।

وَلَآ أَنتُمۡ عَٰبِدُونَ مَآ أَعۡبُدُ ٥

[৫] তোমরা এবাদতকারী নও, যার এবাদত আমি করি।

আয়াত ১–৫: তাওহীদের স্পষ্ট ঘোষণা

শানে নুযূল

মক্কায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মূর্তিপূজা ও শিরকের বিরুদ্ধে দাওয়াত দিচ্ছিলেন, তখন কুরাইশ সর্দাররা তাঁকে নানা প্রলোভন দেখিয়েছিল। তারা বলেছিল, আপনি কী চান? সম্পদ চাইলে আমরা আপনাকে মক্কার সবচেয়ে ধনী করে দেব, নেতৃত্ব চাইলে আমাদের নেতা বানাব, সুন্দরী নারী চাইলে বিয়ে করিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো প্রস্তাবে রাজি হননি। বর্ণিত আছে, তিনি চাচা আবু তালিবকে বলেছিলেন, যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তবু আমি এই কাজ ছাড়ব না।

শেষ পর্যন্ত তারা এক সমঝোতার প্রস্তাব নিয়ে এল। ইবনে ইসহাক ও অন্যদের বর্ণনা অনুযায়ী ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়াইল, আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিব ও উমাইয়া ইবনে খালাফের মতো নেতারা বলল, এক বছর আপনি আমাদের উপাস্যদের (লাত ও উযযার) ইবাদত করুন, আরেক বছর আমরা আপনার রবের ইবাদত করব। এভাবে আমাদের মধ্যে একটি মীমাংসা হয়ে যাবে। কেউ কেউ বলেছে, এক বছর আমাদের মূর্তির পক্ষে বলবেন, আরেক বছর

আমরা আপনার রবের পক্ষে বলব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তরে এই সূরা নাযিল হয়। তাঁর পক্ষে তাওহীদ ও শিরকের এই সংমিশ্রণ কখনোই সম্ভব ছিল না।

আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফিরূন', আপনি বলুন, হে কাফিররা! আল্লাহ এখানে 'যারা কুফর করেছে' না বলে বলেছেন 'আল-কাফিরূন' (কাফিরগণ)। এর অর্থ, যাদের কুফর সুনিশ্চিত, যারা সত্য স্পষ্ট বোঝার পরও জেদ ও অহংকারে অবিচল, এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশে সম্বোধন। ইবনে কাসীর রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এটি কুরাইশের সেই বিশেষ কিছু ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ জানতেন, তারা ঈমান আনবে না। তাই এই সম্বোধন সব অমুসলিমের জন্য সাধারণ ডাক নয়।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'লা আবুদু মা তা'বুদূন', তোমরা যার ইবাদত করো, আমি তার ইবাদত করি না। এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। মক্কার মুশরিকরা আল্লাহকে অস্বীকার করত না। কুরআনে আছে, যদি তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, আসমান ও জমিন কে সৃষ্টি করেছেন, তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ (সূরা লুকমান ৩১:২৫, সূরা যুখরুফ ৪৩:৮৭)। অর্থাৎ তারা আল্লাহকে মানত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে অন্যদেরও শরিক করত, তারা মনে করত, মূর্তিরা আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী। আয়াতে 'মা' (যা) ব্যবহার করা হয়েছে, 'মান' (যিনি) নয়। অর্থাৎ 'আমি তোমাদের ইবাদতের সেই পদ্ধতি ও সেই বিশ্বাস গ্রহণ করি না, যাতে শিরক মিশে আছে।' আল্লাহকে মানা যথেষ্ট নয়, একমাত্র আল্লাহকেই মানতে হবে।

আমাদের কালেমা এই কথাই শেখায়। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-তে প্রথমে 'লা ইলাহা' (কোনো ইলাহ নেই), অর্থাৎ সব শিরককে অস্বীকার করা। তারপর 'ইল্লাল্লাহ' (শুধু আল্লাহ)। আগে নেতিবাচক, পরে ইতিবাচক। যে কেবল বলে, 'আমি আল্লাহর ইবাদত করি', অথচ অন্য কিছুকে আল্লাহর অংশীদার ভাবে, সে তাওহীদের শর্ত পূরণ করেনি।

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া লা আনতুম আবিদূনা মা আ'বুদ', আর আমি যার ইবাদত করি, তোমরাও তাঁর ইবাদতকারী নও। অর্থাৎ আমার ইবাদত শিরকমুক্ত, একমাত্র আল্লাহর জন্য। তোমাদের ইবাদতে শিরক মিশে আছে, তাই তোমরা প্রকৃতপক্ষে আমার উপাস্যের ইবাদতকারী নও।

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া লা আনা আবিদুম মা আবাদতুম', আর আমি কখনো তোমাদের ইবাদতকারী হব না। পঞ্চম আয়াতে আবার, 'ওয়া লা আনতুম আবিদূনা মা আ'বুদ'। এখানে কেন একই কথা বারবার? মুফাসসিরগণ বলেন, এটি কথাকে দৃঢ় করার জন্য। কেউ যখন কোনো সিদ্ধান্তে একেবারে অটল থাকে, তখন সে একই কথা বারবার বলে, আমি করব না, আমি করব না, কখনো করব না। আবার কেউ কেউ বলেছেন, দুই জোড়া আয়াতে কালের পার্থক্য আছে।

একটিতে বর্তমান ও ভবিষ্যতের কথা, অন্যটিতে অতীতের। অর্থাৎ আমি এখন তোমাদের উপাস্যের ইবাদত করি না, ভবিষ্যতেও করব না, অতীতেও করিনি। এখানে কোনো অস্পষ্টতা, দ্বিধা বা আপসের সুযোগ নেই। মুমিনের অবস্থান ঈমান ও শিরক আলাদা। ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাঁর কওমকে বলেছিলেন, আমরা তোমাদের থেকে ও তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করো তাদের থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৪)। এই ঘোষণা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে।

❖ সূরা কাফিরূন, আয়াত ৬

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

[৬] তোমাদের কর্ম ও কর্মফল তোমাদের জন্যে এবং আমার কর্ম ও কর্মফল আমার জন্যে।

আয়াত ৬: ‘তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন, আমার জন্য আমার দ্বীন’

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন’। এই আয়াতটি নিয়ে সবচেয়ে বেশি ভুল ব্যাখ্যা হয়। অনেকে বলেন, ‘যার যার ধর্ম তার তার কাছে, সব ধর্মই সঠিক, আমরা সবার উৎসবে অংশ নেব।’ এটি আয়াতের সঠিক অর্থ নয়। পুরো সূরার ধারাবাহিকতা দেখুন। প্রথমে ঘোষণা: আমি তোমাদের উপাস্যের ইবাদত করি না, তোমরা আমার উপাস্যের ইবাদত করো না। তারপর শেষ বাক্য এই বিচ্ছিন্নতারই সমাপ্তি। অর্থাৎ ‘তোমাদের সঙ্গে আমার বিশ্বাসগত কোনো সম্পর্ক নেই। তোমরা তোমাদের পথে, আমি আমার পথে। এ বিষয়ে আমি তোমাদের কোনো বৈধতা দিই না।’ এটি বিশ্বাসগত বিচ্ছিন্নতার (বারাআত) ঘোষণা, ধর্মীয় সমন্বয়ের নয়।

সব ধর্ম কি সঠিক?

কেউ কেউ বলেন, আল্লাহ সব ধর্মই দিয়েছেন, ইসলাম, খ্রিস্টবাদ ও অন্যান্য ধর্ম, সবই সঠিক, পার্থক্য কেবল নামে। এ ধারণা কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের পরিপন্থী। আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর কাছে একমাত্র দ্বীন ইসলাম (সূরা আলে ইমরান ৩:১৯)। আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায়, তা কখনো তার কাছ থেকে কবুল করা হবে না (৩:৮৫)।

ইসলাম কোনো নতুন ধর্ম নয় যে ১৪০০ বছর আগে এসেছে। আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে প্রত্যেক নবীর দ্বীন ছিল ইসলাম, অর্থাৎ আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ। কোনো নবী ইয়াহূদী বা খ্রিস্টান ছিলেন না। আল্লাহ বলেছেন, ইবরাহীম না ইয়াহূদী ছিলেন, না খ্রিস্টান, তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম (৩:৬৭)। ঈসা আলাইহিস সালামের সাহাবীরা বলেছিলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমরা মুসলিম (৩:৫২)।

এ কথার অর্থ এই নয় যে প্রত্যেক নবীর শরীয়ত হুবহু এক। একেক নবীকে বিধান দেওয়া হয়েছে তাঁর যুগ ও কওমের উপযোগী করে। যেমন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হজের ঘোষণা দিয়েছিলেন, কিন্তু আমরা যে পদ্ধতিতে হজ করি, তা পূর্ণতা পেয়েছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে। সব নবী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়েননি, যদিও নামায আগেও ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ইসলামকেই পূর্ণাঙ্গ রূপে নিয়ে এসেছেন। আল্লাহ বলেছেন, আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম (সূরা মায়িদা ৫:৩)। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, মোবাইল ফোনের সফটওয়্যারের বিভিন্ন সংস্করণ আসতে থাকে, শেষ সংস্করণে সব উন্নতি পূর্ণ হয়। ইসলামও তেমনই। শেষ নবীর মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়েছে। এরপর নতুন কোনো সংস্করণ আসবে না।

কীসে পরস্পর সহাবস্থান, কীসে নয়

আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝলে দুটি বিষয় স্পষ্ট হয়। প্রথম, ইসলাম অন্য ধর্মের মানুষের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের শিক্ষা দেয়। আল্লাহ বলেছেন, দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই (সূরা বাকারা ২:২৫৬)। যারা দ্বীনের কারণে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদের ঘরবাড়ি থেকে বের করেনি, তাদের সঙ্গে সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ নিষেধ করেননি (সূরা মুমতাহিনা ৬০:৮)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো চুক্তিবদ্ধ অমুসলিমকে হত্যা করে, সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না (সহীহ বুখারী)। কাজেই তাদের জান, মাল ও ইবাদতের নিরাপত্তা ইসলামি শিক্ষা। তাদের উপাসনালয় ভাঙা, তাদের নিপীড়ন করা, ইসলামের শিক্ষা নয়।

দ্বিতীয়, বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আপস নেই। আমি তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করতে পারি, কিন্তু তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসকে সঠিক বলে বৈধতা দিতে পারি না। তাদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানে, যেমন পূজা-অর্চনায় অংশগ্রহণ করা যাবে না, এ বিষয়ে ফকীহদের মধ্যে ঐকমত্য আছে। রাজনীতিতে যেমন কেউ অন্য দলের নেতার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিলে নিজ দলে প্রশ্নের মুখোমুখি হয়, তেমনি এখানে আল্লাহর একত্ব নিয়ে প্রশ্ন, যা অনেক বেশি গুরুতর। যে বিশ্বাস আল্লাহর সঙ্গে শরিক সাব্যস্ত করে, বিশেষত যে বিশ্বাসে আল্লাহর সন্তান আছে বলা হয়, এর কঠোরতা কুরআনেই বলা আছে। আল্লাহ বলেছেন, 'এ কথায় আসমান-জমিন ফেটে পড়ার, পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়ার উপক্রম হয়' (সূরা মারইয়াম ১৯:৯০–৯১)। আপনি যে মাকে ভালোবাসেন, কেউ প্রকাশ্যে তাঁকে গালি দিলে আপনি তার সঙ্গে আপস করবেন না, সেখানে আল্লাহর শানে কটূক্তির ব্যাপারে আমরা কীভাবে নীরব সমর্থন দিতে পারি?

অমুসলিমদের ধর্মীয় উৎসবে শুভেচ্ছা জানানো নিয়ে সমকালীন আলেমদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে তাইমিয়া ও ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুমাল্লাহসহ অনেক ফকীহ ধর্মীয় উৎসবের শুভেচ্ছা জানানোকে নাজায়েয বলেছেন, কারণ তা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বীকৃতির সঙ্গে জড়িত। আর কিছু সমকালীন আলেম বলেছেন, যারা মুসলমানদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে না, তাদের সঙ্গে সামাজিক সৌজন্য হিসেবে নির্দিষ্ট শব্দ ছাড়া শুভকামনা জানানো যেতে পারে,

যদি তাতে তাদের বিশ্বাসের সমর্থন না থাকে। প্রত্যেকের উচিত নিজ নির্ভরযোগ্য আলেমের পরামর্শ অনুসরণ করা এবং কোনোভাবেই বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে না যাওয়া। আমাদের নিশ্চিত থাকতে হবে, তাদের নিরাপত্তা ও ন্যায্য অধিকার আমাদের দায়িত্ব, আর আমাদের বিশ্বাস আল্লাহর একত্বে আপসহীন।

শিরক থেকে বাঁচার দোয়া

সমাজে প্রচলিত কিছু প্রকাশ্য শিরক, যেমন কবরে সিজদা, মান্নত, তাবিজে অতিবিশ্বাস ও গায়েবের জ্ঞানের দাবি, এসব নিয়ে আমাদের আলোচনা ও সতর্কতা দরকার। এ ছাড়া সূক্ষ্ম শিরকও আছে, যেমন রিয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে এই দোয়া শিখিয়েছেন, **আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আলামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আলামু**, হে আল্লাহ, আমি জেনে আপনার সঙ্গে শিরক করা থেকে আপনার আশ্রয় চাই, আর যা জানি না, তার জন্য ক্ষমা চাই (মুসনাদে আহমাদ)। আল্লাহ বলেছেন, শিরক বড় জুলুম (সূরা লুকমান ৩১:১৩)। আল্লাহ শিরক ক্ষমা করেন না, এর নিচে যা, যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন (সূরা নিসা ৪:৪৮)।

এই সূরার মাধ্যমে একজন মুমিন প্রতিদিন তাওহীদের ঘোষণা দেয়, আমি আল্লাহ ছাড়া কারও ইবাদত করি না। তোমরা তোমাদের পথে চলো, তোমাদের পরিণতির জবাব তোমাদের কাছেই, কিন্তু আমি আমার তাওহীদে অবিচল।

শিক্ষা ও উপদেশ

- সূরা কাফিরূন শিরক থেকে মুক্তি ও তাওহীদের ঘোষণাপত্র। ঘুমের আগে এটি পড়া সুন্নাত, আর ফজর ও মাগরিবের সুন্নাতে এটি পড়া উত্তম।
- ‘তিন কুল’ হলো সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস। সূরা কাফিরূনের স্বতন্ত্র ফযীলত আছে, কিন্তু তিন কুলের হাদীসে এটি নেই।
- মুশরিকরাও আল্লাহকে মানত, কিন্তু তাঁর সঙ্গে শরিক করত। একমাত্র আল্লাহর ইবাদতই তাওহীদ।
- ঈমানে ও শিরকে কোনো সংমিশ্রণ বা আপস নেই। তাওহীদের ক্ষেত্রে পূর্ণ স্পষ্টতা থাকতে হবে।
- ‘লাকুম দ্বীনুকুম ওয়া লিয়া দ্বীন’ কোনো ধর্মীয় সমন্বয়ের ঘোষণা নয়। এটি বিশ্বাসগত বিচ্ছিন্নতার ঘোষণা। একই সঙ্গে ইসলাম ভিন্নধর্মীদের জান-মাল, ইবাদত ও ন্যায্য অধিকারের নিরাপত্তা দেয়।
- আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন ইসলাম। সব নবীর দ্বীন ছিল ইসলাম, আর শেষ নবীর মাধ্যমে তা পূর্ণ হয়েছে।

- অন্যদের ধর্মীয় আচারে অংশ নেওয়া যাবে না। ধর্মীয় উৎসবের শুভেচ্ছা নিয়ে আলেমদের মতভেদ আছে, নির্ভরযোগ্য আলেমের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
- শিরক থেকে বাঁচতে নিয়মিত দোয়া ও আত্মসমালোচনা করা দরকার।

অধ্যায় ৩৩

সূরা নাসর

النصر

বিজয়ের মুহূর্তে ইস্তিগফার

কুরআনের ১১০তম সূরা · মাদানী · আয়াত ৩টি

সূরা নাসর কুরআনের ১১০তম সূরা। আয়াত সংখ্যা তিন। এটি মদীনায় অবতীর্ণ। এর আরও কয়েকটি নাম আছে। ‘নাসর’ অর্থ সাহায্য, তাই একে সাহায্যের সূরা বলা যায়। কখনো একে ‘সূরাতুল ফাতহ’ (বিজয়ের সূরা) বলা হয়। আবার ‘সূরাতুত তাওদী’ (বিদায়ের সূরা) নামেও এটি পরিচিত। শেষ নামটির কারণ আছে, যা আমরা একটু পরেই জানব।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন, এটি কুরআনের সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ সূরা, যা নাযিল হয়েছে (সহীহ মুসলিম)। ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, বিদায় হজের সময় মিনায় আইয়ামে তাশরীকের মধ্যবর্তী দিনে এই সূরা নাযিল হয়েছিল (বায়হাকী)। কেউ কেউ বলেছেন, মক্কা বিজয়ের কাছাকাছি সময়ে। বিভিন্ন বর্ণনার মধ্যে এভাবে সামঞ্জস্য করা যায় যে সূরাটি আগে নাযিল হয়েছিল, পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হজে তা আবার তিলাওয়াত করেছিলেন, ফলে যারা আগে শোনেনি, তারা মনে করেছে এখনই নাযিল হয়েছে।

❖ সূরা নাসর, আয়াত ১–২

إِذَا جَآءَ نَصۡرُ ٱللَّهِ وَٱلۡفَتۡحُ ١

[১] যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়

وَرَأَيۡتَ ٱلنَّاسَ يَدۡخُلُونَ فِي دِينِ ٱللَّهِ أَفۡوَاجٗا ٢

[২] এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন

আয়াত ১–২: আল্লাহর সাহায্য, বিজয় ও দলে দলে ইসলাম গ্রহণ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ’, যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আরবিতে সাহায্যের জন্য একাধিক শব্দ আছে। ‘ইআনা’ বলতে সাধারণ কোনো কাজে সহযোগিতা বোঝায়। আর ‘নাসর’ বলতে সাধারণত প্রতিরক্ষা ও যুদ্ধের ক্ষেত্রে সাহায্য,

যেখানে শত্রুর বিরুদ্ধে সাফল্য আসে। এখানে 'নাসরুল্লাহ' বলে বোঝানো হয়েছে, এই বিজয় কোনো মানুষের কৃতিত্ব নয়, এটি আল্লাহর সাহায্য।

'ফাতহ' বলতে অধিকাংশ মুফাসসিরের মতে মক্কা বিজয়। হিজরতের আট বছর পর, ৮ম হিজরীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায় বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন। সাহাবীদের অনেকেই এই সূরা শুনে মনে করেছিলেন, এটি বিজয় ও সাহায্যের সুসংবাদ। কিন্তু কয়েকজন গভীর অন্তর্দৃষ্টির সাহাবী এর মধ্যে আরেক অর্থ খুঁজে পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আর আপনি মানুষকে দেখতে পাবেন, তারা দলে দলে (আফওয়াজা) আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করছে।' মক্কা বিজয়ের আগে মানুষ একজন একজন করে ইসলাম গ্রহণ করত। কিন্তু মক্কা বিজয়ের পর, বিশেষ করে ৯ম হিজরীতে, আরবের গোত্রের পর গোত্র প্রতিনিধিদল পাঠিয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। সেই বছরকে বলা হয় 'আমুল উফূদ' (প্রতিনিধিদলের বছর)। আমর ইবনে সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, আরব গোত্রগুলো ইসলাম গ্রহণের জন্য মক্কা বিজয়ের অপেক্ষায় ছিল। তারা বলত, তাঁকে ও তাঁর কওমকে ছেড়ে দাও। যদি তিনি তাদের ওপর জয়ী হন, তাহলে তিনি নবী (সহীহ বুখারী)। মক্কা জয় হতেই তারা দলে দলে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। কেউ কেউ বর্ণনা করেছেন, ইয়েমেন থেকে শত শত মানুষ তাকবীর বলতে বলতে এসেছিলেন।

বিজয়ের মুহূর্তে মুমিনের আচরণ

একটি যুদ্ধজয়ী সেনাবাহিনীর সাধারণ আচরণ কেমন হয়? তারা উল্লাস করে, উৎসব করে, পরাজিতদের সম্পদ লুট করে, প্রতিশোধ নেয়, নিজেদের বীরত্বের জয়গান গায়। ইতিহাসে আমরা বহু উদাহরণ দেখি, বিজয়ী বাহিনী নগরীতে ঢুকে গণহত্যা চালিয়েছে।

মক্কা বিজয়ের দৃশ্য ছিল ভিন্ন। বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিজয়ীর বেশে উটের পিঠে মক্কায় প্রবেশ করলেন, কিন্তু বিনয়ে এমনভাবে মাথা নুইয়ে রেখেছিলেন যে তাঁর দাড়ি উটের পিঠের গদি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। যে মক্কাবাসী তাঁকে নির্যাতন করেছিল, দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল, যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছিল, তাদের সামনে তিনি দাঁড়ালেন। বর্ণিত আছে, তিনি বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই, যাও, তোমরা মুক্ত। আবু সুফিয়ানের ঘরকে নিরাপদ ঘোষণা করা হলো। তিনি বললেন, যে আবু সুফিয়ানের ঘরে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ। যে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করবে, সে নিরাপদ। যে মসজিদে প্রবেশ করবে, সে নিরাপদ (সহীহ মুসলিম)। রক্তপাত ছাড়াই মক্কা মুসলমানদের হাতে এল।

❖ সূরা নাসর, আয়াত ৩

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَٱسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ تَوَّابًۢا ﴿٣﴾

[৩] তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাকারী।

আয়াত ৩: তাসবীহ, হামদ ও ইস্তিগফার

তৃতীয় আয়াতে আল্লাহ বিজয়ের মুহূর্তের করণীয় শিখিয়ে দিয়েছেন, 'ফাসাব্বিহ বিহামদি রব্বিকা ওয়াসতাগফিরহু, ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা', তখন আপনি আপনার রবের প্রশংসাসহ পবিত্রতা ঘোষণা করুন এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী।

এখানে তিনটি কাজ। এক, তাসবীহ। আল্লাহকে সব ত্রুটি ও অপূর্ণতা থেকে মুক্ত ঘোষণা করা। এর অর্থ, এই বিজয় আমার শক্তি, বুদ্ধি বা কৌশলের ফল নয়। আল্লাহ পবিত্র, তাঁর সাহায্যই সবকিছুর মূল। দুই, হামদ। আল্লাহর প্রশংসা। তিন, ইস্তিগফার। আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।

কেন বিজয়ের সময় ইস্তিগফার? এর কয়েকটি ব্যাখ্যা। প্রথম, এই দীর্ঘ সংগ্রামে আমাদের নিয়ত, আচরণ ও প্রচেষ্টায় যে ত্রুটি রয়ে গেছে, তার ক্ষমা চাওয়া। যুদ্ধ বা কোনো বড় কাজে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ভুল হয়ে যায়। যা-ই আমরা আল্লাহর জন্য করি, তা তাঁর শান অনুযায়ী পরিপূর্ণ নয়। দ্বিতীয়, যখন কেউ সফল হয়, তখন অহংকার জন্মায়, 'আমি করেছি' মনোভাব তৈরি হয়। আমরা অনেকে সাফল্যের পর নিজেকে মাস্টারমাইন্ড মনে করি। কেউ বীরত্বের পদক খোঁজে। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে এমন মনোভাব ছিল না। তাঁরা ভাবতেন, আল্লাহ বিজয় দিয়েছেন, এতে আমাদের কোনো কৃতিত্ব নেই। এ থেকে শিক্ষা, যেকোনো সাফল্যের পর মুমিন আত্মগর্বে মেতে না উঠে আল্লাহর প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনায় মনোযোগী হবে।

এই শিক্ষা শুধু যুদ্ধের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি সাফল্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কেউ পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। সে ভাবতে পারে, আমার মেধার কারণে। কিন্তু মেধা কে দিয়েছেন? আল্লাহ অন্য কাউকে সেই মেধা দিলে সে-ও পারত। কেউ ব্যবসায় সফল হয়েছে, কেউ চাকরিতে পদোন্নতি পেয়েছে, সবার জন্য একই কথা। কারূন বলেছিল, এই সম্পদ আমি আমার জ্ঞানের জোরে পেয়েছি (সূরা কাসাস ২৮:৭৮), আর তার পরিণতি আমরা জানি। সাফল্যের সময় আল্লাহর প্রশংসা করা, নিজের কৃতিত্ব না নেওয়া এবং নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা চাওয়াই কৃতজ্ঞতার প্রকৃত রূপ।

নবীদের ইস্তিগফার ও ইসমত

এখানে একটি প্রশ্ন আসে। আল্লাহ তো সূরা ফাতহে ঘোষণা করেছেন, আপনার আগের ও পরের সব ত্রুটি তিনি ক্ষমা করেছেন (৪৮:২)। তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইস্তিগফারের নির্দেশ কেন?

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আকীদা হলো, নবীগণ নিষ্পাপ (মাসূম)। তাঁরা গুনাহ থেকে সুরক্ষিত। তবে মানবীয় সীমাবদ্ধতার কারণে ইজতিহাদের ভিত্তিতে বা উত্তম বিকল্প ছেড়ে অন্য বিকল্প গ্রহণের কিছু ঘটনা তাঁদের জীবনে ঘটেছে। যেমন বদরের যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরামর্শ অনুযায়ী মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আল্লাহ সূরা আনফালে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন (৮:৬৭–৬৮)। এ ধরনের ঘটনা গুনাহ নয়, কিন্তু নবীদের উচ্চ মর্যাদার কারণে তাঁরা এগুলোকেও গুরুত্ব দিতেন এবং ইস্তিগফার করতেন। আদম আলাইহিস সালামের জান্নাতে নিষিদ্ধ ফল খাওয়া কিংবা মূসা আলাইহিস সালামের ঘুষিতে মিসরীয় লোকটির মৃত্যুর ঘটনা, এসবও ইচ্ছাকৃত অবাধ্যতা ছিল না। কেউ ভুলে রোযা অবস্থায় পানি পান করলে তার রোযা যেমন ভাঙে না, এটিও তেমনি।

এ ছাড়া ইস্তিগফার শুধু গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া নয়, বান্দা হিসেবে আল্লাহর অসীম মর্যাদার সামনে নিজের দাসত্ব ও সীমাবদ্ধতা স্বীকারের একটি রূপ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি প্রতিদিন আল্লাহর কাছে একশো বার ক্ষমা চাই (সহীহ মুসলিম)। তিনি ইস্তিগফার করেছেন, আর সাহাবীদেরও এ আয়াতে ইস্তিগফারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

সূরাটির 'বিদায়ের বার্তা'

সাহাবায়ে কেরামের অধিকাংশ এই সূরাকে বিজয়ের সুসংবাদ হিসেবে বুঝেছিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এর ভেতরে আরেক বার্তা বুঝেছিলেন। উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বদরী প্রবীণ সাহাবীদের মজলিসে তরুণ ইবনে আব্বাসকে রাখতেন। কেউ কেউ আপত্তি করলে উমর একদিন সবাইকে এই সূরা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। কেউ বললেন, আমাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন সাহায্য ও বিজয় আসবে, আমরা আল্লাহর প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনা করব। কেউ চুপ রইলেন। উমর ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমিও কি এ কথাই বলো? তিনি বললেন, না। এটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর সময়ের আগাম সংবাদ। আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিলেন, আপনার দায়িত্ব পূর্ণ হয়েছে। তাই আপনি আপনার রবের প্রশংসা ও ক্ষমা প্রার্থনা করুন। উমর বললেন, আমিও এর চেয়ে বেশি কিছু জানি না (সহীহ বুখারী)।

কারণ রাসূলের মিশন ছিল মানুষকে ইসলামের পথে আনা। যখন সেই মিশন পূর্ণ হলো, দলে দলে মানুষ ইসলামে প্রবেশ করল, তখন যাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল, তাঁর বিদায়ের সময় ঘনিয়ে এল। এ জন্য এর অন্য নাম 'সূরাতুত তাওদী', বিদায়ের সূরা। যে সাহাবীরা এই ইঙ্গিত বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁরা অঝোরে কেঁদেছিলেন।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, এই সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকু ও সিজদায় বেশি বেশি পড়তেন, **সুবহানাকাল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী**, হে আল্লাহ, আপনি পবিত্র, হে আমাদের রব, আপনার প্রশংসাসহ, হে আল্লাহ, আমাকে ক্ষমা করুন। তিনি কুরআনের নির্দেশ পালন করতেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

শেষে আল্লাহ বলেছেন, 'ইন্নাহু কানা তাওওয়াবা', নিশ্চয়ই তিনি বারবার তাওবা কবুলকারী। 'তাওওয়াব' শব্দের অর্থ যিনি পুনঃপুন তাওবা কবুল করেন। আল্লাহ আমাদের বারবার ভুল করা সত্ত্বেও বারবার ক্ষমা করার জন্য প্রস্তুত। এই সুসংবাদ আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় আশ্বাস।

শিক্ষা ও উপদেশ

- সূরা নাসর কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা। এর মধ্যে বিজয়ের সুসংবাদ ও নবীজির বিদায়ের ইঙ্গিত, দুটিই আছে।
- বিজয় বা সাফল্য আল্লাহর সাহায্যে আসে। এতে নিজের কৃতিত্বের অহংকার করা উচিত নয়।
- মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিনয়ের সঙ্গে প্রবেশ করেছিলেন, প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন। এটি বিজয়ীর আদর্শ আচরণ।
- যেকোনো সাফল্যের পর মুমিনের করণীয়: আল্লাহর প্রশংসা, পবিত্রতা ঘোষণা ও ইস্তিগফার।
- নবীগণ নিষ্পাপ। তাঁদের ইস্তিগফার আল্লাহর প্রতি দাসত্বের গভীর স্বীকৃতি।
- আল্লাহ বারবার তাওবা কবুলকারী। যত ভুলই হোক, তাঁর কাছে ফিরে আসার দরজা খোলা।
- দায়িত্ব পূর্ণ হলে বিদায়ের প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। আমাদের জীবনেও সময় ফুরিয়ে আসছে।

অধ্যায় ৩৪

সূরা লাহাব

المسد

আবু লাহাব ও তার স্ত্রীর পরিণতি

কুরআনের ১১১তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৫টি

সূরা লাহাব কুরআনের ১১১তম সূরা। এটি মক্কায় অবতীর্ণ, আয়াত সংখ্যা পাঁচ। এর আরেক নাম সূরা মাসাদ। এই সূরার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, কুরআনের কোথাও এভাবে কোনো কাফিরের নাম ধরে পুরো একটি সূরা নাযিল হয়নি। আল্লাহ ফিরআউনের নামে সূরা নাযিল করেননি, নমরূদের নামেও নয়। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা আবু লাহাবের নামে একটি পূর্ণ সূরা রয়েছে।

শানে নুযূল

নবুওয়াতের পর প্রায় তিন বছর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোপনে দাওয়াত দিয়েছিলেন। এরপর সূরা শুআরার ২১৪ নম্বর আয়াত নাযিল হয়, ‘আর আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করুন।’ এটি ছিল প্রকাশ্য দাওয়াতের নির্দেশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমে বংশের নেতাদের খাবারে দাওয়াত দিয়ে ইসলামের বার্তা পৌঁছালেন, কিন্তু তাদের কেউ তা গ্রহণ করেনি।

এরপর তিনি সাফা পাহাড়ে উঠে কুরাইশের প্রত্যেক গোত্রকে নাম ধরে ডাকলেন। সবাই একত্র হলে তিনি বললেন, আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের পেছনে একটি অশ্বারোহী দল তোমাদের ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত, তোমরা কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? সবাই বলল, অবশ্যই, আমরা আপনাকে কখনো মিথ্যা বলতে দেখিনি। তিনি বললেন, তাহলে আমি তোমাদের এক কঠিন শাস্তির আগে সতর্ককারী। তখন আবু লাহাব বলে উঠল, তোমার ধ্বংস হোক! তুমি কি এ জন্যই আমাদের একত্র করেছ? তখন আল্লাহ এই সূরা নাযিল করেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত)। আবু লাহাব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছিল, ‘তাব্বান লাকা’, তোমার ধ্বংস হোক। আল্লাহ জবাবে বললেন, ‘তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁ ওয়া তাব্ব’, ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত, আর সে নিজেও ধ্বংস হোক।

‘আবু লাহাব’ নামের রহস্য

আবু লাহাবের প্রকৃত নাম ছিল আবদুল উযযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব। ‘আবদুল উযযা’ অর্থ উযযা দেবীর বান্দা, এটি একটি শিরকী নাম। ‘আবু লাহাব’ তার উপনাম। ‘লাহাব’ অর্থ আগুনের শিখা। সে দেখতে অত্যন্ত সুন্দর, ফরসা ও রক্তিম আভাযুক্ত ছিল, ফলে সবাই তাকে আবু লাহাব, অর্থাৎ ‘আগুনের শিখাওয়ালা’ নামে ডাকত। আরবিতে ‘আবু’ শব্দ সবসময় পিতা অর্থে আসে না। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু একটি বিড়ালছানা লালন করতেন বলে তাঁর উপনাম হয়েছিল ‘আবু হুরায়রা’ (বিড়ালের পিতা)। আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু একবার মসজিদে ধুলোমাখা অবস্থায় শুয়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে ‘আবু তুরাব’ (মাটির পিতা) বলে ডেকেছিলেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। যে বস্তুর সঙ্গে কারও গভীর সম্পর্ক, সেই সম্পর্কে ‘আবু’ ব্যবহার করা হয়।

কুরআন কেন তার আসল নাম না নিয়ে উপনাম নিল? মুফাসসিরগণ কয়েকটি কারণ বলেছেন। প্রথম, তার আসল নাম আবদুল উযযা শিরকী নাম, কুরআনে তা উচ্চারণ করা সংগত নয়। দ্বিতীয়, ‘আবু লাহাব’ উপনামের সঙ্গে তার পরিণতির মিল আছে। তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, সে শিগগিরই ‘যাতা লাহাব’, অর্থাৎ শিখাযুক্ত আগুনে প্রবেশ করবে। যে নিজের রূপের জন্য আগুনের শিখার নাম পেয়েছিল, সে সত্যিই আগুনের শিখার অধিকারী হবে।

আবু লাহাবের স্ত্রীর নাম ছিল আরওয়া, কিন্তু সে ‘উম্মে জামিল’ নামে পরিচিত ছিল। সে ছিল আবু সুফিয়ানের বোন, উমাইয়া বংশের মেয়ে। আবু লাহাব ছিল কুরাইশের হাশিম গোত্রের, আর তার স্ত্রী উমাইয়া গোত্রের। অর্থাৎ দুজনই মক্কার দুই প্রভাবশালী বংশের সন্তান, দুজনের সম্পদও ছিল অনেক। এ কারণেই তাদের মধ্যে প্রভাব, অহংকার ও দাপট ছিল।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি তার শত্রুতা

আবু লাহাব ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চাচা, এমনকি প্রতিবেশীও। মক্কার সমাজে প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেওয়ার একটি সাধারণ শিষ্টাচার ছিল। কিন্তু আবু লাহাব ও তার স্ত্রী এই নিয়ম ভেঙে নবীজিকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। বর্ণিত আছে, তাঁর ঘরের সামনে ময়লা-আবর্জনা ফেলে রাখা হতো। হজের মৌসুমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন গোত্রের কাছে যেতেন, আবু লাহাব পেছনে পেছনে গিয়ে বলত, এর কথা শুনো না, সে মিথ্যাবাদী ও বিভ্রান্ত। এটি ছিল ইসলামের দাওয়াতের পথে বড় বাধা।

আরেকটি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দুই কন্যা রুকাইয়া ও উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুমার বিয়ে হয়েছিল আবু লাহাবের দুই ছেলে উতবা ও উতাইবার সঙ্গে। ইসলামের দাওয়াত শুরু হলে আবু লাহাব ও তার স্ত্রী চাপ প্রয়োগ করে

ছেলেদের দিয়ে নবীজির কন্যাদের তালাক দিতে বাধ্য করল। এরপর উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু একে একে তাঁদের বিয়ে করেন, যার জন্য তাঁর উপাধি 'যুন নূরাইন' (দুই নূরের অধিকারী)।
উতাইবা একবার নবীজির কাছে এসে তাঁকে অসম্মান করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ওপর বদদোয়া করলেন, হে আল্লাহ, তার ওপর আপনার কোনো হিংস্র প্রাণী লেলিয়ে দিন। ইবনে কাসীরের বর্ণনায় এসেছে, পরে এক বাণিজ্যিক সফরে সিরিয়ার পথে কাফেলা এক জায়গায় অবস্থান করল। আবু লাহাব বলে দিয়েছিল, আমার ছেলের যেন কিছু না হয়। কাফেলার লোকেরা তাকে ঘিরে পাহারা দিয়ে রাখল। কিন্তু রাতে একটি সিংহ এসে সবার মধ্য থেকে কেবল তাকেই তুলে নিয়ে গেল। আবু লাহাব এ খবর শুনে বলেছিল, মুহাম্মাদ কখনো মিথ্যা বলে না, তবুও সে ঈমান আনল না।

❖ সূরা লাহাব, আয়াত ১–২

تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾

[১] আবু লাহাবের হস্তদ্বয় ধ্বংস হোক এবং ধ্বংস হোক সে নিজে

مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُۥ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾

[২] কোন কাজে আসেনি তার ধন-সম্পদ ও যা সে উপার্জন করেছে।

আয়াত ১–২: 'ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দুই হাত'

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'তাব্বাত ইয়াদা আবী লাহাবিঁ ওয়া তাব্ব'। 'তাব্ব' অর্থ ধ্বংস হওয়া, ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া। প্রথমে 'তাব্বাত' (ধ্বংস হোক) বদদোয়ার ভঙ্গিতে, এরপর 'তাব্ব' (ধ্বংস হয়েই গেছে) খবর হিসেবে। অর্থাৎ ধ্বংসের ঘোষণা এসেছে, আর তা বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। 'দুই হাত' বলার কারণ, মানুষ যা করে, তা সাধারণত হাত দিয়েই করে। তার সব প্রচেষ্টা ধ্বংস হবে।

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'মা আগনা আনহু মালুহু ওয়া মা কাসাব', তার সম্পদ ও তার উপার্জন তার কাজে আসেনি। 'যা সে উপার্জন করেছে' বলতে সম্পদের সঙ্গে সন্তানকেও বোঝানো যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ যা খায়, তার মধ্যে সবচেয়ে পবিত্র হলো তার নিজের উপার্জন, আর তার সন্তানও তার উপার্জনের অংশ (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)। আবু লাহাবের মৃত্যুর ঘটনা বড় করুণ। সে বদরের যুদ্ধে অংশ নেয়নি, কিন্তু কুরাইশের পরাজয়ের খবরে হতাশায় ভেঙে পড়ে, আর কয়েক দিনের মধ্যেই এক ভয়ানক সংক্রামক ঘা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। রোগের কারণে সবাই তার কাছে যেতে ভয় পেত, তার লাশ কয়েক দিন পড়ে ছিল। শেষে ছেলেরা বা অন্যরা লাঠি দিয়ে ঠেলে তাকে

একটি গর্তে ফেলে পাথর দিয়ে ঢেকে দেয় (সীরাতে ইবনে হিশাম)। যার সম্পদ ও সন্তানের অভাব ছিল না, তার জীবনের শেষ এমন অসহায়।

❖ সূরা লাহাব, আয়াত ৩–৫

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾

[৩] সত্বরই সে প্রবেশ করবে লেলিহান অগ্নিতে

وَٱمْرَأَتُهُۥ حَمَّالَةَ ٱلْحَطَبِ ﴿٤﴾

[৪] এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে

فِى جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

[৫] তার গলদেশে খর্জুরের রশি নিয়ে।

আয়াত ৩–৫: শিখাযুক্ত আগুন ও লাকড়ি বহনকারিণী

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘সাইয়াসলা নারান যাতা লাহাব’, সে শিগগিরই শিখাযুক্ত আগুনে প্রবেশ করবে। চতুর্থ আয়াতে, ‘ওয়ামরাআতুহু হাম্মালাতাল হাতাব’, আর তার স্ত্রী, যে লাকড়ি বহন করে। পঞ্চম আয়াতে, ‘ফী জীদিহা হাবলুম মিম মাসাদ’, তার গলায় থাকবে খেজুরের আঁশের পাকানো রশি।

‘হাম্মালাতাল হাতাব’-এর দুটি ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধ। প্রথম, সে বাস্তবেই কাঁটাযুক্ত ডালপালা বয়ে এনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চলার পথে ছড়িয়ে রাখত (ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত)। দ্বিতীয়, ‘লাকড়ি বহন করা’ আরবিতে চোগলখোরি ও পরনিন্দার রূপক। যেমন কাঠ আগুন জ্বালায়, তেমনি চোগলখোরি মানুষের মধ্যে আগুন লাগায়। উম্মে জামিল কুরাইশদের মধ্যে নবীজির বিরুদ্ধে কুৎসা রটাত, কবিদের দিয়ে তাঁর নিন্দা করাত। বর্ণিত আছে, সূরা নাযিল হওয়ার পর সে একটি পাথর হাতে নিয়ে কাবার কাছে এল। সেখানে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। আল্লাহ তার চোখ থেকে নবীজিকে আড়াল করে দিলেন, সে কেবল আবু বকরকে দেখে বলল, তোমার সঙ্গী আমার নিন্দা করেছে। তারপর রাগে গজগজ করতে করতে ফিরে গেল (ইবনে ইসহাক)।

‘মাসাদ’ অর্থ খেজুর গাছের আঁশে পাকানো শক্ত রশি। এর দুটি ব্যাখ্যা আছে। এক, আখিরাতে জাহান্নামে তার গলায় আগুনের রশি থাকবে। দুই, দুনিয়ায় তার যে পরিণতি হবে, তার ইঙ্গিত। বর্ণনায় আছে, লাকড়ির বোঝা পড়ে গিয়ে তার গলায় ফাঁস লেগে সে মারা গিয়েছিল। আবার কেউ এর রূপক অর্থ নিয়ে বলেছেন, সে গলায় মূল্যবান হার পরত এবং বলত, এটি আমি

মুহাম্মাদের শত্রুতায় ব্যয় করব। তার সেই অহংকারের অলংকারই জাহান্নামে রশিতে পরিণত হবে। আল্লাহ ভালো জানেন।

এই সূরায় হিদায়াত কোথায়?

কেউ কেউ আপত্তি তুলে বলে, কুরআন তো হিদায়াতের গ্রন্থ, অথচ এই সূরায় কোনো বিধান, কোনো উপদেশ, কোনো শিষ্টাচার নেই, আছে শুধু একজন মানুষকে অভিশাপ ও তিরস্কার। এ কেমন হিদায়াত? নাস্তিক ও কুরআনে সন্দেহপোষণকারীরা প্রায়ই এ প্রশ্ন তোলে। অথচ এই সূরা হলো কুরআনের সত্যতার সবচেয়ে বড় প্রমাণগুলোর একটি।

কীভাবে? এই সূরা নাযিল হওয়ার পর আবু লাহাব প্রায় দশ বছর বেঁচে ছিল। এই দশ বছরে সে কুরআনকে মিথ্যা প্রমাণ করার একটি অতি সহজ সুযোগ পেয়েছিল। কুরআন ঘোষণা করেছে, আবু লাহাব ধ্বংস হবে, সে জাহান্নামে যাবে, ঈমান আনবে না। আবু লাহাব যদি কেবল মুখে বলত, আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি, তা মুনাফিকির ভঙ্গিতে হলেও, তাহলে কুরআনের ঘোষণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যেত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাবি ভুল সাব্যস্ত হতো, কুরআনকে বলা যেত আল্লাহর কিতাব নয়। কিন্তু সে তা করেনি, করতে পারেনি। জেদ, অহংকার ও আত্মমর্যাদাবোধ তাকে এই কথা বলতে দেয়নি। মক্কার মুশরিকদের কাছে এটি আতঙ্কের বিষয় ছিল। যদি সে এ কথা একবার বলে ফেলে, তাহলে কুরআন মিথ্যা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু সে বলেনি।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে। আল্লাহ তো আগেই জানতেন যে সে ঈমান আনবে না, তাহলে কি তাকদীরের কারণে সে ঈমান আনতে পারেনি? আল্লাহ কি তার ওপর জুলুম করলেন? না। এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। এর উত্তর আমরা সূরা লাইলে দেখেছি। আবু লাহাবের জন্য ঈমান আনার সুযোগ উন্মুক্ত ছিল। এমন ছিল না যে নবীজিকে গালি দেওয়ার সময় তার মুখ খুলত, আর ইসলামের কথা বলার সময় মুখ বোবা হয়ে যেত। আমরা অনেক সময় বলি, নামায পড়া তাকদীরে থাকলে পড়তাম। যে সময় আড্ডায় যেতে পায়ে শক্তি পাই, মসজিদের দিকে পা চলে না, এমন তো নয়। আল্লাহ মানুষকে ভালো-মন্দ দুই কাজের শক্তি দিয়েছেন। একজন শিক্ষক জানেন কোন ছাত্র পাস করবে, কোন ছাত্র ফেল করবে। ছাত্র ফেল করে যদি বলে, আপনি জানতেন বলেই আমি ফেল করেছি, তা যেমন অযৌক্তিক, এটিও তেমন। আল্লাহর অগ্রিম জ্ঞান আমাদের কাজ বাধ্য করে না।

আবু লাহাবের মতো মানুষদের জন্য এই সূরা একটি সতর্কবার্তা, আর মুমিনদের জন্য সান্ত্বনা। যে ব্যক্তি সম্পদ, বংশ, প্রভাব ও সৌন্দর্যের অহংকারে সত্য প্রত্যাখ্যান করে, তার শেষ পরিণতি এই। আবু লাহাব, তার সম্পদ, তার সন্তান, কেউ তাকে বাঁচাতে পারেনি।

শিক্ষা ও উপদেশ

- সূরা লাহাব কুরআনের সত্যতার প্রমাণ। আবু লাহাব দশ বছর বেঁচে থেকেও মুখে ঈমানের কথা বলতে পারেনি, ফলে কুরআনের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে।
- সম্পদ, বংশ, সৌন্দর্য ও প্রভাব মানুষকে আখিরাতে বাঁচাতে পারে না। অহংকারই ঈমানের পথে সবচেয়ে বড় বাধা।
- নিকটাত্মীয়ও দ্বীনের শত্রু হতে পারে। আল্লাহর রাসূলের নিকটাত্মীয় হওয়াও কাউকে রক্ষা করে না।
- প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া, চোগলখোরি ও কুৎসা রটানো ভয়াবহ অপরাধ।
- তাকদীরের দোহাই দিয়ে নিজের ভুল বা গাফলতিকে ঢাকা যায় না। আল্লাহ মানুষকে ভালো-মন্দ দুই পথেরই সুযোগ দিয়েছেন।
- ইসলামের বিরোধিতাকারীদের নাম-নিশানা ইতিহাসে ধিক্কারের সঙ্গে স্মরণীয়। অথচ ইসলাম বিজয়ী।
- আমরা যেন কুরআনের হিদায়াত গ্রহণ করে ইসলামের পক্ষের লোকদের অন্তর্ভুক্ত হই, আল্লাহ সেই তাওফীক দিন।

অধ্যায় ৩৫

সূরা ইখলাস

الإخلاص

আল্লাহর পরিচয়: কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান

কুরআনের ১১২তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৪টি

সূরা ইখলাস কুরআনের ১১২তম সূরা। আয়াত মাত্র চারটি। এটি মক্কায় অবতীর্ণ বলে অধিকাংশ মুফাসসির মত দিয়েছেন। মুসলমান তো বটেই, অনেক অমুসলিমও এই সূরা মুখস্থ জানে, এমনই এর প্রসিদ্ধি। কুরআনের প্রায় সব সূরার নামের অংশ কোনো না কোনো আয়াতে পাওয়া যায়, কিন্তু সূরা ইখলাসে 'ইখলাস' শব্দটি নেই। তবু এর নাম ইখলাস, কারণ এই সূরা পূর্ণ তাওহীদ বা আল্লাহর একনিষ্ঠতার ঘোষণা।

সূরা ইখলাসের ফযীলত

এর ফযীলত অসংখ্য। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি আরেকজনকে বারবার 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনল। সকালে সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টি জানাল, যেন সে এটিকে সামান্য মনে করছে। তিনি বললেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, এটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান (সহীহ বুখারী)। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের বললেন, তোমরা কি এক রাতে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়তে পারো না? সাহাবীরা বললেন, তা কীভাবে সম্ভব? তিনি বললেন, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান (সহীহ মুসলিম)।

আলেমগণ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, কুরআনের বিষয়বস্তু মূলত তিন ভাগে বিভক্ত: বিধিবিধান, অতীতের ঘটনা ও উপদেশ, আর আল্লাহর পরিচয় ও তাওহীদ। সূরা ইখলাসে তৃতীয় ভাগের নির্যাস আছে। এ কারণে এর সওয়াব এক-তৃতীয়াংশের সমান। তবে এর অর্থ এই নয় যে সূরা ইখলাস তিনবার পড়লে পুরো কুরআন খতমের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। এটি সওয়াবের ঘোষণা, কুরআন তিলাওয়াতের বিকল্প নয়।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফজরের সুন্নাতের দ্বিতীয় রাকাতে, মাগরিবের সুন্নাতে, তাওয়াফের পর দুই রাকাতে এবং বিতরের তৃতীয় রাকাতে এই সূরা পড়তেন, যা আমরা সূরা কাফিরূনের আলোচনায় দেখেছি। ঘুমানোর সময় তিনি দুই হাতের তালু জড়ো করে সূরা

ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দিতেন, তারপর মাথা, মুখ ও শরীরের যতটুকু নাগাল পেতেন, ততটুকুতে হাত বুলাতেন। এভাবে তিনবার করতেন (সহীহ বুখারী)। সকাল-সন্ধ্যায় তিনবার করে এই তিন সূরা পড়ার নির্দেশও হাদীসে আছে (সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী)।

শানে নুযূল

আরবরা বংশধারা ও পরিচয় নিয়ে অত্যন্ত কৌতূহলী ছিল। কারও সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রথমেই জিজ্ঞেস করত, সে কোন বংশের, তার বাবা কে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর কথা বলছিলেন। তাই কিছু লোক এসে প্রশ্ন করল, আপনি যে রবের কথা বলছেন, তাঁর বংশপরিচয় বলুন। উবাই ইবনে কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, মুশরিকরা বলল, আপনার রবের বংশ বর্ণনা করুন, তখন এই সূরা নাযিল হয় (মুসনাদে আহমাদ, জামে তিরমিযী)। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, প্রশ্নকারী ছিল ইয়াহূদীরা। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিল, আপনার রব কিসের তৈরি, সোনার না রুপার? আমরা জানি, মানুষ মাটির তৈরি, জিন আগুনের তৈরি, ফেরেশতা নূরের তৈরি। তাদের চিন্তা ছিল সৃষ্ট বস্তুর মাপকাঠিতে স্রষ্টাকে বোঝা।

আল্লাহ তাআলা মাত্র কয়েকটি শব্দে তাদের জবাব দিলেন। এত সংক্ষিপ্ত আর সুস্পষ্ট জবাব, যাতে অস্পষ্টতার কোনো সুযোগ নেই। আল্লাহর পরিচয় যদি আমাদের নিজেদের লিখে দিতে বলা হতো, আমরা হয়তো বিশাল প্রবন্ধ লিখতাম, তবু তা পূর্ণ হতো না। আল্লাহ নিজেই চার আয়াতে নিজের নিখুঁত পরিচয় দিয়ে দিয়েছেন।

❖ সূরা ইখলাস, আয়াত ১

قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدٌ ﴿١﴾

[১] বলুন, তিনি আল্লাহ, এক

আয়াত ১: 'বলুন, তিনি আল্লাহ, এক'

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ'। 'কুল' (বলুন) শব্দটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ করে, কিন্তু আমাদেরও এ ঘোষণা দেওয়ার দায়িত্ব। তাওহীদের প্রশ্ন এলে আমরা পরিষ্কার বলব, তিনি আল্লাহ, এক।

আরবিতে 'এক' বোঝাতে দুটি শব্দ আছে: 'ওয়াহিদ' ও 'আহাদ'। 'ওয়াহিদ' শব্দ গণনার প্রথম সংখ্যা বোঝায়, যার পরে দ্বিতীয়, তৃতীয় আছে। 'আহাদ' বোঝায় এমন একত্ব, যার কোনো অংশ, প্রতিরূপ বা তুলনা নেই, যাকে ভাগ করা যায় না। 'ওয়াহিদ'-এর স্ত্রীবাচক রূপ 'ওয়াহিদাহ' আছে, কিন্তু 'আহাদ'-এর কোনো স্ত্রীবাচক রূপ নেই। এই ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও আল্লাহর

অনন্যতার ইঙ্গিত আছে। এখানে আল্লাহ 'হুওয়া' (তিনি) শব্দ যোগ করে কথাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করেছেন।

আলেমগণ 'আল্লাহ' শব্দের একটি ভাষাগত সৌন্দর্যের কথা বলেছেন। 'আল্লাহ' শব্দ থেকে প্রথম অক্ষর আলিফ বাদ দিলে থাকে 'লিল্লাহ' (আল্লাহর জন্য)। আরেকটি লাম বাদ দিলে থাকে 'লাহু' (তাঁর জন্য)। আরও বাদ দিলে থাকে 'হু' (তিনি)। প্রতিটি রূপেই আল্লাহর দিকে ইঙ্গিত থেকে যায়।

❖ সূরা ইখলাস, আয়াত ২

ٱللَّهُ ٱلصَّمَدُ ﴿٢﴾

[২] আল্লাহ অমুখাপেক্ষী

আয়াত ২: 'আল্লাহ সামাদ'

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'আল্লাহুস সামাদ'। 'সামাদ' শব্দের একাধিক অর্থ আছে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অর্থ, তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, আর সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। শুধু 'অমুখাপেক্ষী' বললে অর্থ পূর্ণ হয় না, তাই বলতে হয়, আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, আর পুরো সৃষ্টি প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মুখাপেক্ষী। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, সামাদ সেই সত্তা, যাঁর মর্যাদা ও নেতৃত্ব পরিপূর্ণ, যাঁর কাছে সবাই নিজেদের প্রয়োজন পূরণের জন্য ছুটে যায়। আরেকটি ব্যাখ্যা, তিনি এমন সত্তা, যাঁর কোনো অন্তঃসারশূন্যতা নেই, তিনি খান না, পান করেন না।

পৃথিবীর প্রত্যেক ক্ষমতাধর মানুষ কোনো না কোনোভাবে অন্যের মুখাপেক্ষী। রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য দরকার সেনাবাহিনী, নিরাপত্তারক্ষী, চিকিৎসক। কেউ খাবার, ঘুম, বিশ্রাম ছাড়া থাকতে পারে না। কিন্তু আল্লাহ তাআলা কারও প্রতি মুখাপেক্ষী নন। সব ধর্মে মানুষ যাদের উপাস্য মনে করে, তারা সীমিত, তাদের প্রয়োজন আছে, এমনকি অনেকে মানুষের হাতে গড়া। এই গুণ, পূর্ণ অমুখাপেক্ষিতা, একমাত্র আল্লাহর।

❖ সূরা ইখলাস, আয়াত ৩

لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾

[৩] তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি

আয়াত ৩: 'তিনি জন্ম দেননি এবং জন্মগ্রহণও করেননি'

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, 'লাম ইয়ালিদ ওয়া লাম ইউলাদ'। এ আয়াতের মাধ্যমে প্রথমে সব ধরনের বংশ ও জন্ম-সম্পর্কের ধারণা খণ্ডন করা হয়েছে। যে জন্ম নেয়, সে একদিন মৃত্যুবরণ করে, আর যার জন্ম আছে, তার একটি সূচনা আছে। আল্লাহ অনাদি, অনন্ত, তাঁর কোনো সূচনা ও সমাপ্তি নেই। তাঁর ক্ষমতা কারও কাছ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া নয়। যারা তাঁর বংশ-পরিচয় জানতে চেয়েছিল, তাদের এ কথাই জানানো হলো।

'লাম ইয়ালিদ' (তিনি জন্ম দেননি) এ কথায় আরও একটি বিষয় স্পষ্ট হয়। আল্লাহর সন্তান আছে, এই বিশ্বাস ইসলামে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যাত। কুরআনে এই বিশ্বাসের কয়েকটি রূপের কথা বলা হয়েছে। খ্রিস্টানদের একাংশ ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহর পুত্র বলে। ইয়াহূদীদের একটি দল উযাইরকে আল্লাহর পুত্র বলত (সূরা তাওবা ৯:৩০)। আর মক্কার মুশরিকরা ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা বলত (সূরা নাহল ১৬:৫৭, সূরা যুখরুফ ৪৩:১৯)। কুরআন এ সব ধারণা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করেছে।

ইসলামের দৃষ্টিতে ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর একজন সম্মানিত বান্দা ও রাসূল। কুরআন তাঁকে 'মাসীহ ঈসা ইবনে মারইয়াম' বলেছে এবং স্পষ্ট করে দিয়েছে, তিনি আল্লাহর বান্দা (সূরা নিসা ৪:১৭১, সূরা মায়িদা ৫:৭৫)। সূরা মারইয়ামে আল্লাহ বলেছেন, তারা বলে, দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তোমরা এক ভয়ানক কথা বলেছ। এ কথায় আসমান ফেটে পড়ার, জমিন বিদীর্ণ হওয়ার, পাহাড় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ধসে পড়ার উপক্রম হয় (১৯:৮৮—৯১)। আল্লাহর সন্তান থাকা তাঁর পরিপূর্ণ অমুখাপেক্ষিতার পরিপন্থী, কারণ সন্তান সাধারণত প্রয়োজন থেকে আসে, আর আল্লাহ অমুখাপেক্ষী।

আমরা অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি কোনো ঘৃণা পোষণ করি না। আমরা তাদের সঙ্গে ন্যায় ও সদাচরণ করার জন্য আদিষ্ট। কিন্তু আল্লাহর পরিচয়ের বিষয়ে আমরা কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা মেনে চলি। আর তাওহীদের এই বিশুদ্ধ রূপই মানুষের বুদ্ধি ও স্বভাবের সবচেয়ে কাছের। আল্লাহকে মানুষের আকৃতি, মানুষের সীমাবদ্ধতা বা মানুষের সঙ্গে জন্ম-সম্পর্কের ধারণা থেকে পবিত্র মনে করা ইসলামের মূল।

❖ সূরা ইখলাস, আয়াত ৪

وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ كُفُوًا أَحَدٌۢ ﴿٤﴾

[৪] এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।

আয়াত ৪: 'এবং তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই'

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, 'ওয়া লাম ইয়াকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ'। 'কুফু' অর্থ সমকক্ষ, সমতুল্য। 'আহাদ' শব্দ এখানেও এসেছে, ফলে অর্থ দাঁড়ায়, কোনো কিছুই তাঁর সমকক্ষ নয়, সমান নয়। অনুবাদে আমি 'কোনো ব্যক্তি' না বলে 'কোনো কিছু' বলছি। কারণ 'ব্যক্তি' বললে শুধু মানুষ বা প্রাণীর কথা মনে আসে, আর 'কিছু' বললে সব সৃষ্টি, বস্তু ও ধারণা অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্লাহর সঙ্গে কোনো সৃষ্টির তুলনা চলে না। আল্লাহ সূরা শূরায় বলেছেন, তাঁর মতো কিছুই নেই, আর তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা (৪২:১১)।

এই চার আয়াতে আল্লাহর পরিচয়ের তিনটি দিক এসে গেছে। তাঁর একত্ব, তাঁর অমুখাপেক্ষিতা ও পূর্ণতা, এবং তিনি সব ধরনের জন্ম, সন্তান ও সমকক্ষতা থেকে পবিত্র। এ কারণে এই সূরাকে বলা হয় আল্লাহর গুণাবলির সূরা।

আল্লাহর গুণ ভালোবাসার ফল

সূরা ইখলাসের প্রতি ভালোবাসা সম্পর্কে দুটি বিখ্যাত ঘটনা আছে। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন সাহাবীকে একটি ছোট সৈন্যদলের আমির করে পাঠালেন। তিনি নামাযে ইমামতির সময় প্রতিটি রাকাতে সূরার শেষে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়ে নামায শেষ করতেন। ফিরে এসে সঙ্গীরা বিষয়টি নবীজিকে জানালেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করতে বললেন, কেন এমন করেন? তিনি বললেন, কারণ এতে আল্লাহর গুণাবলি আছে, আর আমি এই সূরা পড়তে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তাঁকে জানিয়ে দাও, আল্লাহ তাঁকে ভালোবাসেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। কুবার মসজিদে এক আনসারী সাহাবী ইমামতি করতেন। তিনি প্রতিটি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর আগে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তেন, তারপর অন্য সূরা। মুসল্লিরা আপত্তি করলে তিনি বললেন, আমি এভাবেই করব, চাইলে তোমরা আমার পেছনে নামায পড়ো, না চাইলে অন্য ইমাম খুঁজে নাও। বিষয়টি নবীজির কাছে গেলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন এমন করো? তিনি বললেন, এই সূরার প্রতি আমার ভালোবাসা আছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এই সূরার প্রতি তোমার ভালোবাসাই তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে (জামে তিরমিযী; সহীহ বুখারী ও তা'লীকরূপে বর্ণনা করেছেন)।

এ দুই ঘটনা থেকে আমরা দুটি বিষয় শিখি। প্রথম, একই রাকাতে একাধিক সূরা পড়া জায়েয। তবে সূরার ক্রম রক্ষা করা ভালো, আর ফরয নামাযে অনেক সময় একটি পূর্ণ সূরা পড়াই সুন্দর। দ্বিতীয়, সূরা ইখলাসের প্রতি ভালোবাসা, অর্থাৎ আল্লাহর তাওহীদ ও গুণাবলির প্রতি ভালোবাসা, আল্লাহর ভালোবাসা ও জান্নাতের কারণ হতে পারে।

আল্লাহর গুণাবলি জানা এবং তাঁর প্রতি ভালোবাসা তৈরি করা ঈমানের অন্যতম প্রেরণা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম আছে। যে এগুলো আয়ত্ত করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আসুন, আমরা সূরা ইখলাসকে প্রতিদিনের আমলের অংশ করে নিই, বুঝে ও ভালোবেসে পাঠ করি।

শিক্ষা ও উপদেশ

- সূরা ইখলাস আল্লাহর পরিচয়ের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ ঘোষণা। এর সওয়াব কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান।
- 'আহাদ' শব্দ আল্লাহর অনন্য ও অবিভাজ্য একত্ব বোঝায়। তাঁর কোনো অংশ, প্রতিরূপ বা তুলনা নেই।
- 'সামাদ' অর্থ আল্লাহ কারও মুখাপেক্ষী নন, আর সবাই প্রতিটি মুহূর্তে তাঁর মুখাপেক্ষী।
- আল্লাহর কোনো সন্তান নেই, তিনি কারও সন্তান নন। এই বিশ্বাস তাওহীদের মূল।
- আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনা বা সমকক্ষতা নেই।
- আল্লাহর গুণাবলির প্রতি ভালোবাসা তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার ও জান্নাতে যাওয়ার কারণ।
- সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস সকাল-সন্ধ্যায় এবং ঘুমানোর আগে পড়া সুন্নাত।
- অন্য ধর্মের মানুষদের সঙ্গে ন্যায় ও সদাচরণ বজায় রেখে নিজেদের বিশ্বাসে অবিচল থাকাই ইসলামের শিক্ষা।

অধ্যায় ৩৬

সূরা ফালাক

الفلق

জাদু, বদনজর ও হিংসা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা

কুরআনের ১১৩তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৫টি

সূরা ফালাক কুরআনের ১১৩তম সূরা। আয়াত সংখ্যা পাঁচ। এটি এবং এর পরের সূরা নাস মিলে 'মুআওয়্যিযাতান' (আশ্রয় প্রার্থনার দুই সূরা) নামে পরিচিত। সূরা ফালাক যেমন সূরা, তেমনি একটি পূর্ণাঙ্গ দোয়া। উকবা ইবনে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন, তুমি কি দেখোনি, আজ রাতে এমন কিছু আয়াত নাযিল হয়েছে, যার মতো আর কিছু দেখা যায়নি? সেগুলো 'কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক' ও 'কুল আউযু বিরব্বিন নাস' (সহীহ মুসলিম)। আশ্রয় প্রার্থনাকারীরা এই দুটি সূরার মতো আর কোনো কিছু দিয়ে আশ্রয় চায়নি (সুনানে আবু দাউদ, সুনানে নাসায়ী)।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকাল-সন্ধ্যায় এবং ঘুমানোর আগে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে নিজের গায়ে ফুঁ দিতেন। ফরয নামাযের পরও তিনি ফালাক ও নাস পড়তেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেছেন, তিনি অসুস্থ হলে নিজের গায়ে এই দুই সূরা পড়ে ফুঁ দিতেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। অর্থাৎ এই সূরাকে আমরা যতটা তিলাওয়াত হিসেবে পড়ি, তার চেয়ে বেশি দোয়া ও রক্ষাকবচ হিসেবে পড়ার নির্দেশনা আছে।

মাক্কী না মাদানী

এই সূরা মাক্কী না মাদানী, সে নিয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। এর কারণ, সূরাটির শানে নুযূল মদীনায় ঘটা একটি ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত। এ কারণে অনেকে একে মাদানী বলেছেন। আবার অনেকে বলেছেন, সূরাটি মক্কায় নাযিল হয়েছে, মদীনার ঘটনার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এটি আবার স্মরণ করানো হয়েছে। কুরআনের অনেক সূরা বা আয়াত একাধিকবার স্মরণ করানো হয়েছে।

শানে নুযূল: জাদুর ঘটনা

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, মদীনায় বনু যুরাইক গোত্রের লাবীদ ইবনে আসাম নামে এক ইয়াহূদী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জাদু করেছিল। জাদুর উপকরণ ছিল নবীজির মাথার চিরুনিতে লেগে থাকা কয়েকটি চুল।

তা একটি খেজুর গাছের খোসার ভেতরে রেখে তাতে গিঁট দেওয়া হয়েছিল। বর্ণনায় এগারোটি গিঁটের কথা এসেছে। এটি 'যারওয়ান' নামের একটি কূপের তলায় পাথরচাপা দিয়ে রাখা হয়েছিল।

এই জাদুর প্রভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে মাঝে মাঝে এমন অনুভূতি হতো, তিনি যেন একটি কাজ করেছেন, অথচ তা করেননি। এটি ছিল সম্পূর্ণ শারীরিক ও দুনিয়াবী বিষয়ে প্রভাব। একদিন তিনি আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললেন, আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, আমার রোগের চিকিৎসা কী। দুজন ব্যক্তি আমার কাছে এলেন। একজন আমার মাথার কাছে বসলেন, আরেকজন পায়ের কাছে। একজন অপরজনকে জিজ্ঞেস করলেন, এঁর কী হয়েছে? অপরজন বললেন, ইনি জাদুগ্রস্ত। কে জাদু করেছে? লাবীদ ইবনে আসাম। কীসের মধ্যে? চিরুনি ও চুলের মধ্যে, খেজুরের খোসায়। কোথায় আছে? যারওয়ান কূপে। নবীর স্বপ্ন ওহী, তাই এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ ছিল।

বুখারীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি কিছু সাহাবীকে নিয়ে সেই কূপে গিয়ে সবকিছু দেখলেন। আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এটি বের করে ফেলে দেননি? তিনি বললেন, আল্লাহ আমাকে সুস্থ করেছেন, আর আমি মানুষের মধ্যে এ নিয়ে অনর্থ ছড়াতে অপছন্দ করেছি। অন্য বর্ণনায় এসেছে, আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কূপ থেকে সেটি বের করে আনলেন, আর সূরা ফালাক ও নাসের এগারোটি আয়াতের প্রতিটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি করে গিঁট খুলে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমনভাবে সুস্থ হলেন যেন কেউ তাঁর বাঁধন খুলে দিয়েছে। দুই সূরায় মোট এগারোটি আয়াত, ফালাকের পাঁচ ও নাসের ছয়, ঠিক এগারোটি গিঁটের সঙ্গে সংখ্যায় মিলে যায়।

এ নিয়ে একটি প্রশ্ন ওঠে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাদুগ্রস্ত হয়েছিলেন, তাহলে তাঁর আনীত ওহীর নির্ভরযোগ্যতা কি প্রশ্নবিদ্ধ? আলেমগণ স্পষ্ট বলেছেন, না। জাদুর প্রভাব ছিল তাঁর দৈহিক বা দুনিয়াবী কিছু বিষয়ে। ওহী ও দ্বীনের বিষয়ে আল্লাহ তাঁকে পূর্ণ হেফাজত করেছেন। কুরআন ও রিসালাতের কোনো অংশে ভুল বা বিকৃতি ঘটেনি। তা ছাড়া নবীগণও মানুষ, তাঁদেরও অসুস্থতা বা কষ্ট আসে। মুশরিকরা যে তাঁকে 'জাদুগ্রস্ত' বলে অপবাদ দিত (সূরা বনী ইসরাঈল ১৭:৪৭), তা ছিল তাঁর দাওয়াতকে অবিশ্বাস্য প্রমাণের চেষ্টা, বাস্তব অর্থে কোনো প্রমাণ নয়।

❖ সূরা ফালাক, আয়াত ১

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلْفَلَقِ ﴿١﴾

[১] বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি প্রভাতের পালনকর্তার

আয়াত ১: ‘বলুন, আমি ফালাকের রবের আশ্রয় প্রার্থনা করছি’

প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলছেন, ‘কুল আউযু বিরব্বিল ফালাক’। ‘ফালাক’ শব্দের মূল অর্থ বিদীর্ণ করা, ফেটে বের হওয়া। এর সবচেয়ে প্রসিদ্ধ অর্থ ভোর বা প্রভাত, যখন রাতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে আলো বেরিয়ে আসে। আবার বীজ ফেটে চারা বের হয়, ডিম ভেঙে ছানা বের হয়, মাটি ফুঁড়ে ঝরনা বের হয়, এ সবই ফালাক। অর্থ হলো, আমি সেই রবের আশ্রয় চাই, যিনি অন্ধকার থেকে আলো, অচলতা থেকে জীবন এবং অসম্ভব থেকে সম্ভব বের করে আনেন। যিনি অন্ধকার রাতকে ভোরে রূপান্তর করেন, তিনি সংকট ও অনিষ্টকে নিরাপত্তায় বদলাতে সক্ষম।

আশ্রয় প্রার্থনার প্রথম শর্ত হলো, কার কাছে আশ্রয় চাইব, তা নির্ধারণ করা। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা সবকিছুর রবের কাছে আশ্রয় চাও।

❖ সূরা ফালাক, আয়াত ২

مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾

[২] তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তার অনিষ্ট থেকে

আয়াত ২: ‘তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে’

দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘মিন শাররি মা খালাক’। এটি একটি ব্যাপক ঘোষণা। আল্লাহর সৃষ্টির যেকোনো ক্ষতিকর দিক থেকে আশ্রয় চাওয়া।

এখানে একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে। আল্লাহ কোনো কিছুকে নির্ভেজাল মন্দ হিসেবে সৃষ্টি করেননি। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে কল্যাণ আছে। তবে কোনো কিছুর প্রভাব, ব্যবহার বা অবস্থার কারণে তা থেকে ক্ষতি হতে পারে। যেমন সাপ আমাদের কামড়াতে পারে, কিন্তু বিষ থেকে বহু ওষুধ তৈরি হয়। অনেক পোকামাকড় আমাদের ক্ষতি করে, আবার অনেকে অন্য ক্ষতিকর পোকা খেয়ে আমাদের উপকার করে। আগুন পোড়ায়, কিন্তু আগুন ছাড়া রান্না হয় না। ‘সৃষ্টি’র ক্ষতি আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়, এটি পরীক্ষা ও জগতের নিয়মের অংশ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের দোয়ায় বলতেন, সমস্ত কল্যাণ আপনার হাতে, আর মন্দকে আপনার দিকে সম্বন্ধ করা যায় না (সহীহ মুসলিম)।

এরপর আল্লাহ তিনটি বিশেষ অনিষ্টের কথা আলাদা করে বলেছেন। ‘সব সৃষ্টির অনিষ্ট’ বলার পর এই তিনটি আলাদা করে বলার কারণ হলো, এগুলো বেশি ভয়ংকর, আর মানুষের অজান্তে বেশি ক্ষতি ঘটায়।

❖ সূরা ফালাক, আয়াত ৩

وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾

[৩] অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে, যখন তা সমাগত হয়

আয়াত ৩: ‘অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে, যখন তা ছেয়ে যায়’

তৃতীয় আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়া মিন শাররি গাসিকিন ইযা ওয়াকাব’। ‘গাসিক’ অর্থ অন্ধকার, ‘ওয়াকাব’ অর্থ ছেয়ে যাওয়া। রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এলে কী কী অনিষ্ট হতে পারে? অধিকাংশ অপরাধ অন্ধকারে ঘটে। অপরাধীরা অন্ধকারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, চুরি, ডাকাতি ও হিংস্রতার ঝুঁকি বাড়ে। রাতে পোকামাকড় ও হিংস্র প্রাণীর আনাগোনা বাড়ে। মানুষের মনে ভয় ও কুচিন্তা বেশি আসে। কারও রাতের নির্জনতায় অশ্লীল কিছু দেখার ইচ্ছা জাগে, তার জন্য সূরা ফালাক পড়া উত্তম প্রতিরোধ। জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সন্ধ্যা নামলে তোমরা সন্তানদের ঘরে আটকে রাখো, কারণ তখন শয়তানেরা ছড়িয়ে পড়ে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা বর্ণনা করেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম চাঁদের দিকে ইশারা করে বললেন, এই ‘গাসিক’ (অন্ধকার) থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করো, যখন তা ছেয়ে যায় (জামে তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)। এখানে চাঁদের গ্রহণ বা অন্ধকারে ঢেকে যাওয়াও উদ্দেশ্য হতে পারে।

❖ সূরা ফালাক, আয়াত ৪

وَمِن شَرِّ ٱلنَّفَّٰثَٰتِ فِي ٱلْعُقَدِ ﴿٤﴾

[৪] গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে

আয়াত ৪: ‘গিঁটে ফুঁকদানকারীদের অনিষ্ট থেকে’

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়া মিন শাররিন নাফফাসাতি ফিল উকাদ’। ‘নাফফাসাত’ অর্থ যারা ফুঁক দেয়, আর ‘উকাদ’ অর্থ গিঁট। অর্থাৎ গিঁট দিয়ে মন্ত্র পড়ে ফুঁ দিয়ে যারা জাদু করে। আরবিতে ‘নাফফাসাত’ স্ত্রীবাচক বহুবচন। মুফাসসিরগণ বলেছেন, এ দ্বারা জাদুকর নারীরা উদ্দেশ্য, আর বর্ণনায় আছে, লাবীদের কন্যারাই চুল ও চিরুনি সংগ্রহ করে এই গিঁটগুলো দিয়েছিল।

জাদুর বাস্তবতা কী? সূরা বাকারায় আল্লাহ বলেছেন, শয়তানেরা মানুষকে জাদু শেখায়। আর বাবিল শহরে দুই ফেরেশতা হারূত ও মারূতের কাছে যা নাযিল হয়েছিল, তারা কাউকে তা শেখানোর আগে সতর্ক করত, আমরা তো কেবল পরীক্ষা, সুতরাং তোমরা কুফরি কোরো না। তবু মানুষ তাদের কাছ থেকে এমন কিছু শিখত, যা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটায়। আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তারা কারও কোনো ক্ষতি করতে পারে না (২:১০২)। অর্থাৎ জাদু আল্লাহর সৃষ্ট পরীক্ষা। এটি কাজ করে শয়তানের সাহায্যে, আর শয়তান সাধারণত মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দিয়ে সম্পর্ক নষ্ট করে। যেমন স্বামীর মনে ঢেলে দেয়, তোমার স্ত্রী তোমার ক্ষতি করছে। এভাবে ফাটল ধরে। জাদুকর শয়তানের কাছে নিজের আনুগত্য ও সেবা সমর্পণ করে, মন্ত্র ও তন্ত্রের

মাধ্যমে তাকে ডাকে, তাই জাদু করা কুফরি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপের মধ্যে আল্লাহর সঙ্গে শিরক ও জাদুকে গণ্য করেছেন (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। কেউ জাদু করালে সে-ও স্পষ্ট হারামে লিপ্ত, কারণ সে আল্লাহর ওপর ভরসা না করে শয়তানের সাহায্য চেয়েছে। এ বিষয়ে আমরা সূরা তাকভীরে জ্যোতিষী ও গণকের কাছে যাওয়া সম্পর্কে হাদীস দেখেছি।

সূরা ফালাকে আমরা এ-ও জানতে পারি, জাদুর শিকার হওয়া কোনো অস্বাভাবিক বিষয় নয়। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শিকার হয়েছিলেন। আর এর চিকিৎসাও তিনি আমাদের জন্য রেখে গেছেন: কুরআনের আয়াত ও দোয়ার মাধ্যমে ঝাড়ফুঁক। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় সূরা ফালাক ও নাস, আয়াতুল কুরসী ও সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়া সবচেয়ে বড় সুরক্ষা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে রাতে সূরা বাকারার শেষ দুই আয়াত পড়বে, এই দুটি তার জন্য যথেষ্ট (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে শয়তান নিজেই বলেছিল, যে ঘুমানোর সময় আয়াতুল কুরসী পড়ে, সকাল পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক তার সঙ্গে থাকে, আর শয়তান তার কাছে আসতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা শুনে বললেন, সে মিথ্যাবাদী হলেও এ কথা সত্য বলেছে (সহীহ বুখারী)।

এখানে সতর্কতারও প্রয়োজন আছে। সব সমস্যাকে জাদু বা বদনজর বলে দেওয়া ঠিক নয়। অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত। ঝাড়ফুঁকের নামে প্রতারক কবিরাজদের খপ্পরে পড়া উচিত নয়। কুরআনের আয়াত বা নবীজির শেখানো দোয়া দিয়ে ঝাড়ফুঁক বৈধ ও উপকারী। কিন্তু অস্পষ্ট মন্ত্র, শিরকী শব্দ বা কবরের সাহায্য চাওয়া হারাম।

❖ সূরা ফালাক, আয়াত ৫

وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

[৫] এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

আয়াত ৫: ‘হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে’

শেষ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘ওয়া মিন শাররি হাসিদিন ইযা হাসাদ’। এই সূরার শেষ বিষয়টি হিংসা। কেন অসংখ্য মন্দ স্বভাবের মধ্যে হিংসার কথা আলাদা বলা হলো? কারণ হিংসাই পৃথিবীর ইতিহাসের প্রথম হত্যাকাণ্ডের কারণ। আদম আলাইহিস সালামের দুই ছেলে হাবীল ও কাবীলের একজন আল্লাহর কাছে কবুল হলো, অন্যজন হলো না। তখন কাবীল হিংসায় বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব (সূরা মায়িদা ৫:২৭–৩০)। আর তারও আগে ইবলীসের আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা না করার একটি কারণ ছিল হিংসা, সঙ্গে অহংকার।

কারও উন্নতি দেখে মনে কষ্ট বা অস্বস্তি লাগা মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা। কিন্তু এই অনুভূতি অনুসরণ করে কাজ করা অন্যায়। আপনি কারও উন্নতি দেখে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছেন, কিন্তু তার ক্ষতি করার কোনো চেষ্টা করছেন না, নিজের মনকে সংযত করছেন, এই অবস্থায় ইনশাআল্লাহ গুনাহ হবে না। কিন্তু যখন তার উন্নতি দেখে তার অবনতির কথা ভাবেন, কীভাবে তাকে সরানো যায়, কীভাবে তার ক্ষতি করা যায়, বা তার নেয়ামত কেড়ে নেওয়ার কামনা করেন, তখনই তা হারাম হিংসা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পরস্পর হিংসা কোরো না, পরস্পর বিদ্বেষ কোরো না, আল্লাহর বান্দারা ভাই ভাই হয়ে যাও (সহীহ মুসলিম)। তিনি 'গিবতা' (হিংসাবিহীন প্রশংসামূলক আগ্রহ) অনুমোদন করেছেন, যেমন কারও ইলম বা সম্পদ দেখে ভাবা, আমিও যদি আল্লাহর পথে এমন ব্যয় করতে পারতাম (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

হিংসুকের হিংসা থেকে সুরক্ষার জন্য দুটি জিনিস প্রয়োজন। প্রথম, নিজে হিংসা না করা। দ্বিতীয়, অন্যের মধ্যে হিংসা জাগানোর মতো আচরণ থেকে বিরত থাকা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বদনজর সত্য (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। কোনো সুন্দর বা আকর্ষণীয় জিনিস দেখলে 'মা শা আল্লাহ, লা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলা উচিত (সূরা কাহফ ১৮:৩৯)। এতে দৃষ্টি ও অন্তরের ক্ষতি কমে যায়।

আমাদের সময়ে আমরা অনেকে নিজের প্রতিটি সফলতা, সন্তানের ছবি, বেতন বাড়ার খবর, নতুন গাড়ি বা বাড়ির ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে দিই। এতে ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কারও মনে হিংসা জাগতে পারে, বদনজর লাগতে পারে। এ কারণে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া নিজের সফলতা ও পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয় প্রদর্শন না করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ইয়াকুব আলাইহিস সালাম তাঁর ছেলে ইউসুফকে বলেছিলেন, তুমি তোমার স্বপ্ন তোমার ভাইদের কাছে বর্ণনা কোরো না, তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে (সূরা ইউসুফ ১২:৫)। অবশ্য প্রয়োজনে নিজের যোগ্যতা ও আল্লাহর নেয়ামত প্রকাশ করা যায়, যেমন কর্মসংস্থানের প্রয়োজনে বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশে। কিন্তু অকারণে সব বিষয় ছড়িয়ে দেওয়া ভালো নয়।

এই সূরা আমরা নিয়মিত আমলে রাখব ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সব ধরনের হিংসা ও তার ক্ষতি থেকে হেফাজত করুন।

শিক্ষা ও উপদেশ

- সূরা ফালাক একটি পূর্ণাঙ্গ দোয়া। সকাল-সন্ধ্যায় ও ঘুমের আগে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়ে ফুঁ দেওয়া সুন্নাত।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাদুগ্রস্ত হয়েছিলেন, কিন্তু ওহী ও রিসালাতে এর কোনো প্রভাব পড়েনি। কুরআনের আয়াত দিয়ে তিনি সুস্থ হয়েছেন।

- আল্লাহ কোনো কিছুকে নির্ভেজাল মন্দ হিসেবে সৃষ্টি করেননি। প্রতিটি সৃষ্টির মধ্যে কল্যাণ আছে।
- অন্ধকারে অপরাধ ও ভয়ের ঝুঁকি বাড়ে। সন্ধ্যায় সন্তানদের ঘরে রাখা এবং আশ্রয় প্রার্থনার দোয়া পড়া উচিত।
- জাদু করা কুফরি, জাদু করানো হারাম। সব সমস্যাকে জাদু ভাবাও ঠিক নয়। চিকিৎসার পাশাপাশি কুরআন-সুন্নাহর ঝাড়ফুঁক করা যায়।
- হিংসা মানুষের পুরনো রোগ। মনে জাগলে সংযত রাখা ও অনুসরণ না করা জরুরি।
- বদনজর সত্য। কিছু দেখলে 'মা শা আল্লাহ' বলা এবং অকারণে নিজের সফলতা ও পরিবারের ব্যক্তিগত বিষয় ছড়িয়ে না দেওয়া উচিত।

অধ্যায় ৩৭

সূরা নাস

الناس

শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয়ের ঢাল

কুরআনের ১১৪তম সূরা · মাক্কী · আয়াত ৬টি

সূরা নাস কুরআনের সর্বশেষ সূরা, ১১৪তম। আয়াত সংখ্যা ছয়। আল্লাহ তাআলা কুরআন শুরু করেছেন সূরা ফাতিহা দিয়ে, আর শেষ করেছেন এই সূরা দিয়ে। সূরা ফালাক ও সূরা নাস একসঙ্গে ‘মুআওয়িযাতান’ নামে পরিচিত, অর্থাৎ এমন দুই সূরা, যার মাধ্যমে আশ্রয় প্রার্থনা করা হয়। ‘আউযুবিল্লাহ’ শব্দেও একই ধাতু আছে। মাক্কী ও মাদানী হওয়ার আলোচনা সূরা ফালাকের মতোই। সঠিক মত হলো, সূরা নাস মক্কায় নাযিল হয়েছে, পরে মদীনায় জাদুর ঘটনার সময় আবার স্মরণ করানো হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফালাকের সঙ্গে এই সূরাও সকাল-সন্ধ্যার আমল হিসেবে পড়তেন।

ফালাক ও নাসের মধ্যে পার্থক্য

দুই সূরার মূল বিষয় এক, আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া। কিন্তু যে বিষয় থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়, তাতে পার্থক্য আছে। সূরা ফালাকে চারটি অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে: সৃষ্টির অনিষ্ট, রাতের অন্ধকার, জাদুকরদের গিঁট এবং হিংসুকের হিংসা। এসবই বাহ্যিক অনিষ্ট, যা মানুষের বাইরে থেকে আসে, চোখে দেখা যায় বা ফলাফলে বোঝা যায়। আর সূরা নাসে আশ্রয় চাওয়া হয়েছে মাত্র একটি জিনিস থেকে, শয়তানের কুমন্ত্রণা। এটি অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট, যা মানুষের অন্তরের ভেতরে কাজ করে, আর যা সে অনেক সময় নিজেই টের পায় না। এটি প্রমাণ করে, শয়তানের অনিষ্ট কতটা বিপজ্জনক। যে একটি বিষয় থেকে বাঁচতে আল্লাহ একটি পূর্ণ সূরা নাযিল করেছেন, তা নিয়ে আমাদের কত সতর্ক থাকা দরকার!

❖ সূরা নাস, আয়াত ১–৩

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ﴿١﴾

[১] বলুন, আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতেছি মানুষের পালনকর্তার

مَلِكِ ٱلنَّاسِ ﴿٢﴾

[২] মানুষের অধিপতির

إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ﴿٣﴾

[৩] মানুষের মা'বুদের

আয়াত ১–৩: আল্লাহর তিনটি গুণ

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে, 'কুল আউযু বিরব্বিন নাস', বলুন, আমি মানুষের রবের কাছে আশ্রয় চাই। দ্বিতীয় আয়াতে, 'মালিকিন নাস', মানুষের অধিপতি। তৃতীয় আয়াতে, 'ইলাহিন নাস', মানুষের উপাস্য। আল্লাহ তো সব সৃষ্টির রব, মালিক ও ইলাহ। তবু এখানে 'নাস' (মানুষ) শব্দ তিনবার উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ এই সূরায় মানুষের অন্তরের সুরক্ষার কথা বলা হচ্ছে, যেখানে মানুষ সবচেয়ে দুর্বল।

আল্লাহর অসংখ্য সুন্দর নাম আছে। এখানে তিনটি নামই কেন? আলেমগণ বলেন, এখানে তাওহীদের তিনটি দিকের প্রতি ইঙ্গিত আছে। 'রব' নামে তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ, অর্থাৎ আল্লাহ একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক ও পরিচালক। 'মালিক' নামে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্ব। 'ইলাহ' নামে তাওহীদুল উলুহিয়্যাহ, অর্থাৎ একমাত্র তিনিই ইবাদতের যোগ্য। যে ব্যক্তি এই তিন প্রকার তাওহীদে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চায়, তার আশ্রয় প্রার্থনা সবচেয়ে বেশি কার্যকর। আরেকটি সুন্দর ক্রম আছে। প্রথমে 'রব', যিনি লালন-পালন করেন, যাঁর সঙ্গে আমরা নিজেদের প্রয়োজন নিয়ে সম্পর্কিত। তারপর 'মালিক', যিনি আমাদের ওপর কর্তৃত্ব রাখেন। শেষে 'ইলাহ', যাঁর প্রতি আমরা পূর্ণ ভালোবাসা ও আনুগত্য নিয়ে ফিরে যাই। আমরা শয়তানের মতো এত বড় শত্রুর মোকাবিলা করছি। এ অবস্থায় আমাদের আশ্রয়দাতা যদি আমাদের রব, মালিক ও ইলাহ হন, তাহলে আর কীসের ভয়?

আল্লাহ তাঁর বান্দাকে নিজের কাছে আশ্রয় চাইতে উৎসাহ দিচ্ছেন। যেন একজন চিকিৎসক বলছেন, তুমি আমার কাছে এসো, আমি তোমার চিকিৎসা করব। আল্লাহ বলছেন, আমি তোমার শত্রুকে জানি, তার আক্রমণের পদ্ধতিও জানি। তুমি আমার কাছে আশ্রয় নাও।

❖ সূরা নাস, আয়াত ৪–৬

مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ﴿٤﴾

[৪] তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে

ٱلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ﴿٥﴾

[৫] যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে

مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴿٦﴾

[৬] জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

আয়াত ৪–৬: ‘কুমন্ত্রণাদাতা আত্মগোপনকারীর অনিষ্ট থেকে’

চতুর্থ আয়াতে বলা হয়েছে, ‘মিন শাররিল ওয়াসওয়াসিল খান্নাস’। ‘ওয়াসওয়াস’ অর্থ চুপিসারে কুমন্ত্রণা দেওয়া, ফিসফিস শব্দ, যেমন অলংকারের ঝনঝন বা গোপন কানাকানি। ‘খান্নাস’ অর্থ আত্মগোপনকারী, যে সামনে এসে আবার পিছিয়ে যায়। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন, শয়তান আদমসন্তানের অন্তরে বসে থাকে। যখন সে আল্লাহর যিকির করে, শয়তান পিছিয়ে যায়। যখন সে গাফেল হয়, শয়তান আবার কুমন্ত্রণা দেয়। ফলে যিকির শয়তানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর প্রতিরোধ।

পঞ্চম আয়াতে বলা হয়েছে, ‘আল্লাযী ইউওয়াসউইসু ফী সুদূরিন নাস’, যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা দেয়। ষষ্ঠ আয়াতে, ‘মিনাল জিন্নাতি ওয়ান নাস’, জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে। অর্থাৎ শয়তান যেমন জিন হতে পারে, তেমনি মানুষও হতে পারে। কুরআনে আল্লাহ বলেছেন, এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ ও জিনের মধ্য থেকে শয়তানদের শত্রু বানিয়েছি, যারা একে অপরকে চমকপ্রদ প্রতারণাপূর্ণ কথা শেখায় (সূরা আনআম ৬:১১২)।

প্রত্যেকের সঙ্গে একজন শয়তান

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই জিনদের মধ্য থেকে একজন সঙ্গী (কারীন) নিযুক্ত আছে। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, আপনার সঙ্গেও কি, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, আমার সঙ্গেও, কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন, ফলে সে অনুগত (বা নিরাপদ) হয়ে গেছে, সে আমাকে কেবল ভালো কথারই আদেশ দেয় (সহীহ মুসলিম)। আমাদের কারও পক্ষে তা বলা সম্ভব নয়। আমাদের সঙ্গী শয়তান সক্রিয়, আর সে আমাদের অন্তরে ঢুকতে পারে।

শয়তান যে মানুষের শরীরের ভেতরে প্রভাব বিস্তার করে, তার একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। একরাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর স্ত্রী সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই রাদিয়াল্লাহু আনহাকে নিয়ে মসজিদ থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে দুজন আনসারী সাহাবী তাঁদের দেখে দ্রুত চলে যেতে লাগলেন। তিনি ডেকে বললেন, থামো, ইনি সাফিয়্যা বিনতে হুয়াই। তাঁরা বললেন, সুবহানাল্লাহ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ব্যাপারে আমরা খারাপ ধারণা করব? তিনি বললেন, শয়তান মানুষের রক্তনালিতে প্রবাহিত হয়। আমার আশঙ্কা হলো, সে তোমাদের অন্তরে কোনো কুধারণা ঢেলে দেবে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

এ ঘটনায় দুটি শিক্ষা। প্রথম, শয়তান আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে কুধারণা ও কুমন্ত্রণা তৈরি করতে পারে। দ্বিতীয়, আমাদের দায়িত্ব, অন্যের মনে কুধারণা আসার সুযোগ না দেওয়া। মানুষ কী ভাববে, তাতে কিছু যায় আসে না, এমন মনোভাব ঠিক নয়। যেসব কাজ সন্দেহ বা অপবাদ

তৈরি করতে পারে, তা থেকে নিজেকে বাঁচানো মুমিনের কর্তব্য। যিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠ নবী, তিনিও এই সতর্কতা অবলম্বন করেছেন।

শয়তান কীভাবে কুমন্ত্রণা দেয়?

শয়তান প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে ভিন্ন কৌশলে কাজ করে। তার মূল লক্ষ্য একটাই, মানুষকে আল্লাহ থেকে গাফেল করা। যে ব্যক্তি দুনিয়ামুখী, তাকে সে দুনিয়ার আকর্ষণ দেখায়। কাউকে সর্বশেষ মডেলের ঘড়ি, ফোন বা গাড়ির দিকে টানে। কাউকে অলংকার ও সাজসজ্জার মোহে ফেলে। যে ব্যক্তি দ্বীনদার, নামায পড়ে, তাকে সে অন্যভাবে প্রতারিত করে। বলে, নামায তো পড়ছ, একটু মানুষকে জানিয়ে দাও যে তুমি কত যিকির করো, তাহলে সম্মান বাড়বে। ফলে ইবাদত রিয়ায় পরিণত হয়। কেউ এমন প্রশ্ন নিয়ে ব্যস্ত হয়, আমি তাহাজ্জুদ সর্বোচ্চ কত রাকাত পড়তে পারব, অথচ তার আসল উদ্দেশ্য নিজের ইবাদত প্রকাশ করা। আবার কাউকে উপকার করার পর খোঁটা দিতে উৎসাহ দেয়। আল্লাহ বলেছেন, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান নষ্ট কোরো না (সূরা বাকারা ২:২৬৪)।

শয়তান রাগও জাগায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, রাগ শয়তানের পক্ষ থেকে, আর শয়তান আগুন থেকে সৃষ্ট। আগুন পানি দিয়ে নিভে, তাই তোমাদের কেউ রাগান্বিত হলে ওযু করে নেবে (সুনানে আবু দাউদ)। সুলাইমান ইবনে সুরাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, দুই ব্যক্তি ঝগড়া করছিল, একজনের চোখমুখ রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে তা বলে, তার রাগ চলে যাবে, 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম' (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)। কথা কাটাকাটি, গালাগাল ও মারামারি, বেশির ভাগ এ ধরনের কুমন্ত্রণারই ফল। আবার লোভও শয়তানের একটি বড় অস্ত্র। কারও সম্পদ দেখে তার মনে কুবুদ্ধি জাগানো, অন্যায়ে প্ররোচিত করা, এসবও কুমন্ত্রণার অংশ।

শয়তানের অভিজ্ঞতা অনেক। সে কত নবী, কত নেককার ও কত গুনাহগার মানুষ দেখেছে। আমরা ষাট-সত্তর বছর বয়সে ভাবি, আমি অনেক অভিজ্ঞ। কিন্তু শয়তানের অভিজ্ঞতা হাজার হাজার বছরের। সে ঠিক জানে, কোন মানুষকে কোন পথে আক্রমণ করলে সে ধরা পড়বে। এই কারণেই আমাদের আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া কোনো উপায় নেই।

শয়তান সম্পর্কে আল্লাহ বারবার সতর্ক করেছেন। তিনি বলেছেন, শয়তান তোমাদের শত্রু, তাকে শত্রু হিসেবেই গ্রহণ করো (সূরা ফাতির ৩৫:৬)। সে আল্লাহর সামনেই ঘোষণা দিয়েছিল, আমি তাদের সামনে থেকে, পেছন থেকে, ডান থেকে ও বাম থেকে আসব, আর আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না (সূরা আ'রাফ ৭:১৭)। সূরা আদিয়াতে আমরা দেখেছি, মানুষের অকৃতজ্ঞতাই শয়তানের মূল লক্ষ্য।

তবে মুমিনের জন্য আশার কথাও আছে। আল্লাহ বলেছেন, শয়তানের কৌশল অত্যন্ত দুর্বল (সূরা নিসা ৪:৭৬)। যারা ঈমান আনে এবং রবের ওপর ভরসা করে, তাদের ওপর তার কোনো আধিপত্য নেই (সূরা নাহল ১৬:৯৯)। তার আধিপত্য শুধু তাদের ওপর, যারা তাকে বন্ধু বানায়।

মানব শয়তান

শয়তান অনেক সময় মানুষের রূপেও আসে। কখনো খারাপ বন্ধু, কখনো ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচারকারী, কখনো কুপরামর্শদাতা কোনো প্রিয়জন। আপনি শয়তানের কথা হয়তো উপেক্ষা করতে পারেন। কিন্তু আপনার প্রিয় বন্ধু বা কাছের কেউ যখন একই কথা বলে, তখন তা গ্রহণ করা সহজ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, তাদের থেকে সাবধান থাকো (সূরা তাগাবুন ৬৪:১৪)। এর অর্থ এ নয় যে তাদের সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে। এর অর্থ, আল্লাহর অবাধ্যতায় কারও আনুগত্য করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আনুগত্য কেবল ভালো কাজে (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)।

শয়তান থেকে বাঁচার উপায়

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ব্যবহারিক কিছু উপায় শিখিয়েছেন। সকাল-সন্ধ্যায় এবং ঘুমের আগে সূরা ইখলাস, ফালাক ও নাস পড়া। প্রতি নামাযের পর এই দুই সূরা পড়া। আযান শুনলে শয়তান বায়ু ছেড়ে পালায় (সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম), তাই জামাআতে নামায পড়া। ঘরে প্রবেশ ও খাবারের সময় 'বিসমিল্লাহ' বলা, কারণ বিসমিল্লাহ না বললে শয়তান সেখানে ভাগ বসায় (সহীহ মুসলিম)। আয়াতুল কুরসী, সূরা বাকারা তিলাওয়াত এবং সব সময় যিকিরে থাকা। রাগ উঠলে 'আউযুবিল্লাহ' পড়া ও ওযু করা।

শয়তান বিশ্বাস বা ইবাদতের ব্যাপারে সন্দেহ ঢেলে দিলে কী করণীয়? সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে, কেউ যদি অন্তরে এমন কিছু অনুভব করে, যা সে মুখে উচ্চারণ করাকেও অপছন্দ করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটাই স্পষ্ট ঈমান। অর্থাৎ এমন চিন্তার প্রতি ঘৃণা থাকাই ঈমানের লক্ষণ। এ অবস্থায় বলতে হবে, 'আমান্তু বিল্লাহ', আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম, এবং ওই চিন্তা নিয়ে আর না ভেবে বিরত হতে হবে (সহীহ মুসলিম)। নামাযে শয়তান বিভ্রান্ত করলে 'আউযুবিল্লাহ' পড়ে বাঁ দিকে তিনবার হালকা থুতু ফেলার কথা হাদীসে এসেছে (সহীহ মুসলিম)। কারও যদি অতিরিক্ত ও বারবার ফিরে আসা সন্দেহ, ওযু বা নামাযে বারবার সংশয় থাকে, তা অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাজনিত সমস্যার ইঙ্গিতও হতে পারে। তখন আল্লাহর ওপর ভরসা করার পাশাপাশি যোগ্য চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া ভালো।

আমরা সবাই আক্রান্ত হওয়ার পর হতাশ হই, অথচ আগে থেকে সতর্ক থাকি না। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা আগে অর্জন করা ভালো। নিয়মিত সকাল-সন্ধ্যার আমল আমাদের আত্মিক প্রতিরোধ

ক্ষমতা। শয়তান আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু। তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে পারলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

শিক্ষা ও উপদেশ

- সূরা ফালাক বাহ্যিক অনিষ্ট থেকে, আর সূরা নাস অভ্যন্তরীণ অনিষ্ট, অর্থাৎ শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আশ্রয়ের দোয়া।
- আল্লাহর তিনটি গুণ, রব, মালিক ও ইলাহ, উল্লেখ করে আশ্রয় চাওয়ার মাধ্যমে তাওহীদের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।
- আল্লাহর যিকির শয়তানকে পিছিয়ে দেয়, আর গাফলতি তাকে আবার ডেকে আনে।
- শয়তান জিন ও মানুষ, উভয়ের মধ্য থেকেই হতে পারে। প্রিয়জনের কুপরামর্শও শয়তানের কুমন্ত্রণার বাহন হতে পারে।
- শয়তান প্রত্যেক মানুষকে তার স্বভাব অনুযায়ী ভিন্ন কৌশলে প্রতারিত করে। রাগ, লোভ, রিয়া ও খোঁটা তার বড় অস্ত্র।
- অন্যের মনে কুধারণা আসার সুযোগ না দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।
- ঈমানদারের ওপর শয়তানের আধিপত্য নেই। তার কৌশল দুর্বল, তবে সতর্ক থাকা জরুরি।
- সকাল-সন্ধ্যার আমল, জামাআতে নামায, যিকির, বিসমিল্লাহ ও আশ্রয় প্রার্থনা শয়তান থেকে বাঁচার প্রধান উপায়।

সমাপনী দোয়া

আল্লাহ তাআলা কুরআনের শুরু করেছেন সূরা ফাতিহা দিয়ে, যেখানে বান্দা তাঁর কাছে সরল পথের হিদায়াত চায়। আর কুরআনের সমাপ্তি করেছেন সূরা নাস দিয়ে, যেখানে বান্দা সব ধরনের অনিষ্ট থেকে তাঁর আশ্রয় চায়। এই শুরু ও শেষের মধ্যেই যেন বান্দার পুরো জীবনের চিত্র আছে। প্রথমে সঠিক পথের আকাঙ্ক্ষা, শেষে সেই পথে অটল থাকার আশ্রয় প্রার্থনা।

আমপারার সূরাগুলো আমাদের সামনে আখিরাতের চিত্র এঁকেছে, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন দেখিয়েছে, পূর্ববর্তী জাতিদের পরিণতি জানিয়েছে, আর জীবনের সূক্ষ্ম আচরণগুলোকে সংশোধনের দিকনির্দেশনা দিয়েছে। এ থেকে আমরা কতটুকু গ্রহণ করতে পারি, তা-ই আমাদের পরীক্ষা।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের কুরআনকে আমাদের অন্তরের বসন্ত, আমাদের বক্ষের নূর, আমাদের দুশ্চিন্তার অবসান এবং আমাদের দুঃখের মুক্তির উপায় করে দিন। আমাদের ভুলগুলো ক্ষমা করুন, আমাদের জ্ঞান ও আমলে বরকত দিন। আমাদের শিক্ষক, পিতামাতা ও সকল মুসলমানকে ক্ষমা করুন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।